পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা পত্র

গবেষক

সঞ্জীব প্রামাণিক

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং A00SO1200217 of 2017-18

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অমিতেশ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০ ০৩২

২০২৫

Certified that the Thesis entitled

পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Amites Mukhopadhyay and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

Dr. Amites Mukhopadhyay
Professor
Department of Sociology
Jadavpur Universirty
Date:

Sanjib Pramanick
Date:

ঘোষণা পত্র

আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা পত্রটি বাংলা ভাষাতে সম্পন্ন্য করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কোনও বাংলা ভাষার গবেষণা পত্রের প্লেজিয়ারিজম মূল্যায়ন করার কোন পদ্ধতি নেই। তাই এই গবেষণা পত্রের মূল্যায়নের শংসাপত্র দেওয়ার কোন পরিসর পাইনি। এই গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ ভাবে আমি নিজের দ্বারাই সম্পন্ন্য করেছি। এখানে অপরের গবেষণা বা লেখা থেকে কোন প্রকার অনুকরণ করা হয়নি।

Dr. Amites Mukhopadhyay
Professor
Department of Sociology
Jadavpur Universirty
Date:

Sanjib Pramanick
Date:

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার....................1

লিস্ট অফ এক্রনিমস....................2

প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা: আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বিভিন্ন দিক, ছাত্র আন্দোলন এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।.................... 3-84

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের ধারণা....................6

রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার কাঠামো....................6

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব....................8

ছাত্র আন্দোলনের কাঠামো ও রূপান্তর....................9

সংঘর্ষ ও পরিচয় রাজনীতি....................11

সংগঠনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকট: এর নানান দিক....................12

ছাত্র আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিক....................14

সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ছাত্র আন্দোলন....................16

ক্ষমতার সামাজিক বহি:প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা....................17

আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের ধারণা....................18

ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্ব: গবেষণার প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত বিশ্লেষণ....................19

হেজেমনি তত্ত্ব ও ক্ষমতা: 23

ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-সিস্টেম তত্ত্ব 24

সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব: গবেষণার প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত বিশ্লেষণ....................28

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার আলোচনা....................29

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রিসোর্স মবিলাইজেশন থিওরি.................... 32

পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি 34

স্ট্রাকচারাল স্ট্রেইন থিওরি 36

নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি ও বিভিন্ন আন্দোলন.. 38

পপুলিজম তত্ত্ব ও গণতন্ত্র 46

ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত সাধারণ অন্য তত্ত্ব 47

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন...51

প্রাক স্বাধীন ভারতঃ আন্দোলনের ইতিহাস...51

ঔপনিবেশিক সমাজ এবং ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি..53

স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের চিত্র 56

স্বাধীনোত্তর ভারতের চিত্র..58

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলন.. 66

বাংলা – পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনঃ ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট..............................68

ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন..68

স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলন..69

খাদ্য আন্দোলন 70

নকশালবাড়ি ছাত্র আন্দোলন..71

ছাত্র আন্দোলন ও দলীয় রাজনীতি: সামাজিক পরিবর্তন থেকে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের উত্থান..............74

বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ছাত্র অসন্তোষ..76

বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন...77

জনগণের অসন্তোষে ছাত্র আন্দোলন...78

দ্বিতীয় অধ্যায় - পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ..85-123

সাহিত্য পর্যালোচনার পদ্ধতি..88

তত্ত্ব ভিত্তিক আলোচনা..89

তুলনামূলক বিশ্লেষণ..92

বিচার-বিশ্লেষণ..93

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিবিদ্যা..95

গবেষণার নকশা..97

বর্ণনামূলক গবেষণা..99

বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) গবেষণা..100

আমার গবেষণার ধরণ..101

জনসংখ্যা এবং নমুনা..105

নমুনার ধরন..105

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা..106

তুষারগোলক নমুনা..108

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি..109

প্রাথমিক তথ্য..111

গৌণ তথ্য..113

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি..116

নৈতিক বিবেচনা..118

নৈতিক সংকট ও তার প্রভাব..121

তৃতীয় অধ্যায় - সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম : রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ছাত্র আন্দোলন.....................124-186

ভূমিকা..124

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম : ভৌগোলিক পরিচিতি 126

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পটভূমি, আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট..127

সিঙ্গুরের পটভূমি..128

নন্দীগ্রামের পটভূমি..129

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কারণ সমূহ.. 132

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সরাসরি স্টেকহোলডারদের ভূমিকা 136

আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা..137

সিঙ্গুর...137

নন্দীগ্রাম..138

আন্দোলনে ভূমিহীন দিনমজুরদের ভূমিকা...140

আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা...142

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা 144

তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা..144

বামফ্রন্টের ভূমিকা..147

সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণে বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম)-এর অবস্থান..................................148

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের ভূমিকা..............................151

আন্দোলন এসইউসিআইয়ের ভূমিকা (SUCI) 153

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাব...156

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (TMCP)-এর ভূমিকা..157

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে এআইএসএ (AISA)-র ভূমিকা.. 163

এএইডিএসও (DSO) সংগঠনের ভুমিকা...172

বামপন্থী অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাব...176

SFI সংগঠনের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া..179

পরিশেষে 183

চতুর্থ অধ্যায় - শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন: ছাত্র আন্দোলন ও তার প্রভাব........187 - 222

ভূমিকা........187

চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি, আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট........188

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি 190

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরাসরি ভুক্তভোগী বা আন্দোলনের বিভিন্ন স্টেকহোলডারদের ভূমিকা......192

চাকরি প্রার্থীদের ভূমিকা ও প্রভাব........192

নাগরিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সক্রিয় গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা........195

ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের ভূমিকা........197

নিয়োগ দুর্নীতি আন্দোলনে রাজনৈতিক দল গুলির ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া........198

রাষ্ট্র, প্রশাসন ও তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা........199

সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্টের ভূমিকা 202

বিজেপির ভুমিকা........205

পশ্চিমবঙ্গে চাকরি নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ........207

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি 208

এসএফআই (SFI) 210

এবিভিপি ও যুব মোর্চা: 213

অরাজনৈতিক সংগঠন........215

আন্দোলনে নতুন মুখ........217

আন্দোলনের গতিপথ বিশ্লেষণ........218

পঞ্চম অধ্যায় - সন্দেশখালি: রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও ছাত্র আন্দোলন........223- 275

ভূমিকা........223

সন্দেশখালিঃ ভৌগোলিক পরিচিতি..225

সন্দেশখালিতে আন্দোলনের পটভূমি 226

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা...231

জমিহারা কৃষকদের ভূমিকা...231

আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা 233

স্থানীয় অন্যান্য পেশার মানুষের ভূমিকা..238

সন্দেশখালি আন্দোলনে শাসক ও বিরোধী দলগুলির ভূমিকা... 241

সন্দেশখালি আন্দোলনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা...241

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র ভূমিকা...245

সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের ভূমিকা 249

ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের ভুমিকা...253

রেডস্টার সংগঠনের ভূমিকা...259

আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা...260

স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া সংগঠনের (এসএফআই) ভূমিকা...261

এবিভিপি সংগঠনের ভূমিকা..266

শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির ভূমিকা..268

পরিশেষে...271

ষষ্ঠ অধ্যায় – উপসংহার.. 276 - 299

রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ 276

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও উদ্দেশ্য 282

রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ 286

ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য...289

ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা...291

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাম্প্রতিকতম ইতিহাস ও পরবর্তীকালীন গতিপথ 293

গ্রন্থপঞ্জি...300 - 314

গ্রন্থ...300

জার্নাল 309

পত্রিকা..310

ওয়েব লিঙ্ক 314

সাক্ষাৎকারদের প্রশ্নমালা 315-317

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আমার এই গবেষণা পত্রের জন্য আমার 'গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক' ড. অমিতেশ মুখোপাধ্যায়-এর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। তিনি সহযোগিতা না করলে এই গবেষণা পত্রটি লেখা ও পেশ করা সম্ভব হত না। এছাড়া বিভাগের আমার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পপি সরকার ও সঞ্জয় প্রামাণিককে অর্থনৈতিক ভাবে এই সময়কাল যাবত পাশে থাকার জন্য আন্তরিকভাবে তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি ধন্যবাদ জানাই বন্ধু তন্ময় রায়, সাগির হোসেন দাদাকে, বন্ধু সুজয় সরকার, সুদীপ সরকার, বিশ্বরূপ বৈদ্য, ঋত্বিক বাগচি, কিশলয় রায়, সুখেন বৈদ্য, তীর্থরাজ বর্ধন, ভাই তন্ময় প্রামাণিককে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় ইমন কাল্যান লাহিড়ী, গৌতম মাইতি স্যারকে।

সর্বোপরি আমি কৃতজ্ঞতা ও প্রনাম জানাই আমার মা ও বাবাকে সব সময় আমাকে উৎসাহ দেওয়া ও আমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য।

যাদবপুর *সঞ্জীব প্রামাণিক*

তাং-

সংক্ষিপ্ত রূপ (list of Acronyms)

BPUC	ভূমি উচ্ছদ প্রতিরোধ কমিটি
SSC	স্কুল সার্ভিস কমিশন
CAA	নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন
NRC	জাতীয় নাগরিকপঞ্জি
AITUC	অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
AISF	অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন
NSM	নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট
CESC	কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন
SEZ	স্পেশাল ইকোনমিক জোন
AISA	অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশন
TMCP	তৃণমূল ছাত্র পরিষদ
SFI	স্টুডেন্টস' ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া
CPIM	কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট)
SUCI	সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)।
RSP	রেভলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টি।
DYFI	ডেমোক্রাটিক ইউথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া।
CITU	সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন্স।
CPI(ML)	কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট)।
AISA	অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন।
AIDSO	অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন
DSF	ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফ্রন্ট
WTI	উই দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট
FAS	ফোরাম ফর আর্ট স্টুডেন্টস
IC	ইনডিপেন্ডেন্ট কনসলিডেশন

ভূমিকা: আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বিভিন্ন দিক, ছাত্র আন্দোলন এবং বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে যত বার সরকারের পরিবর্তন হয়েছে তার সব ক্ষেত্রেই কোন না কোন বড় ঘটনা, আন্দোলন ও সমাজ সচেতনতার প্রভাব রয়েছে। এবং সেই ঘটনা বা আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের সাংগঠনিক কাঠামো ও নীতিগুলিকে পাল্টানোর করেছে, যাতে করে তারা জনসমাজের সমর্থন লাভ করে। এবং এই রাজনৈতিক দলগুলোর আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল "সরকার" গঠন করার ক্ষমতা লাভ করা। 'সরকার'-এ যাওয়ার ও 'সরকার' চালনোর এই দৌড় প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল *প্রতিদ্বন্দ্বিতা*। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পাথেয় করেই রাজনীতির ধারাপাতের বিভিন্ন ধাপের উন্মেষ ঘটে— শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে গোষ্ঠী, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের। যার ফলে রাজনীতির বিভিন্ন ধাপে ব্যক্তি থেকে দলগুলি জনসমাজে পরিচিতির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে জনসমর্থন লাভ করে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হল সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যা সাধারণ ভাবেই আন্দোলন, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলিকে উন্মোচিত করার সুযোগ করে দেয়। একইরকম ভাবে অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতার লড়াইয়ের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন সরকার পরিবর্তনে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজনীতির ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা থেকে পালাবদলের বিভিন্ন গল্পে এই ছাত্র সমাজের আন্দোলন বিভিন্নভাবে ছাপ রেখেছে। পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আন্দোলনের ধরণকে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন দিকে চালিত করেছে। গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এবং এই দুই দশকের মধ্যে আমরা আরও একটি সরকারের পালাবদলের সাক্ষী থেকেছি। যার ফলে রাজ্য রাজনীতির গতিপ্রকৃতিতে, দৈনন্দিন সমাজ জীবনে ও অর্থনৈতিক জীবনকে কি কি উপাদান গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একই রকম ভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের এই প্রেক্ষাপটের সাথে ছাত্র আন্দোলনেরও একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা দেখা যায়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যা মানব প্রকৃতির একটি মৌলিক দিক, যা সমাজের বিভিন্ন মাত্রায় প্রবেশ করে প্রতিযোগিতা, সংঘাত এবং আধিপত্যের অনুসন্ধানকে চালিত করে। মূলত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তিদের, গোষ্ঠীগুলির এবং প্রতিষ্ঠানগুলির গতিশীল আন্তঃক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে কারণ তারা সম্পদ, ক্ষমতা এবং প্রভাবের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[1] এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়; শ্রেণী, বর্ণ এবং রাজনৈতিক সংগঠনের জটিল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যা বিস্তৃত। শ্রেণীভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলি সম্পদ, শিক্ষা এবং সামাজিক সুবিধা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বর্ণবৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত, শ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যে উত্তেজনাকে তুলে ধরে, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে আকার দেয়। বিপরীতভাবে, বর্ণভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সহ সমাজে বিদ্যমান, শতাব্দী প্রাচীন বিভাজন এবং বর্ণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস থেকে উদ্ভূত হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক নিয়ম, সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং ঐতিহাসিক অভিযোগ দ্বারা চিরস্থায়ী হয়, আন্তঃবর্ণ উত্তেজনা এবং পরিচয় রাজনীতিকে ইন্ধন দেয়। তদুপরি, রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতার লড়াই, আদর্শগত সংঘর্ষ এবং নেতৃত্বের অবস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা হিসাবে প্রকাশ পায়। এই ক্ষেত্রে, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলি ক্ষমতা সু-সংহত করতে, নীতি এজেন্ডা গঠন করতে এবং নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে মেকিয়াভেলিয়ান চালচলনে নিযুক্ত থাকে।[2] গোষ্ঠীবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিশ্বাসঘাতকতা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা দলীয় রাজনীতির জটিল গতিশীলতা এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের নিরলস অনুসন্ধানকে প্রতিফলিত করে। শ্রেণীভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিলতাগুলি অন্বেষণ করার সময়, একজনকে সেই সামাজিক-অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপে প্রবেশ করতে হবে যেখানে সম্পদ এবং সুযোগের বৈষম্য প্রতিযোগিতা এবং সংঘাতের রূপরেখাকে আকার দেয়। সমাজের মধ্যে, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক লাইনের সাথে স্তরবিন্যাস করা হয়, কিছু কিছু সুবিধা এবং প্রাচুর্য উপভোগ করে যখন অন্যরা দারিদ্র্য এবং বঞ্চনার সাথে লড়াই করে। সম্পদের এই অসম বন্টন ক্ষোভ, ঈর্ষা এবং

[1] গতিশীল আন্তঃক্রিয়া (Dynamic Interaction) বলতে সমাজবিজ্ঞানে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় যেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিবর্তনশীল ও প্রসঙ্গনির্ভর হয়ে থাকে। এটি একটি স্থির বা একমুখী সম্পর্ক নয়, বরং চলমান ও পরিবর্তনশীল সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত হয়।

[2] মেকিয়াভেলিয়ান চালচলন (Machiavellian Behavior) বলতে এমন কৌশলী, ধূর্ত ও প্রভাবশালী আচরণ বোঝানো হয়, যেখানে লক্ষ্য অর্জনের জন্য নৈতিকতা বা সততার চেয়ে কৌশল, চাতুর্য ও বাস্তববাদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি মূলত নিকোলো মেকিয়াভেলির (Niccolò Machiavelli) রাজনৈতিক দর্শন থেকে উদ্ভূত, The Prince Niccolò Machiavelli Translated and Introduced by tim parks (২০০৯) PENGUIN CLASSICS an imprint of penguin books লিখেছিলেন যে একজন শাসকের উচিত ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ছলচাতুরী, প্রতারণা ও কঠোরতা ব্যবহার করা।

ঊর্ধ্বগতির আকাঙ্ক্ষাকে জ্বালাতন করে, ব্যক্তিদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক মর্যাদার অ্যাক্সেসের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চালিত করে। তদুপরি, শ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায়শই পদ্ধতিগত অবিচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলির দ্বারা আরও খারাপ হয় যা দারিদ্র্য এবং বর্জনের চক্রকে চিরস্থায়ী করে। বৈষম্যমূলক নীতি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার অসম অধিকার এবং মজুরির বৈষম্যগুলি ধনী এবং প্রান্তিকদের মধ্যে ব্যবধানকে আরও প্রশস্ত করে, সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা এবং বৈষম্যকে তীব্র করে তোলে।

ফলস্বরূপ, শ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের আহ্বানকে চালিত করার একটি শক্তিশালী 'শক্তি' হয়ে ওঠে, কারণ বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলি স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার এবং বৃহত্তর সমতা এবং ন্যায়বিচারের দাবি করার জন্য সংগঠিত হয়। পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মতো অঞ্চলের জন্য, মারভিন ডেভিসের *"র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড রাইভালরি: দ্যা পলিটিক্স অব ইনইকুয়ালিটি ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল"* বইটি গ্রামীণ সমাজের র‍্যাঙ্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার গতিশীলতা বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (ডেভিস ১৯৮৩:৪৫)। ডেভিস এই ঘটনাগুলিকে বোঝার জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি এই অঞ্চলের শারীরিক বাস্তবতা ও আচরণগত নিয়মাবলিকে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেন। মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামে পরিচালিত বিস্তৃত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে। তিনি পারিবারিক জীবন, জাতি, গোষ্ঠী এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর জটিল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর গবেষণা গ্রামীণ সমাজের সামাজিক কাঠামো ও ক্ষমতার ভারসাম্য অনুধাবনে সহায়ক, যা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাই "পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।" শীর্ষক এই গবেষণায় আমরা বিভিন্ন বড় ঘটনা বা আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলির ডায়নামিক কি পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে সাথে ছাত্র আন্দোলনের ধারার কি পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার ধরণগুলিকে ব্যাখ্যা ও আলোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি।[3]

[3]ডায়নামিক পরিবর্তন (Dynamic Change) বলতে এমন পরিবর্তন বোঝানো হয়, যা ক্রমাগত বিকাশমান, পরিবর্তনশীল ও প্রসঙ্গনির্ভর। এটি কোনো স্থির বা নির্দিষ্ট ধাপে হওয়া পরিবর্তন নয়; বরং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাব, এবং সময়ের প্রবাহ অনুযায়ী এটি পরিবর্তিত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের ধারণা

প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানব সমাজের একটি প্রাচীন এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সম্প্রদায়, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো সম্পদ, ক্ষমতা, পরিচয় এবং সামাজিক অবস্থানের জন্য লড়াই। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে দেখা হয়, যা কখনো অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে, আবার কখনো সংঘর্ষের জন্ম দেয়। রাজনৈতিক পরিসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরো গভীর এবং প্রভাবশালী রূপ নেয়। ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, যা অনেক সময় সংঘর্ষের দিকে পরিচালিত করে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনগুলির ইতিহাসে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ছাত্র আন্দোলনগুলি এখানে শুধু শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন নয়, বরং রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ আন্দোলন কেবল ভূমি রক্ষার দাবি নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজ্য সরকারি ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতাকে তীব্র করে তোলে। একইভাবে, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ একটি প্রাথমিকভাবে নিরপেক্ষ দাবি হিসেবে শুরু হলেও এটি দ্রুত দলগত দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হতে থাকে এবং এর প্রভাব বাড়তে থাকে। এই ধরনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাত্র আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং প্রভাবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এটি কখনো ছাত্রসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করে। অতএব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘর্ষ সমাজ এবং রাজনীতির এমন এক বাস্তবতা, যা ছাত্র আন্দোলনের মতো বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক। এটি বোঝা জরুরি যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং একটি চলমান সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের রসদ।

রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার কাঠামো

ছাত্র আন্দোলনগুলি যে কোনো সমাজ বা রাজনীতির প্রেক্ষাপটে একটি শক্তিশালী প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব আরও গভীর। তবে

এই আন্দোলনগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় ভূমিকা প্রায়শই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবের মূল কারণ হলো ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রয়াস। যেকোনো ছাত্র আন্দোলনকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দলই এই আন্দোলনগুলিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছে। তাদের এই অংশগ্রহণ অনেক সময় ছাত্র আন্দোলনকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলনগুলির নেতৃত্বে প্রবেশ করে, তাদের দাবি-দাওয়া এবং কর্মসূচিতে হস্তক্ষেপ করে, এমনকি কখনো কখনো আন্দোলনের গতিপথকেও নিজেদের স্বার্থে পরিবর্তন করে। প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি ও লক্ষ্যকে বহুমুখীভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, এটি আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে ফেলে, যেখানে ন্যায্য অধিকার আদায়ের পরিবর্তে দলীয় আদর্শ প্রচার বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্রসংগ্রামের বদলে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করে। তৃতীয়ত, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তিগুলির মদতে ছাত্র আন্দোলন অনেক সময় সহিংসতার রূপ নেয়, যা শিক্ষার্থীদের মূল সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বাড়িয়ে তোলে। ফলে, আন্দোলনের প্রাথমিক সামাজিক ও শিক্ষাগত উদ্দেশ্য ধোঁয়াশায় পরিণত হয় এবং ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার হয়ে যায়। এছাড়া 'নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'র [4] (এবার থেকে BUPC বলবো) আন্দোলনের মতো ঘটনাগুলি রাজনৈতিক প্রভাবের আরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই আন্দোলন মূলত কৃষকদের জমি রক্ষার দাবিতে শুরু হলেও, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই একে এমন এক রূপ দেয় যেখানে আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য আড়াল হয়ে যায়। দলীয় সংঘর্ষ আন্দোলনটিকে সমাজের বৃহত্তর সমস্যার সমাধানের চেয়ে দলগত ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় পরিণত করে। এই ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব ছাত্র আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ কাঠামোকেও প্রাভাবিত করে। আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা ছাত্রদের ওপর রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব তাদের ঐক্য এবং কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে। একই সঙ্গে, আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়, যা আন্দোলনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। তবে এই প্রভাব শুধুমাত্র নেতিবাচক নয়। রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ

[4] নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি (BPUC) ছিল একটি আন্দোলনকারী সংগঠন, যা ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গঠিত হয়েছিল।

আন্দোলনকে একটি বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যা অনেক সময় সাধারণ ছাত্রদের দাবিকে জাতীয় বা রাজ্য পর্যায়ে তুলে ধরতে সাহায্য করে। কিন্তু এই প্রভাব সুষম না হলে আন্দোলনের উদ্দেশ্য দলীয় রাজনীতির আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

সারসংক্ষেপে, রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার কাঠামো ছাত্র আন্দোলনের ওপর গভীর ছাপ ফেলে। এটি কখনো আন্দোলনের শক্তিকে বৃদ্ধি করে, আবার কখনো ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে দলগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দ্বৈত প্রকৃতিকে বুঝে ছাত্র আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যাতে আন্দোলনের প্রকৃত চেহারার মূল্যায়ন করা যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ সমাজ এবং অর্থনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এটি বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজ্যে প্রাসঙ্গিক, যেখানে রাজনীতির সঙ্গে সমাজের প্রত্যেকটি স্তর গভীরভাবে জড়িত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ কেবল রাজনৈতিক কাঠামোতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এটি সমাজের সামগ্রিক সম্পদের বণ্টন, সুযোগের ন্যায্যতা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারেও প্রভাব ফেলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ সমাজে সম্পদের অসম বণ্টনকে তীব্র করে তোলে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে কিছু গোষ্ঠী ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, ফলে তারা সমাজের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার অধিকাংশ নিজেদের দখলে রাখে। অন্যদিকে, বঞ্চিত এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নন্দীগ্রাম আন্দোলন এই ধরনের প্রভাবের একটি উদাহরণ। জমি অধিগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এখানে কৃষক সমাজ চরম বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। তাদের জীবিকা ও বসত ভিটা (বাড়ি) হারানোর হুমকি কেবল তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, বরং তাদের সামাজিক অবস্থানেও প্রভাব ফেলেছে। এই আন্দোলনে ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা শুধু প্রতিবাদকারী হিসেবেই অংশ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি, বরং তাদের সামাজিক অবস্থান ও নিরাপত্তার প্রশ্নও সরাসরিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ কেলেঙ্কারি আরও একটি বড় উদাহরণ। এই ঘটনাটি সমাজে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের বৈষম্যকে প্রকাশ করে। এখানে

রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে যারা সুবিধাপ্রাপ্ত, তারা ন্যায্য প্রার্থী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের জায়গা দখল করে। এর ফলে বৈষম্যের মাত্রা আরও গভীর হয় এবং ছাত্র সমাজে হতাশার সৃষ্টি করে। এটি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবিচারের ধারণা এবং সামাজিক ক্ষোভকেও উসকে দেয়। এই সমস্ত ঘটনা ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের অবিশ্বাস এবং হতাশার জন্ম দেয়, যা তাদের সামাজিক সম্পৃক্ততাকে প্রভাবিত করে। প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সীমিত হওয়ায় তারা সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই প্রভাবের মধ্যেও একটি ইতিবাচক দিক আছে। এসব ঘটনার ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি সাংগঠনিক চেতনা তৈরি হয়। তারা সামাজিক ন্যায্যতা এবং অর্থনৈতিক সাম্যের দাবিতে আন্দোলনে অংশ নেয়। এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে।

সারসংক্ষেপে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তীব্রতর করে তোলে। নন্দীগ্রাম আন্দোলন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি নিয়োগ কেলেঙ্কারির মতো ঘটনাগুলি এই বিষয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ। এর প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজের কাঠামো এবং ছাত্রসমাজের মনঃস্তত্ত্বেও গভীর ছাপ ফেলে। এই বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে বোঝার জন্য অপরিহার্য।

ছাত্র আন্দোলনের কাঠামো ও রূপান্তর

গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলির কাঠামো এবং রূপে বিশাল পরিবর্তন দেখা গেছে। অতীতে, ছাত্র আন্দোলনগুলি মূলত ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক আদর্শ এবং দলীয় নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হত, যেখানে ছাত্ররা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি একনিষ্ঠ থাকত এবং তাদের আদর্শের বিরুদ্ধ অন্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, ছাত্র আন্দোলনগুলির এই কাঠামো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখন অধিকাংশ আন্দোলন ইস্যু-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ছাত্র সমাজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এবং সরকারের নানা নীতির বিরুদ্ধে তাদের অনাগ্রহ। বর্তমানে, ছাত্ররা শুধু রাজনৈতিক আদর্শের পক্ষে না দাঁড়িয়ে, বরং শিক্ষার মান, চাকরি,

সামাজিক ন্যায় এবং সরকারি বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে। শিক্ষাবিদ রজত রায় তার *“স্টুডেন্ট মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া: এ হিস্টোরিকাল অ্যান্ড সোশিওলজিকাল অ্যানালিসিস”* বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র পরিবর্তনের মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি ছাত্রদের কমে আসা আনুগত্য এবং ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলনের প্রতি তাদের বেশি মনোযোগ দেওয়া। রায় যুক্তি দেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলো প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, এবং সরকারি নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিক্রিয়ার ফল (রায় ২০১৯:১৪২)। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এবার থেকে SSC বলবো) এবং অন্যান্য চাকরি নিয়োগ কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটায়। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে এখন নানা ইস্যুর উপর মনোনিবেশ করা হচ্ছে, যা মূলত রাজনৈতিক দলের আদর্শের বাইরে চলে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চাকরি সংক্রান্ত আন্দোলন, শিক্ষা এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন, এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য ছাত্র সমাজের সক্রিয় ভূমিকা বেড়েছে। এসব ইস্যু এখন ছাত্র আন্দোলনগুলির মূল কেন্দ্রবিন্দু, যা তাদের কার্যক্রমকে আগে থেকে অনেক আলাদা করে দিয়েছে। এ ধরনের আন্দোলনগুলো কখনও কখনও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, তারা তাদের লক্ষ্য নির্ধারণে স্বাধীন এবং ইস্যুগুলির প্রতি তাদের অঙ্গীকার অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এছাড়া অন্যদিকে, মারভিন গ্লোভারের গবেষণা *“পলিটিক্স অ্যান্ড প্রোটেস্ট: দ্যা চেইঞ্জিং নেচার অব স্টুডেন্ট মুভমেন্টস”* বইয়ে ছাত্র আন্দোলনের গঠনগত পরিবর্তন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আন্দোলনগুলোর ইস্যু-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গেও সংযুক্ত হচ্ছে (গ্লোভার ২০২১:১৭৫)। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সংগঠনগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নানা ছাত্রবিরোধী-জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, যেমন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (এবার থেকে CAA বলবো) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এবার থেকে NRC বলবো) বিরোধী আন্দোলন।[5] এই ধরনের আন্দোলনগুলো রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক

[5] নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (Citizenship Amendment Act - CAA) ২০১৯ সালে ভারতের সংসদে পাস হয়। এটি ১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে। এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, যদি তারা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসে থাকেন এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক তৈরি করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। এছাড়া, ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং জাতীয় রাজনীতির প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি জাতীয় রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে থাকে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভাজনের কারণে ছাত্র আন্দোলনগুলো বিভিন্ন সময়ে বড় রাজনৈতিক জল্পনা এবং আলোচনা তৈরি করে। ছাত্র আন্দোলনগুলির এই আন্তঃসম্পর্ক জাতীয় এবং রাজ্য রাজনীতির মধ্যে একটি সরাসরি সংযোগ তৈরি করে যা অনেক সময় একে অপরকে সমর্থন কিংবা বিরোধিতা করে থাকে।

এভাবে, ছাত্র আন্দোলনগুলির কাঠামো ও রূপান্তর শুধুমাত্র ছাত্র সমাজের মধ্যে নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এক নতুন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এখন ছাত্র আন্দোলনগুলির প্রতি যে ধরনের সক্রিয়তা এবং ইস্যু ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে, তা রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি নতুন ধরনের দিশা নির্দেশ করছে।

সংঘর্ষ ও পরিচয় রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলিতে সংঘর্ষ এবং পরিচয় রাজনীতির উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। ছাত্র আন্দোলনগুলির মাধ্যমে যে নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ের ধারণা জন্ম নিয়েছে, তা পূর্ববর্তী যুগের আন্দোলনগুলির তুলনায় অত্যন্ত ভিন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনগুলি শুধু শিক্ষার মান বা চাকরি সংক্রান্ত দাবি নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতিগত, এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের সাথেও সম্পর্কিত হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় বজায় রেখে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণির পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। বিশেষত, পরিচয় রাজনীতি তথা সমাজের নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা শ্রেণির মধ্যে জাতি-ধর্ম-ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত সচেতনতা ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তুলেছে। পল র‍্যাকার *"ওয়ানসেল্ফ অ্যাজ অ্যানাদার"* বইয়ে পরিচয়-এর দর্শন ও এর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ছাত্র আন্দোলনে পরিচয় রাজনীতির ভূমিকা বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই, যেখানে বলা হয়েছে যে পরিচয় কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নয়, বরং এটি পরিবর্তনশীল এবং

সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে (র‍্যাকার ১৯৯২:১৫০-৫৭)। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার যে বৃদ্ধি ঘটেছে, তা একদিকে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে, অন্যদিকে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির সাথে তাদের সংযোগও সৃষ্টি করেছে। অশোক মিত্রের *"অন্য ভারতের খোঁজে"* বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে। বিশেষ করে, ১৯৬০-৭০-এর দশকের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ের ইস্যু-ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে যে কাঠামোগত ও আদর্শগত পরিবর্তন ঘটেছে, তার বিভিন্ন দিক তিনি তুলে ধরেছেন (মিত্র ১৯৮১:৯৮-১০৫)। আগে ছাত্র আন্দোলন ছিল মূলত রাজনৈতিক দলের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে, তবে বর্তমান ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার বৃদ্ধি ছাত্রদের আরও মুক্তচিন্তা এবং আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তারা এখন নিজেদের দাবি এবং অধিকার সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া, এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের সমাজে ও জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে নিজেদের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এই সংঘর্ষ শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে নয়, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে ছাত্ররা একত্র হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করছে। এর ফলে, ছাত্র সমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা এবং পরিচয় রাজনীতির সাথে তাদের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই পরিচয় রাজনীতির উত্থান, ছাত্রদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা তাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং সামাজিক প্রভাবকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের সুযোগ দেয়।

সংগঠনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকট: এর নানান দিক

ছাত্র আন্দোলনগুলির কার্যকারিতায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং দলীয় রাজনীতির চাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনের সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে চলমান চাপগুলি প্রায়শই আন্দোলনের গতি এবং লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে। সাধারণত, ছাত্র সংগঠনগুলি দলের আদর্শ এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকলেও, তাদের মধ্যে আন্তঃসাংগঠনিক দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যা আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং

কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এই দ্বন্দ্বগুলি সাধারণত বিভিন্ন মতাদর্শ, নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা, অথবা রাজনৈতিক কৌশলের ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত হয়। যখন ছাত্ররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন সেই দলের রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে ভিন্ন হতে পারে, যার ফলে ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরে অস্থিরতা এবং বিভাজন সৃষ্টি হয়। দলীয় রাজনীতির চাপের কারণে ছাত্র আন্দোলনগুলি কখনও কখনও বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেখানে একটি গোষ্ঠী দলের পক্ষে, অন্যটি দলের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এমন পরিস্থিতি আন্দোলনের জন্য পরস্পরবিরোধী সংকট সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে আন্দোলনের লক্ষ্য এবং কৌশল একক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বাস্তবিক কার্যকরী পদক্ষেপের জায়গায় অনেক সময় রাজনৈতিক পালাবদল বা বিরোধীতা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ছাত্র আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সংকট নিয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, এন্টনি গিডেনস তার *"পলিটিক্স, সোশিওলজি অ্যান্ড সোশ্যাল থিওরি"* বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, যে কোনো সামাজিক আন্দোলনের অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতামূলক দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক, তবে এটি সংগঠনের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও লক্ষ্য পূরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে (গিডেনস ১৯৯৫:১৩৫-৪২)। এছাড়া, দলীয় রাজনীতির প্রভাব ছাত্র আন্দোলনগুলির সাংগঠনিক কাঠামোও দুর্বল করে দিতে পারে। যখন আন্দোলন দলীয় রাজনীতির কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আটকে যায়, তখন আন্দোলনকারীরা একে অপরকে অপছন্দ করতে পারে বা দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিজেদের শক্তি খুইয়ে ফেলে।[6] দলের মধ্যে ছত্রছায়ায় থাকা ছাত্র সংগঠনগুলি অনেক সময় প্রথাগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে গিয়ে আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতে পারে। এই সংকটগুলি আন্দোলনের কার্যকারিতা এবং জনসম্পৃক্ততা কমিয়ে দিতে পারে, কারণ ছাত্ররা একসাথে কাজ করার বদলে নিজেদের সংগঠনের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। একইভাবে, টমাস ওলসনের মতে, ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দলীয় রাজনীতির চাপ যখন অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন তা আন্দোলনকারীদের মূল দাবিকে আড়াল করে দেয় এবং দলীয় স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত করে (ওলসন ১৯৭১:৮৭-৯৩)। এই দ্বন্দ্ব এবং সংকটগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ছাত্র আন্দোলনগুলির অভ্যন্তরীণ সমঝোতা এবং সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যাতে তারা রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য একসাথে কাজ করতে পারে। তবে এই সংগ্রামগুলির মধ্যে থেকে

[6]কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক হল একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি বা মডেল, যা কোনো প্রতিষ্ঠান, সামাজিক আন্দোলন, বা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশল নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত একটি গাইডলাইন বা রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করে, যা লক্ষ্য, কৌশল, সম্পদ ও পদক্ষেপগুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে।

শিখে এবং একে অপরকে সমর্থন জানিয়ে, ছাত্র আন্দোলনগুলি তাদের শক্তি এবং কার্যকারিতা পুনর্গঠন করতে পারে।

ছাত্র আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিক

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়নি, বরং এটি একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবেও বিকশিত হয়েছে। ছাত্ররা তাদের আন্দোলনে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ফুঁটিয়ে তোলে, যা আন্দোলনগুলিকে আরও ব্যাপক এবং জনসম্মুখে দৃশ্যমান করে তোলে। এই সাংস্কৃতিক প্রতিবাদগুলি ছাত্রদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং ভাবনাকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তা বৃহত্তর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনে সাহিত্য-কাব্য, গান, পোস্টার, নাটক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্দোলনকারীরা তাদের ভাবনা, আবেগ এবং চেতনা প্রকাশ করতে এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করেন, যা তাদের সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের পোস্টারগুলি সাধারণত শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট বার্তা বহন করে আসছে। এই বার্তাগুলি কেবল রাজনৈতিক দাবি নয়, বরং সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক চেতনারও প্রতিফলন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ—

- "পড়াশোনার অধিকার, বেকারত্বের অবসান চাই!" - এই ধরনের শ্লোগান চাকরি ও শিক্ষার সংকটকে সামনে তুলে ধরে।
- "সরকারি দুর্নীতি বন্ধ কর, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা কর!" - এটি বিশেষতঃ শিক্ষা ও নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়েছে।
- "সর্বশিক্ষার অধিকার, সবার জন্য সমান সুযোগ!" - এই বার্তা শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্যের দাবিকে জোরালোভাবে তুলে ধরে।

- "আমরা কেবল ছাত্র নই, সংগ্রামীও!" - এই ধরনের শ্লোগান আন্দোলনের বিপ্লবী চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

- "রাজনৈতিক দমননীতি মানছি না, মানবো না!" - এই শ্লোগান প্রশাসনের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের অবস্থানকে বোঝায়।

বিশেষ করে, ছাত্র আন্দোলনে গান এবং (পথ) নাটকের ব্যবহার একটি শক্তিশালী প্রতিবাদী রূপ হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে আন্দোলনকারীরা তাদের সংগ্রামের কাহিনী অভিনয়-দৃশ্যের মাধ্যমে সকলের কাছে তুলে ধরে। পোস্টার এবং ব্যানারেরও এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যেখানে ছাত্ররা তাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য এবং দাবিগুলিকে সোজাসুজি এবং সহজ-সরল ভাষায় সমাজের সামনে উপস্থাপন করে। এগুলি আন্দোলনের পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করে। ছাত্র আন্দোলনের পোস্টারগুলিতে লাল, কালো ও সাদা রঙের প্রাধান্য দেখা যায়। লাল বিপ্লবের প্রতীক, কালো শোক ও বিক্ষোভের প্রতীক, এবং সাদা সাম্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেক পোস্টারে হাতে আঁকা চিত্রের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রতিবাদ, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন, বেকারত্বের করুণ অবস্থা এবং শিক্ষার সংকট তুলে ধরা হয়। সেগুলির নিম্নরূপ -

- কিছু পোস্টারে মুখোশধারী শাসক বা আমলাদের কার্টুন আঁকা হয়, যা ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করে।

- শিক্ষাঙ্গনের পতন, দুর্নীতিবাজ প্রশাসক ও রাজনৈতিক নেতাদের চিত্রায়ণ করে ছাত্রদের ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

- বিপ্লবী নেতাদের ছবি বা তাদের উক্তি অনেক পোস্টারে ব্যবহৃত হয়, যা আন্দোলনের আদর্শিক দিককে তুলে ধরে।

পাশাপাশি, সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা-গান-প্রবন্ধ ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক চেতনা প্রসারিত করতে সাহায্য করে। এই সাহিত্যকর্মগুলি ছাত্র সমাজকে শুধু চিন্তাভাবনায় নয়, বরং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মূল্যায়নেও উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া, নাটক বা পথনাটক, যা সাধারণত গ্রামীণ বা শহুরে প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হতো, তা ছাত্রদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করে। এই

নাটকগুলি আন্দোলনের মূল বিষয় এবং সংবেদনশীল ইস্যুগুলি দৃশ্যমানভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞাও তৈরি করে। ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি অনুযায়ী পোস্টারের বিষয়বস্তু ও বার্তা পরিবর্তিত হয়। যেমন-

শিক্ষা আন্দোলন: "প্রাইভেটাইজেশন নয়, গণশিক্ষা চাই!"

বেকারত্ব ও চাকরি আন্দোলন: "কাজ চাই, খালি প্রতিশ্রুতি নয়!"

দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন: "গণতন্ত্র হত্যা চলবে না, পুলিশি দমন মানব না!"

নারী ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্দোলন: "সুরক্ষিত ক্যাম্পাস চাই, নির্ভয়ে পথচলার অধিকার চাই!"

এভাবে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আন্দোলনটির ব্যাপকতা এবং গভীরতা বাড়িয়ে তুলেছে, যা এক নতুন ধরনের প্রতিবাদী ভাষা সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ছাত্র আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলি কখনোই শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এগুলি অনেক সময় বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের দাবিকে উত্থাপন করে। ছাত্র সমাজ, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রভাবশালী শক্তি, তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের সংকটময় অবস্থার প্রতিক্রিয়া জানায় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠায়। ছাত্ররা যেহেতু সমাজের উদীয়মান শক্তি, তাই তাদের আন্দোলনগুলো প্রথাগতভাবে শিক্ষা, চাকরি বা সুযোগের সীমাবদ্ধতা নিয়ে শুরু হলেও, ধীরে ধীরে তা বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়, অধিকার এবং বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। এটি এমনভাবে ঘটে যে ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করার পাশাপাশি, সমাজের অন্য ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণির জন্যও একধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করে। নন্দীগ্রামের আন্দোলন এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও এই আন্দোলন মূলত জমির অধিকার নিয়ে ছিল, যেখানে কৃষকরা তাদের জমি হারানোর ভয়ে সংগ্রাম করছিল, তাহলেও এটি সামাজিক ন্যায়ের জন্য একটি বৃহত্তর প্রতীক হয়ে উঠেছিল। জমি অধিগ্রহণের ফলে কৃষকরা শুধু তাদের

জীবিকা হারায়নি, বরং এটি তাদের সামাজিক অবস্থান এবং সামাজিক মর্যাদাকেও হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এই আন্দোলন কেবল কৃষকদেরই নয়, বরং সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির প্রতি এক গভীর আভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে সামনে এনেছিল, যা সকলেই বুঝতে পেরেছিল। এটি একটি সামাজিক পরিবর্তনের দাবি হিসেবে জনগণের কাছে গৃহীত হয়। ছাত্র আন্দোলনগুলি এই ধরনের সামাজিক ন্যায় এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রেরণা তৈরি করে। ছাত্ররা তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে শুধু নিজেদের দাবি নয়, বরং একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে, যা সমাজের প্রতিটি স্তরের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। এই আন্দোলনগুলি নৈতিক এবং আইনগত পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়ে ওঠে এবং সমাজে ন্যায়বিচারের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ার তৈরি করে।

এভাবে, ছাত্র আন্দোলনগুলি একদিকে শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হলেও, তা সমাজের শোষিত এবং বৈষম্যের শিকার প্রান্তিক জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

ক্ষমতার সামাজিক বহি:প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা

এই গবেষণা নিবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক ও তার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে যেসব তাত্ত্বিক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে তা গবেষণার মূল প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যের বিষয়গুলিকে পর্যালোচনা করে আরও বিধিবদ্ধ গবেষণা করার কাজে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গের গত দুই দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে বোঝার জন্য কয়েকটি মূল ধারণা বা বিষয়ের ওপরে বিভিন্ন সাহিত্য বা গবেষণার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সেগুলি হল, (ক) আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের ধারণা, (খ) ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন এবং (গ) পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন।

(ক) আন্দোলন সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের ধারণা

সংঘাত তত্ত্ব সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ, যা মূলত সমাজে বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘর্ষের প্রভাব তুলে ধরে। এই তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি হল যে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণির মধ্যে বিরোধ এবং সংঘর্ষই প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়। সংঘাত তত্ত্বের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্সের মতে, সমাজে মূলত অর্থনৈতিক শ্রেণি দ্বন্দ্ব অর্থাৎ, পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সংঘাত সামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যের পুনর্বিন্যাস ঘটে। অর্থনৈতিক শক্তি এবং সম্পদের মালিকানা নিয়ে এই দ্বন্দ্ব সমাজের বৃহত্তর কাঠামোতে ক্রমাগত পরিবর্তন আনতে থাকে (মার্ক্স [১৯৭২]১৯৭৮:৫৮৬-৯৩)। রালফ ড্যারেনডর্ফ সংঘাত তত্ত্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যোগ করেন, যেখানে তিনি দেখান যে সংঘাত সামাজিক সম্পর্কের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি স্বাভাবিকভাবেই সমাজে ঘটে থাকে। ড্যারেনডর্ফের মতে, সমাজে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব ক্রমাগত সামাজিক সম্পর্ক ও আদর্শে পরিবর্তন আনে। তাঁর মতে, এই সংঘাতের ফলেই সামাজিক সংস্কৃতি ও নীতি পরিবর্তিত হয় এবং এ ধরনের পরিবর্তনগুলোই সামাজিক অগ্রগতির পথ উন্মোচিত করে। সংঘাত তত্ত্বে ড্যারেনডর্ফের এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে বিদ্যমান বিরোধপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য সংঘর্ষকে একটি প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে তুলে ধরে, (ড্যারেনডর্ফ ১৯৫৯:২২৩-৩৬)। তাঁর ধারনাগুলি বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলি আসে সেগুলি হল— সংঘাত গোষ্ঠী সামাজিক জীবনে বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন শ্রমিক, পুঁজিপতি, জাতিগত গোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী ইত্যাদি একে অপরের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘাতের প্রেক্ষাপট সাধারণত শক্তির অসম বন্টন এবং একে অপরের স্বার্থের প্রতি আঘাত হওয়ার কারণে তৈরি হয়। গোষ্ঠীগুলি যখন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলন বা বিরোধে অংশ নেয়, তখন তা সংঘাত গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় আসে।

গোষ্ঠী সংঘাত সৃষ্টির পেছনে একাধিক কারণ থাকে, যেমন ক্ষমতার বিতরণ, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক মর্যাদা, এবং সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের মধ্যে পার্থক্য। এই সংঘাতগুলির মধ্যে সাধারণত এক দল তার অধিকার বা ক্ষমতার জন্য অন্য দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এই ধরনের সংঘাত সমাজের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে পারে এবং কখনও কখনও সহিংস আকারের রূপ নিতে পারে। সংঘাত সমাজের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়, কারণ গোষ্ঠীগুলি তাদের অবস্থান পুনঃনির্ধারণ করার চেষ্টা করে, যা সমাজের কাঠামোতে পরিবর্তন

আনতে সাহায্য করে। সংঘাত প্রক্রিয়ায় সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। যখন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়, তখন তা সমাজের অব্যক্ত বা পুরনো কাঠামো, আইন বা নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পরিবর্তন শুধুমাত্র গোষ্ঠীগুলির স্বার্থে নয়, বরং সামাজিক ন্যায় এবং সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যও ঘটে থাকে। গোষ্ঠী সংঘাতের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে আরও সমতামূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অগ্রগতি বা উন্নয়ন সম্ভব করে তোলে।[7] সংঘাতের ফলস্বরূপ যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে গোষ্ঠীগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রতিক্রিয়ার ওপর। গোষ্ঠীগুলি নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন বা সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে, যা সমাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা নতুন কাঠামো তৈরি করে। সংঘাত তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে যে, কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে এবং তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বাড়িয়ে তোলে। এই তত্ত্ব অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে অস্থিরতা ও প্রতিবাদী মনোভাব আন্দোলনের জন্ম দিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করছে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রসস্থ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই তত্ত্বটি ব্যবহার করে বোঝা সম্ভব যে কীভাবে আদর্শিক সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন আনছে, এবং ছাত্র আন্দোলনের উপর এই সংঘাত কিভাবে প্রভাব ফেলছে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণায় একদিকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের তাত্ত্বিক ভিত্তি, অন্যদিকে ছাত্র আন্দোলনের কার্য প্রক্রিয়ার দিক নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা সমাজে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাগুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছে।

ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্ব: গবেষণার প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত বিশ্লেষণ

আমার এই গবেষণায় ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করছি তার কারণ, আন্দোলন হল ক্ষমতার নানাবিধ আত্মপ্রকাশ। ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্ব মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত হলেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক

[7]সমতামূলক কাঠামো (Equitable Framework) বলতে এমন একটি কাঠামো বোঝায়, যেখানে সমাজের সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও সাম্যভিত্তিক আচরণ নিশ্চিত করা হয়। এটি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ম্যাক্স ওয়েবার তার ক্ষমতা তত্ত্বে বলেছেন, সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তখনই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, যখন সে অন্যদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অর্থাৎ, ক্ষমতা কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আসে না এটি সামাজিক সম্পর্কের ভেতর নিহিত এক সম্ভাবনা, যা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, প্রতিষ্ঠান, আইন বা আদর্শিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। ওয়েবারের মতে, ক্ষমতার তিনটি প্রধান রূপ আছে কারিশমাটিক ক্ষমতা, প্রথাগত ক্ষমতা ও আইনি-যৌক্তিক ক্ষমতা। রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে এই তিনটি রূপ একসঙ্গে বা আলাদাভাবে কাজ করতে পারে (ওয়েবার ১৯৭৮:৫৩)। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে ক্ষমতার সম্পর্ক নির্ধারণে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর বড় ভূমিকা আছে। ওয়েবারের ক্ষমতা তত্ত্ব এই আন্দোলনগুলোর কার্যকারিতা ও গঠন বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর প্রভাব, আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রদের ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং রাজ্যের প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া—এসবই ওয়েবারের ক্ষমতার ব্যাখ্যার আলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রাম আন্দোলন কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা লক্ষণীয়। একদিকে, এসব আন্দোলনে কিছু ছাত্রনেতার ক্যারিশমা ছাত্রদের সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে, যা ওয়েবারের কারিশমাটিক ক্ষমতার ধারণার সাথে মেলে।

অন্যদিকে, রাষ্ট্র বা প্রশাসন কখনো আন্দোলন দমন করতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা আইনি-যৌক্তিক ক্ষমতার উদাহরণ। আবার, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে কিছু ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা প্রথাগত ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে। ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষমতার বাস্তবায়ন ও বিরোধিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করে, যা ওয়েবারের ক্ষমতা সংজ্ঞার আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সরকার ও প্রশাসনের প্রতিক্রিয়াও ক্ষমতার এই দ্বন্দ্বের একটি বড় অংশ। যখন আন্দোলন শাসকের বিরুদ্ধে যায়, তখন সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কখনো কখনো পুলিশি দমন-পীড়ন বা আইনি বাধা তৈরি করা হয়, যা ক্ষমতার কাঠামোর ভেতরে থেকেই সংগঠিত হয়। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলোর মাধ্যমে আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে ওয়েবারের ক্ষমতা তত্ত্ব ব্যবহার করলে বোঝা যায়, ছাত্র

আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের দাবির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না; এটি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি অংশ। ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের উত্থান-পতন, আন্দোলনের ফলাফল এবং প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া - সবকিছুই ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ। ওয়েবারের তত্ত্বের আলোকে এই ছাত্র আন্দোলনের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এটি শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাসকে প্রভাবিত করে। কার্ল মার্ক্সের ক্ষমতা বিষয়ক ধারণা মূলত শ্রেণি সংগ্রাম ও পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি ক্ষমতাকে কেবলমাত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আধিপত্য হিসাবে দেখেননি বরং এটি অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা শ্রেণিগত সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্সের মতে, যে গোষ্ঠী উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, তারাই ক্ষমতার মালিক। এই ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অর্থনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমেও এটি প্রতিষ্ঠিত হয় (মার্ক্স ও এঙ্গেলস ১৮৪৮:২৫-২৬)।

বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ বিশ্লেষণে মার্ক্সের ক্ষমতা তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলন প্রায়শই বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, বিশেষত যখন তা শ্রমিক শ্রেণি, বেকার যুবক বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। যেমন, শিক্ষা খাতে দুর্নীতি ও চাকরির অনিয়মের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলিকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়, এগুলো কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষার জন্য নয় এটি শাসক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত শ্রেণির প্রতিরোধের একটি রূপ (মার্ক্স ১৮৬৭: ৪১২-৪১৩)। তাছাড়া, ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক বিভাজনও মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন সাধারণত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে, যেখানে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি শাসকের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের অংশ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, এই আন্দোলনগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকাশ নয়; বরং তা শাসক শ্রেণি বনাম শোষিত শ্রেণির সংঘর্ষের অংশ হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় (মার্ক্স ও এঙ্গেলস ১৮৪৮: ৩৭-৩৮)। এই তত্ত্ব অনুসারে, একাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী বা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে, যাতে একক দল বা গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। হান্স জে. মরগেনথাউ এই তত্ত্বের

প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম, যার মতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলো প্রতিনিয়ত একে অপরের শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে (মরগেনথাউ ১৯৪৮:১২৫-২৯)।

মরগেনথাউ, যিনি শাস্ত্রীয় বাস্তববাদ মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা, মনে করেন যে ক্ষমতার ভারসাম্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘাত, সহযোগিতা এবং নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তার মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত শক্তির জন্য এক প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য অন্যদের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে।[৪] মরগেনথাউর মতে, প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব স্বার্থ, বিশেষ করে তার নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায়। এই স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের শক্তিকে উন্নত করতে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে আগ্রহী থাকে। শক্তির ভারসাম্যের এই প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘাত সৃষ্টি করে। মরগেনথাউর মতে, কোনো একক রাষ্ট্র যদি অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে অন্যান্য রাষ্ট্র তার ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ঐ শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিত্রতা তৈরি করে। এই ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা মূলত নিরাপত্তার জন্য এবং যুদ্ধ বা সংঘাত এড়াতে কাজ করে। ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্ব অনুযায়ী, যদি কোনো অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়, তাহলে সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ে, কারণ অন্যান্য রাষ্ট্র নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সেই শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। মরগেনথাউর মতে, তাই শক্তির ভারসাম্য আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য অপরিহার্য। মরগেনথাউর ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্ব বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, রাষ্ট্রের স্বার্থ ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে।

লাসওয়েল এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র ক্ষমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে নয় বরং আধিপত্য এবং প্রভাব বিস্তারের কৌশল হিসেবেও সংঘর্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলি এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান এবং জনসমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করে, যার ফলস্বরূপ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে একটি ভারসাম্য স্থাপিত হয় (লাসওয়েল ১৯৫০:২৪৬-৫১)। লাসওয়েলের *"পাওয়ার অ্যান্ড সোসাইটি: এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর পলিটিকাল ইনকোয়ারি"* বইটি রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এই বইটির মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি এবং সমাজের কাঠামো, সংস্কৃতি ও

[৪]সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) হলো একটি রাষ্ট্র বা শাসনব্যবস্থার চূড়ান্ত ও স্বাধীন ক্ষমতা, যার মাধ্যমে সে নিজের আইন, নীতি এবং শাসন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই। এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

কার্যক্রমের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা এবং রাজনীতি, ক্ষমতা, এবং সমাজের মধ্যে আস্থার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা। এটি রাজনৈতিক বিজ্ঞানের একটি শাস্ত্রীয় কাজ হিসেবে পরিচিত এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং সংঘর্ষের তত্ত্বগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করে। লাসওয়েল ক্ষমতাকে একটি বিশেষতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে তিনি ক্ষমতাকে কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কীভাবে কার্যকর হয় তা আলোচনা করেছেন। তিনি ক্ষমতাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন, যা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণির মধ্যে বণ্টিত থাকে এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আধিপত্য অর্জন করতে হয়। বইটিতে লাসওয়েল রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গোষ্ঠী, শ্রেণি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলি একে অপরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে। এখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক সমাজের কাঠামো ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে জড়িত। ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভারসাম্যের তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সমর্থন পেতে আগ্রহী, কারণ ছাত্ররা প্রায়ই রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে, ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক ধরনের ভারসাম্যের প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। একদিকে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আদর্শগত অবস্থান তুলে ধরে এবং ছাত্র সমাজের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে, অন্যদিকে ছাত্র আন্দোলনগুলিও নিজেদের রাজনৈতিক সংযোগ এবং শক্তির মাপকাঠির ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান রক্ষা করে। নন্দীগ্রাম, সন্দেশখালি বা অন্যান্য ঘটনা এবং সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পারস্পরিকভাবে প্রভাবিত হয় এবং একটি জটিল ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে।

হেজেমনি তত্ত্ব ও ক্ষমতা

এন্টোনিও গ্রামসি'র হেজেমনি তত্ত্ব ক্ষমতার আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা সমাজের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো দ্বারা ব্যবহৃত হয়। গ্রামসি এই তত্ত্বে দেখান যে, ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো

কেবলমাত্র শারীরিক বা অর্থনৈতিক শক্তির উপর নির্ভর না করে বরং আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে নিজেদের অবস্থানকে সংহত রাখে। তার মতে, আদর্শিক প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীগুলো নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সম্মতি অর্জন করে এবং এই প্রভাবই তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার একটি শক্তিশালী উপায় হয়ে ওঠে (গ্রামসি **১৯৭১:** ২৪৫-৫৬)। পিয়েরে বোর্ডিয়ু তার *"ডিস্টিংকশন: আ সোশ্যাল ক্রিটিক অব দ্যা জাজমেন্ট অব টেইস্ট"* বইয়ে সামাজিক শ্রেণি ও ক্ষমতার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, সামাজিক কাঠামো কেবল ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারণ করে না, বরং এটি তাদের রাজনৈতিক চেতনাকেও প্রভাবিত করে (বোর্ডিয়ু ১৯৮৪:৭৫-৭৬)। এভাবে, রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ এবং সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গড়ে ওঠে। তাঁর বই *ডিস্টিংশন*-এ তিনি আলোচনা করেছেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃতি ও গঠন অনেকাংশে সামাজিক শ্রেণির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁর মতে, সমাজের প্রতিটি শ্রেণি তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পুঁজি, জীবনধারা, এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং আন্দোলনের লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করে। উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন শ্রেণির রাজনৈতিক সচেতনতা, জীবনযাপন এবং সামাজিক আকাঙ্ক্ষার পার্থক্যের কারণে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রভাবও আলাদা হয়ে থাকে।

এই তত্ত্বের আলোকে বর্তমান গবেষণা পত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শিক প্রচার এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে কিভাবে একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক হেজেমনি তৈরি হচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। হেজেমনি তত্ত্ব অনুযায়ী বোঝা গেছে, কিভাবে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র আন্দোলন এবং সাধারণ মানুষের মনোভাব প্রভাবিত করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করছে। এই বিশ্লেষণ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত বাস্তবতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে গঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে বুঝতে সাহায্য করেছে, যা এই গবেষণায় একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-সিস্টেম তত্ত্ব

কার্ল মার্ক্সের ওয়ার্ল্ড সিস্টেম সংক্রান্ত ধারণাগুলি সরাসরি তার লেখায় পাওয়া না গেলেও, তার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও বিশ্বব্যাপী শ্রেণি-বৈষম্যের ধারণা পরবর্তী চিন্তাবিদদের, বিশেষত ইমানুয়েল

ওয়ালারস্টাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা বিশ্লেষণের ভিত্তি তৈরি করেছে। মার্ক্স দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদ কেবলমাত্র উৎপাদনের একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক শোষণ কাঠামো যেখানে কিছু অঞ্চল উন্নত হয় এবং কিছু অঞ্চল অনুন্নত থেকে যায় (মার্ক্স ১৮৬৭: ৪১৫-৪১৭)। এই ধারণা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম তত্ত্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে মূলত কেন্দ্র (Core), আধা-সীমান্ত (Semi-Periphery) ও সীমান্ত (Periphery) অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় (ওয়ালারস্টাইন ১৯৭৪:৯৫-৯৭)। আমার গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মার্ক্সের এই তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, চাকরির বাজারে সংকট এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ছাত্রসমাজ একধরনের কাঠামোগত শোষণের শিকার হয়, যা মূলত একটি বৃহত্তর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিফলন। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণিকে মূল সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, যা তিনি "বিষয়-সম্পত্তি" (Alienation) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (মার্ক্স ১৮৪৪: ৩২-৩৫)। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ চাকরি দুর্নীতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিয়ম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলছে, যা মূলত কেন্দ্র-সীমান্ত শোষণ কাঠামোরই একটি অংশ (ওয়ালারস্টাইন ১৯৮০: ৬২-৬৪)। এই গবেষণায় মার্ক্সের ধারণাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বোঝাতে সাহায্য করে যে ছাত্র আন্দোলন কেবল তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়; বরং এটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের অংশ। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলোর মধ্যে বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নিয়োগসংক্রান্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদগুলি মূলত শ্রম ও পুঁজি সম্পর্কিত দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। ফলে, মার্ক্সের পুঁজিবাদ-বিরোধী বিশ্লেষণ ও ওয়ালারস্টাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র বুঝতে একটি কার্যকর কাঠামো প্রদান করে।

ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইনের বিশ্ব-সিস্টেম বিশ্লেষণ পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামো ও শক্তির অবস্থান বিশ্লেষণ করে, যেখানে বৈষম্য, শোষণ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বকে কেন্দ্র (Core), সেমি-পেরিফেরি (Semi-Periphery) ও পেরিফেরি (Periphery) এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। কেন্দ্র অঞ্চলের দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, প্রযুক্তিতে উন্নত এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করে। বিপরীতে, পেরিফেরি অঞ্চলের দেশগুলো শোষিত হয়, এবং সেমি-পেরিফেরি মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করে। ওয়ালারস্টেইন দেখিয়েছেন, আধুনিক বিশ্ব-সিস্টেম ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়

পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং এটি ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয় (ওয়ালারস্টেইন ২০০৪:৫৫-৫৮)। তবে, তিনি মনে করেন এই পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতি এখন তার কাঠামোগত সংকটের মুখে, যেখানে বৈষম্য ও শোষণ আরও তীব্র হচ্ছে এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। পেরিফেরি অঞ্চলের অর্থনৈতিক শোষণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, যা ছাত্র আন্দোলনের জন্ম দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে ছাত্র আন্দোলন পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশলগত অংশ হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া, আন্দোলনগুলোর মধ্যে কেন্দ্র-পেরিফেরি বৈষম্যের প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে ছাত্ররা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। ওয়ালারস্টেইনের তত্ত্ব বর্তমান গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ছাত্র আন্দোলনের কাঠামোগত কারণ ও পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনীতির প্রভাব বিশ্লেষণে সহায়তা করে।

আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্কের বিশ্ব-সিস্টেম বিশ্লেষণ পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে শোষণ, নির্ভরশীলতা এবং কেন্দ্র-পরিধি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গঠিত। ফ্রাঙ্ক মনে করেন, আধুনিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যেখানে কিছু দেশ বা অঞ্চল কেন্দ্র হিসেবে অবস্থান করে এবং অন্যগুলো পরিধি হিসেবে শোষিত হয়। এই শোষণের ফলে পরিধি অঞ্চলগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং তারা একটি নির্ভরশীল অবস্থার মধ্যে আটকে পড়ে (ফ্রাঙ্ক ১৯৬৯:২৩-২৫)। অর্থনৈতিক কাঠামোর এই বৈষম্য শুধুমাত্র উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরেও প্রভাব ফেলে, যেখানে রাষ্ট্রীয় নীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত হয় বিশ্ব-সিস্টেমের বৃহত্তর কাঠামোর দ্বারা (ফ্রাঙ্ক ১৯৭৮:১৫-১৭)। ফ্রাঙ্কের দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের মতো ঘটনাগুলোকে শুধুমাত্র স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংকটের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যাবে না, বরং এগুলোকে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কাঠামোর অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তিনি দেখান যে, পরিধি অঞ্চলের দেশ বা অঞ্চলগুলো কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও সস্তা শ্রমের যোগানদাতা হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, বরং এখানকার জনশক্তির প্রতিও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানগুলোর তেমন কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না (ফ্রাঙ্ক ১৯৮০:২৯-৩২)। এই নির্ভরশীলতা কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। যখন শিক্ষিত যুবকরা পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান পায় না, যখন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়, তখন ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর প্রসঙ্গ বিবেচনা করলে দেখা যায়, নিয়োগ দুর্নীতি এবং চাকরির সুযোগ সংকুচিত হওয়ার কারণে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ফ্রাঙ্ক দেখিয়েছেন, এই ধরনের সংকট শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর বিশ্ব-সিস্টেমের কাঠামোগত বৈষম্যের প্রতিফলন, যেখানে পুঁজিবাদী কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থপর নীতির কারণে পরিধি অঞ্চলগুলো একটি শোষণমূলক চক্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে (ফ্রাঙ্ক ১৯৭৯:৪১-৪৩)। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, কিন্তু চাকরির সুযোগ তুলনামূলকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পরছে এবং বিক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পরছে। ফ্রাঙ্কের মতে, পরিধি অঞ্চলের জনগণ কেবল শোষিত হয় না, বরং তারা প্রতিরোধও গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধ কখনো কৃষক বিদ্রোহ, কখনো শ্রমিক আন্দোলন, আবার কখনো ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় (ফ্রাঙ্ক ১৯৮১:৩৫-৩৭)। ছাত্র আন্দোলনগুলোকে যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যায় যে, এগুলো শুধুমাত্র প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে নয়, বরং বৃহত্তর বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও একটি প্রতিক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয়, বরং তা বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি অংশ, যেখানে শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিকীকরণ এবং বৈষম্য সুস্পষ্ট (ফ্রাঙ্ক ১৯৮৪:৪৭-৫০)। ফ্রাঙ্ক দেখিয়েছেন, বিশ্ব-সিস্টেমের কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর নীতি ও পুঁজিবাদী কাঠামো কেবলমাত্র পরিধি অঞ্চলের অর্থনৈতিক শোষণকে নিশ্চিত করে না, বরং এখানকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রসঙ্গেও এটি লক্ষ করা যায়। ফ্রাঙ্কের ভাষ্য অনুযায়ী, যখন পরিধি অঞ্চলের জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখন কেন্দ্র বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন শ্রেণী তাদের দমন করতে চায়, কিন্তু একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে এই আন্দোলনগুলোকেও ব্যবহার করতে চায় (ফ্রাঙ্ক ১৯৮৫:৫২-৫৫)।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময় ছাত্র আন্দোলনগুলোর রাজনৈতিক রং পরিবর্তন হয়েছে এবং বিভিন্ন দল এই আন্দোলনগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এর ফলে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য কখনো কখনো বিকৃত হয়ে যায়, যা ফ্রাঙ্কের তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে, তা বিশ্ব-সিস্টেমের সংকটের প্রতিফলন। একদিকে প্রযুক্তি ও জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটছে,

অন্যদিকে শিক্ষিত যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। ফ্রাঙ্ক দেখিয়েছেন, এই ধরনের সংকটের সময় পরিধি অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে এবং সামাজিক প্রতিবাদের নতুন নতুন রূপ দেখা যায় (ফ্রাঙ্ক ১৯৭৮:১৫-১৭)। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সার্বিকভাবে, ফ্রাঙ্কের বিশ্ব-সিস্টেম বিশ্লেষণ ছাত্র আন্দোলনের বৈশ্বিক ও কাঠামোগত বিশ্লেষণের একটি কার্যকরী পদ্ধতি প্রদান করে। এটি শুধুমাত্র স্থানীয় সংকটের প্রতিফলন নয়, বরং বৃহত্তর পুঁজিবাদী কাঠামোর অংশ। ফলে, ছাত্র আন্দোলনকে বুঝতে হলে কেবল রাষ্ট্রীয় নীতির সীমাবদ্ধতার দিকটি নয়, বরং বৈশ্বিক পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার প্রভাবকেও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব: গবেষণার প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত বিশ্লেষণ

সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব অনুযায়ী, সমাজে রাজনৈতিক বা সামাজিক সংঘাত, অসন্তোষ এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এই তত্ত্ব মূলত সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে কাজ করে, যেখানে সংঘাত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাজিক কাঠামো এবং রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। ডেভিড স্নো এবং রবার্ট বেনফোর্ড সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে 'ফ্রেমিং' অর্থাৎ আন্দোলনের লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু স্পষ্ট করা, সংগঠন এবং প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যোগগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।[9] তাঁদের মতে, সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, কারণ একটি কার্যকর আন্দোলন জনমত এবং সমর্থন সংগ্রহ করে সংঘাতের মাধ্যমে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে এবং ক্ষমতার কাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে (স্নো ও বেনফোর্ড ১৯৮৮:১৯৭-২১৭)। চার্লস টিলির সামাজিক আন্দোলন তত্ত্বের দৃষ্টিকোণে আন্দোলনের পরিকাঠামো এবং সংগঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। তাঁর মতে, সামাজিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে, যেখানে আন্দোলনগুলো রাজনৈতিক শক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং সংঘাতের মাধ্যমে নিজের শক্তিকে আরও কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। টিলি বলেন যে, সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্থান দাবি করে এবং সংঘাতের মাধ্যমে সমাজে একটি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় (টিলি ২০০৪:৯৫-১০৫)। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক

[9]ফ্রেমিং হলো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো বিষয় বা ঘটনা উপস্থাপনের ধরন, ভাষা, বা দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করা হয়। এটি সমাজবিজ্ঞান, যোগাযোগ, রাজনীতি, ও গণমাধ্যম অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ছাত্র আন্দোলনের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান গবেষণায় দেখানো হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার আদর্শগত এবং কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ছাত্র আন্দোলনের ধরণগুলি সামাজিকভাবে কি এবং কিভাবে প্রভাবিত করেছে? পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে যেখানে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা রাজনৈতিক সংঘাতের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলন, চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন এবং নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা এই সকল আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা এবং তাদের দাবিগুলোর গভীরতা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলনগুলো নিজেদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তুলে ধরতে সক্ষম হয় এবং সেই অনুসারে সমর্থন লাভ করে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘাতের সৃষ্টি হয়, যেখানে ছাত্ররা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি নিয়ে সামনের সাঁরিতে থাকে।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার আলোচনা

ক্ষমতার আলোচনা আমাকে বিভিন্ন আন্দোলনের আন্দোলনকারীর ভুমিকা এবং তার উদ্দেশ্যকে বোঝার জন্য সাহায্য করে। তার কারণ ফুকোর সার্বভৌম ক্ষমতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষমতা আমাদের আন্দোলনের সামাজিক বিস্তৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে। মিশেল ফুকোর ক্ষমতার তত্ত্ব বর্তমান গবেষণার আলোচনার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষতঃ যখন পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং প্রতিরোধের প্রশ্ন সামনে আসে। ফুকোর মতে, ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্র বা শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত নয়, বরং এটি প্রতিটি সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রয়োগিত হয় (ফুকো ১৯৭৫:২৫-২৭)। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়, যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং পুলিশসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রদের আন্দোলন পরিচালনা করতে চায়। ফুকোর *"ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ"* বইয়ে আলোচিত শৃঙ্খলা ও নজরদারির ধারণা বর্তমান গবেষণার আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দেখায় যে, প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার আন্দোলন দমন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে, যেমন নজরদারি,

পুলিশের দমন-পীড়ন এবং আন্দোলনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা (ফুকো ১৯৭৫:৩০-৩২)। এছাড়াও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রশাসনিক কঠোরতা এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছাত্রদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা ফুকোর শৃঙ্খলাব্যবস্থার তত্ত্বের সাথে মিলে যায়। ফুকোর *বায়ো পাওয়ার* এর ধারণা থেকেও এই গবেষণার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[10] তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক রাষ্ট্র কেবল আইন-শৃঙ্খলা ও শারীরিক শাস্তির মাধ্যমে নয়, বরং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষানীতি এবং অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করে (ফুকো ১৯৭৮:৩৫-৩৭)। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষানীতি এবং চাকরির বাজারকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। যেমন, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, চাকরির সংকট এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে ছাত্রদের ক্ষোভকে অনেক সময় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ফুকো বলেন, যেখানে ক্ষমতা কাজ করে, সেখানেই প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে (ফুকো ১৯৮২:৭৮-৮০)।

এই গবেষণা পত্রের মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো, কিভাবে ছাত্র আন্দোলনগুলো ক্ষমতার নির্দিষ্ট কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় এবং কীভাবে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলসমূহ এই প্রতিরোধকে মোকাবিলা করতে চায়, তা বোঝার চেষ্টা করা। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে চাকরির স্বচ্ছতা, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, তা ফুকোর প্রতিরোধ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অতএব, ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্ব এই গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী কাঠামো প্রদান করে। এটি ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভূমিকা, শৃঙ্খলা ও নজরদারির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের কৌশল এবং প্রতিরোধের রূপ বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলিকে এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায়, কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব ছাত্রদের সংগ্রামকে প্রভাবিত করছে।

ডেপ্রাইভেশন থিওরি সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বঞ্চনার অনুভূতিকে চিহ্নিত করে। এই তত্ত্ব অনুসারে, একটি গোষ্ঠী যখন উপলব্ধি করে যে তারা নির্দিষ্ট সুবিধা, অধিকার বা সম্পদ থেকে বঞ্চিত, তখন সেই বঞ্চনা সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলে (ম্যাকঅ্যাডাম,

---

[10] বায়ো-পাওয়ার (Biopower) ধারণাটি ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault) প্রবর্তন করেছেন। এটি রাষ্ট্র ও ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাককার্থি অ্যান্ড জাল্ড ১৯৮৮)। বর্তমান গবেষণা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে দেখার প্রয়াস নিয়েছে। এবসোলুট ডেপ্রাইভেশন এমন এক পরিস্থিতি যেখানে একটি গোষ্ঠী মৌলিক প্রয়োজনীয় উপাদান, যেমন শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্যসেবা, বা ন্যায়বিচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর একটি বড় অংশই শিক্ষাগত দুর্নীতি ও চাকরির অনিশ্চয়তার কারণে গড়ে উঠেছে। যেমন, এসএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ ছাত্রদের আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। চাকরির নিশ্চয়তা না থাকা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিয়ম এবং স্বচ্ছতার অভাবের কারণে শিক্ষিত যুবসমাজ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তায় ভুগছে, যা এবসোলুট ডেপ্রাইভেশনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ (অপ ১৯৮৮:১৩৪)।

রিলেটিভ ডেপ্রাইভেশন তখন ঘটে যখন একটি গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় নিজেদেরকে বঞ্চিত অনুভব করে। এটি শুধুমাত্র বস্তুগত অভাব নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের অনুভূতিজনিত অসন্তোষের মাধ্যমে প্রকাশ পায় (অপ ১৯৮৮:১২৭)। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনে রিলেটিভ ডেপ্রাইভেশনের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কিছু ব্যক্তি ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকায় বা ঘনিষ্ঠ দলীয় পরিচিতির কারণে চাকরি পেয়ে যায়, অথচ মেধাবী ছাত্ররা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়, তখন বঞ্চনার এই অনুভূতি একটি শক্তিশালী আন্দোলনের জন্ম দেয়। একইভাবে, উচ্চবিত্ত বা ক্ষমতাসীনদের সন্তানরা যখন উন্নত শিক্ষার সুযোগ পায়, অথচ নিম্নবিত্ত ছাত্ররা মৌলিক শিক্ষা সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়, তখন এটি রিলেটিভ ডেপ্রাইভেশনের মাধ্যমে আন্দোলনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ডেপ্রাইভেশন থিওরির আলোকে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বঞ্চনার অনুভূতি থেকেই আন্দোলন সংগঠিত হয় না, বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ম্যাকঅ্যাডাম, ম্যাককার্থি এবং জাল্ডের মতে, আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে সংগঠন, সম্পদ এবং নেতৃত্বের ওপর (ম্যাকঅ্যাডাম ম্যাককার্থি জাল্ড ১৯৮৮:১৩৫)। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ছাত্র আন্দোলনগুলি প্রায়শই রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে, যা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। কেডি অপ্পের মতে, ডেপ্রাইভেশন থিওরি গোষ্ঠীগত বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেও, এটি আন্দোলনের সংগঠন ও নেতৃত্বের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব ও সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন বা নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা সম্পর্কিত ছাত্র

আন্দোলনগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্ততা দেখা যায়, যা কেবলমাত্র বঞ্চনার অনুভূতির কারণে নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ হিসেবেও কাজ করে।

ডেপ্রাইভেশন থিওরি পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী কাঠামো প্রদান করলেও, এটি আন্দোলনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় না। বঞ্চনার অনুভূতি একটি প্রাথমিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করলেও, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা, সাংগঠনিক কাঠামো এবং সামাজিক সংহতির মাত্রা আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণায় ডেপ্রাইভেশন থিওরির পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকা বিবেচনায় এনে ছাত্র আন্দোলনের একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রিসোর্স মবিলাইজেশন থিওরি

রিসোর্স মবিলাইজেশন-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, সামাজিক আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কেবল বঞ্চনা বা অসন্তোষ যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ সম্পদ এবং দক্ষ সংগঠন। এই তত্ত্বের মতে, অর্থ, জনবল, সামাজিক যোগাযোগ, মিডিয়া এবং রাজনৈতিক সমর্থনের মতো সম্পদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে আন্দোলন সফল হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন সিভিল রাইটস আন্দোলন এবং আধুনিক অ্যান্টি-গ্লোবালাইজেশন আন্দোলন সংগঠিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সফল হয়েছিল।[11] ডবসন তাঁর তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিক আন্দোলনের সফলতা এবং কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সম্পদ এবং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উপর। তিনি বলেন যে, সংগঠনের মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ এবং সম্পদের প্রাপ্যতা আন্দোলনের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক (ডবসন ২০০১:৭৮-৮০)। অন্যদিকে, ফোয়ারকার তার গবেষণায় সামাজিক আন্দোলনের সফলতার জন্য সম্পদের গুরুত্বকে অপরিহার্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, আন্দোলনকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ প্রয়োজন, বিশেষ করে আর্থিক, মানবসম্পদ এবং সামাজিক যোগাযোগের মতো উপাদানগুলি (ফোয়ারকার ১৯৯৫:৪৫-৫০)। রিসোর্স মবিলাইজেশনের তত্ত্ব সামাজিক আন্দোলনের সফলতার জন্য সংগঠিত সম্পদের গুরুত্বকে তুলে ধরে। এটি আমাদের শেখায় যে, আন্দোলনের

[11] অ্যান্টি-গ্লোবালাইজেশন (Anti-Globalization) আন্দোলন মূলত বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংগঠিত হয়। আধুনিক অ্যান্টি-গ্লোবালাইজেশন আন্দোলন বিশ্বব্যাপী নয়া-উদারবাদী অর্থনীতি, বহুজাতিক কর্পোরেশন, অসম বাণিজ্যনীতি, পরিবেশ ধ্বংস এবং সামাজিক অসমতার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে।

শক্তি শুধুমাত্র প্রেরণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সঠিক কৌশল, সম্পদ এবং নেতৃত্ব আন্দোলনের কার্যকারিতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই তত্ত্বের মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক আন্দোলনের সফলতার মাপকাঠি বোঝা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিক্ষাগত বঞ্চনা বা চাকরির সংকটই মূল কারণ নয়। বরং রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পদ, সংগঠনের কাঠামো এবং কৌশলগত পরিকল্পনাও আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ছাত্র সংগঠনগুলোর আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন, মিডিয়ার ব্যবহার এবং জনসম্পৃক্ততা আন্দোলনের কার্যকারিতার ওপর প্রভাব ফেলে।

সুতরাং, রিসোর্স মোবিলাইজেশনের তত্ত্ব এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, কারণ এটি দেখায় যে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র বঞ্চনার অনুভূতির কারণে নয়, বরং সংগঠন এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের কারণেও টিঁকে থাকে এবং সফলতা লাভ করে। বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপটে, রিসোর্স মোবিলাইজেশন তত্ত্ব ছাত্র আন্দোলনের সফলতার জন্য সংগঠন, নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক সমর্থনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে তুলে ধরে। ছাত্র আন্দোলন, যা পূর্বে বঞ্চনার অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে, তা কার্যকরভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হলে সফল হয়। বিশেষতঃ, রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের সমর্থন, ছাত্রদের মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সংগঠন ও নেতৃত্বের দক্ষতা, আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। ডবসন, ফোয়ারকার এবং ম্যাকঅ্যাডাম-এর মতো তাত্ত্বিকরা যে ধারণা দিয়েছেন, তা বর্তমান গবেষণায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, যেখানে ছাত্র আন্দোলনের সফলতার জন্য সাংগঠনিক দিকগুলো যেমন- নেতৃত্ব, সম্পদ এবং রাজনৈতিক সমর্থনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তবে, রিসোর্স মোবিলাইজেশন থিওরি একমাত্র আন্দোলনের সাফল্য ব্যাখ্যা করতে পারছে না, কারণ এতে আন্দোলনের প্রেরণা, আদর্শিক দিক এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রভাবকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি, যা বর্তমানে গবেষণায় বিশদভাবে আলোচিত হচ্ছে। এছাড়া, সামাজিক আন্দোলনের সফলতার জন্য কেবল সম্পদের প্রাপ্যতা যথেষ্ট নয়, এর সাথে সংগঠনের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ, যা রিসোর্স মবিলাইজেশন থিওরি থেকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করছে। বর্তমান গবেষণার মধ্যে এই দৃষ্টিকোণটি বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে, যেখানে ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক দলের ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত।

পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি

পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি একটি বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব, যা সামাজিক আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে। এই তত্ত্বে মূলতঃ বলা হয়েছে যে, সামাজিক আন্দোলনের ফলাফল প্রধানতঃ রাজনৈতিক সুযোগ এবং রাষ্ট্রের চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। এটি বিশেষভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সরকারি নীতিমালা এবং সমাজে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে আন্দোলনের গতিপথ প্রভাবিত করে তা বোঝায়। একটি রাষ্ট্র যদি কঠোর এবং দমনমূলক হয়, তবে তার মূল লক্ষ্য আন্দোলনকে প্রতিহত করা। এ ধরনের নীতিতে আন্দোলনকারীদের ওপর বলপ্রয়োগ, নিষেধাজ্ঞা এবং সশস্ত্র দমন ব্যবহৃত হয়। ফলস্বরূপ, আন্দোলন দুর্বল হয়ে পরে অথবা ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্র যদি তুলনামূলকভাবে দুর্বল বা সহনশীল হয়, তখন আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীরা রাজনৈতিক সুযোগ পায়। সরকার বা রাষ্ট্রের সহানুভূতিশীল অবস্থান আন্দোলনকারীদের সংগঠিত হতে এবং তাদের দাবিগুলি বাস্তবায়িত করতে সহায়ক হয়। চিলিতে ১৯৭৩ খ্রিঃ থেকে ১৯৯০ খ্রিঃ পর্যন্ত অগাস্তো পিনোশেটের সামরিক সরকার একটি দমনমূলক শাসনব্যবস্থা চালু রেখেছিল। রাজনৈতিক বিরোধীদের আটক, নির্যাতন এবং হত্যার মতো ঘটনাগুলি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নিস্তেজ করেছিল। এ ধরনের দমনমূলক নীতির কারণে আন্দোলনকারীদের পক্ষে সংগঠিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপে পরিবেশ রক্ষার জন্য সবুজ আন্দোলন তুলনামূলকভাবে সহনশীল ও গণতান্ত্রিক সরকারের উপস্থিতিতে সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারি সমর্থন এবং পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নে ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।[12] পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি সামাজিক আন্দোলন বিশ্লেষণে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং তার নীতির প্রভাবকে গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা এই তত্ত্বকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন: চার্লস টিলি পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরিতে সামাজিক আন্দোলনগুলিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন, যেখানে আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তিনি মনে করেন যে সামাজিক আন্দোলনের সাফল্য রাষ্ট্রের সাড়া এবং প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল (টিলি ১৯৭৮:১০৫-১০)।

ওয়েল্চ, ডোয়াইন ডি. সামাজিক আন্দোলনগুলির জন্য রাজনৈতিক সুযোগ এবং সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রসেস এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার নীতি আন্দোলনকারীদের

[12] সবুজ আন্দোলন হল পরিবেশ ও প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। এটি মূলত জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ, বন উজাড়, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস, টেকসই উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচারের ওপর গুরুত্ব দেয়।

লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে বা বাধা সৃষ্টি করে (ওয়েল্চ ১৯৮১:৮৯-৯৫)। পিনক পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরির মধ্যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আন্দোলনকারীদের কৌশলগত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, যখন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন বা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তখন আন্দোলনকারীরা সফলতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় (পিনক ১৯৮০:৭০-৭৫)। পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি সামাজিক আন্দোলনের কার্যকারিতা বুঝতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। এটি আন্দোলনকে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ সংগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং বাহ্যিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার দিক থেকেও বিশ্লেষণ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে সরকারি দমন নীতি এবং রাজনৈতিক সুযোগের অভাব ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষত, সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গেও এই তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক হতে পারে। পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি সামাজিক আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে রাষ্ট্রের নীতি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করে। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, একটি রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতি আন্দোলনের গতি এবং সাফল্যকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে, যেমন চিলির পিনোশেট সরকারে দেখা গেছে। অন্যদিকে, একটি সহনশীল বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে, যেমন ইউরোপের সবুজ আন্দোলন।

বর্তমান গবেষণায় পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনগুলোতে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, যেমন- নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতি বা রাজনৈতিক সুযোগের অভাব আন্দোলনের গতিপথ এবং ফলাফলকে প্রভাবিত করেছিল। এই তত্ত্বের আলোকে, ছাত্র আন্দোলনগুলি রাষ্ট্রের সাড়া এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর সহানুভূতিশীল বা দমনমূলক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চার্লস টিলি, ওয়েলচ এবং পিনকের মতো তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, যা রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক পরিবেশের গুরুত্বকে সামনে এনেছে, তা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে, এটি দেখা যায় যে আন্দোলনের ফলাফল অনেক সময় রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং সরকারের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। সুতরাং, পলিটিক্যাল প্রসেস থিওরি ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণে নতুন দৃষ্টিকোণ

যোগ করছে, যা বর্তমান গবেষণার সঙ্গে মেলে। এই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ছাত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার বা সফলতার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক পরিবেশ, সরকারি নীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব বুঝতে সাহায্য করছে।

স্ট্রাকচারাল স্ট্রেইন থিওরি

স্ট্রাকচারাল স্ট্রেইন থিওরি, সমাজবিজ্ঞানী নিল স্মেলসার কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি তত্ত্ব, যা সামাজিক আন্দোলনের উত্থান ও বিকাশকে ব্যাখ্যা করে। স্মেলসারের মতে, সমাজে একটি আন্দোলন তৈরি হতে ছয়টি নির্দিষ্ট উপাদান প্রয়োজন। এই উপাদানগুলো আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থা থেকে চূড়ান্ত রূপ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। সামাজিক আন্দোলনের সফলতার পেছনে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাজ করে (স্মেলসার ১৯৬৫:৪৭-৫০)।

- প্রথমত, একটি বাস্তব সমস্যার অস্তিত্ব থাকতে হয়, যা সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, যেমন বর্ণবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য বা শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি।
- দ্বিতীয়ত, সমস্যাটি চিহ্নিত করে এর কারণ ও সমাধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা জরুরি।
- তৃতীয়ত, সমস্যার সমাধানের জন্য একটি আদর্শ বা মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যা আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দেয়।
- চতুর্থত, আন্দোলনের সূচনার জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা প্রয়োজন, যা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৫ খ্রিঃ রোজা পার্কসের বাসে বসার প্রতিবাদ *আমেরিকার সিভিল রাইটস আন্দোলনের* গতি বাড়িয়ে দেয়।
- পঞ্চমত, সরকারের প্রতিক্রিয়া আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে—সরকার নমনীয় হলে আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারে, আর কঠোর দমন নীতি আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। শেষতঃ, সফল আন্দোলনের জন্য সংগঠিত সম্পদের প্রয়োজন হয়। যেমন- অর্থ, জনবল এবং সাংগঠনিক দক্ষতা।

রোজা পার্কসের প্রতিবাদের পর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা সংগঠিত সম্পদের মাধ্যমে টিঁকে থাকে এবং বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। স্ট্রাকচারাল স্ট্রেইন থিওরি সামাজিক আন্দোলনের কার্যকারিতা এবং তার কারণগুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে। এই তত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, আন্দোলন কোনো একটি পৃথক ঘটনায় জন্মায় না; বরং এটি বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের সমষ্টিগত ফলাফল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেমন ছাত্র আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলন, এই তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

এই গবেষণা পত্রে মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত, গবেষণা পত্রটি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করবে, বিশেষঃ করে রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া এবং বিরোধ আন্দোলনের গতিপথ কীভাবে প্রভাবিত করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার ফলে ছাত্র আন্দোলনগুলি কীভাবে উদ্ভূত হয়েছে এবং তারা কীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি তিনটি প্রধান তত্ত্ব—রিসোর্স মবিলাইজেশন থিওরি, পলিটিকাল প্রসেস থিওরি এবং স্ট্রাকচারাল স্ট্রেইন থিওরি—এর আলোকে ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবে। এই তত্ত্বগুলির মাধ্যমে আন্দোলনগুলির কার্যকারিতা এবং সাফল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হবে এবং সেগুলির প্রেক্ষিতে বর্তমান ছাত্র আন্দোলনগুলির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষঃ করে, এই তত্ত্বগুলির মাধ্যমে আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সংগঠনের দক্ষতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে, যা আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতায় নির্ধারণী প্রভাব ফেলে। রাষ্ট্রের ভূমিকাও এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবেশ, সরকারের দমনমূলক বা সহনশীল মনোভাব, এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ ও কার্যকারিতা কিভাবে প্রভাবিত করে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এই গবেষণায়। একইভাবে, আন্দোলনের জন্য যেসব উপাদান প্রয়োজন; যেমন—অর্থ, জনবল, মিডিয়া সমর্থন, সামাজিক নেটওয়ার্ক—এসবের উপরও আলোচনা করা হয়েছে, যাতে আন্দোলনের সংগঠন ও কৌশলগুলি শক্তিশালী হয়। গবেষণা পত্রটি ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার ভূমিকা এবং তার পরবর্তী প্রভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে, যেমন- কোনো বিশেষ ঘটনা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে এবং এটি কীভাবে আন্দোলনের পথকে নির্ধারণ করে। বিশেষতঃ,

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনার মাধ্যমে, এই গবেষণা পত্রটি ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র এবং তাদের রাজনৈতিক পরিণতির ওপর গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করেছে এবং একটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাদের প্রভাবের বিশ্লেষণ করেছে।

নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি ও বিভিন্ন আন্দোলন

১৯৬০-এর দশকে উদ্ভূত *নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি* (এবার থেকে NSM বলবো) ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে সামাজিক আন্দোলনের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শিক দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে। এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য সমাজে নতুন ধরনের সামাজিক সমস্যা এবং আধুনিকতার সংকটকে বোঝা। জার্গেন হাবারমাস এবং অ্যালাইন ত্যুরেন এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি স্থাপন করেন। নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি সামাজিক আন্দোলনের একটি আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে, যেখানে আন্দোলনগুলো কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত থাকে। এই তত্ত্ব রাষ্ট্র, পুঁজিবাদ ও আধুনিকতার বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াইকে গুরুত্ব দেয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে অবস্থান নেয়। নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট শুধুমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের দিকেও দৃষ্টি দেয়। নারীবাদী আন্দোলন নিউ সোশ্যাল মুভমেন্টের অন্যতম প্রধান উদাহরণ, যা নারীর অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার জন্য লড়াই করছে। এটি শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করারও লক্ষ্য নিয়েছে। পরিবেশবাদী আন্দোলনও এই তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যা পুঁজিবাদী শোষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এটি শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে। একইভাবে, অ্যান্টি-গ্লোবালাইজেশন আন্দোলন বিশ্বায়নের ফলে কর্পোরেট শোষণ এবং স্থানীয় সংস্কৃতির অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে। এই আন্দোলন অর্থনৈতিক সমতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের পক্ষে কাজ করে।

নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি আমাদের দেখায় যে আধুনিক সামাজিক আন্দোলন কেবলমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য পরিচালিত হয় না। বরং এটি ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো বৃহত্তর নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়। এই তত্ত্ব সামাজিক

আন্দোলনের নতুন দিকগুলোকে তুলে ধরে এবং দেখায় যে আন্দোলনের শক্তি শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াইয়ে নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক লড়াইয়েও নিহিত। হেবরমাসের মতে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো আধুনিকতার সংকট এবং যোগাযোগের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তিনি দেখান যে, এসব আন্দোলন ঐতিহ্যগত শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনের তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ এগুলো জীবনমান, পরিচয় এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যুগুলোর উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। তাঁর মতে, এসব আন্দোলন রাষ্ট্র এবং বাজারের মতো কাঠামোগত শক্তির আধিপত্য থেকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের "লাইফওয়ার্ল্ড" রক্ষা করার চেষ্টা করে (হেবরমাস ১৯৮৪:৯৮)। নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোর নৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোর উপর হেবরমাস বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, এই আন্দোলনগুলো সমতা, সহনশীলতা এবং সর্বজনীনতার ধারণাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে (হেবারমাস ১৯৮৪:১০৭-২০)। তবে, তিনি সতর্ক করেন যে, এই আন্দোলনগুলোর অতিরিক্ত বিশেষায়ণ বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে। হেবরমাস নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোকে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা চরিত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন না। বরং, তিনি মনে করেন যে, এই আন্দোলনগুলো আধুনিক সমাজের জন্য নতুন মূল্যবোধ এবং নৈতিক কাঠামো তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো এমন একটি চেতনা তৈরি করে যা সিস্টেমের প্রভাব কমিয়ে লাইফওয়ার্ল্ডের[13] স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে (হেবারমাস ১৯৮৭: ১৩২-১৪৫)।

সামাজিক সংহতি, যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে এই আন্দোলনগুলো মানুষের জীবনমান এবং মানবাধিকারের উন্নতি সাধন করতে পারে (হেবরমাস ১৯৮৪:১৫৬-১৬৮)। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে হেবরমাসের তত্ত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত দুই দশকে ছাত্র আন্দোলনগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। হেবরমাসের ভাষায়, এই আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র প্রতিরোধমূলক নয়, বরং নতুন সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা খাতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চেতনা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছে। এই গবেষণার আলোকে বলা যায়, হেবরমাসের তত্ত্ব আমাদেরকে

---

[13] লাইফওয়ার্ল্ড (Lebenswelt) শব্দটি মূলত জার্মান দার্শনিক এডমন্ড হুসার্ল (Edmund Husserl) তার ফেনোমেনোলজি (Phenomenology) তত্ত্বে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ইর্স্ট হেবরমাস (Jürgen Habermas) এই ধারণাটিকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। লাইফওয়ার্ল্ড বলতে সেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝানো হয়, যা ব্যক্তির দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত হয়। এটি মানুষের বোঝাপড়ার একটি অবচেতনা কাঠামো, যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে বুঝি ও ব্যাখ্যা করি।

নতুন সামাজিক আন্দোলনের গভীর সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বোঝার একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে এটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক লড়াই নয়; বরং সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মানবিক চেতনার পুনর্জাগরণের প্রতিফলন।

তুরাইনের মতে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো আধুনিক পোস্টইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজে উদ্ভূত হয় এবং এগুলো সাংস্কৃতিক ও পরিচয়ভিত্তিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। তিনি মনে করেন, এসব আন্দোলনের লক্ষ্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা শ্রেণিভিত্তিক দাবি নয়, বরং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পরিচয়, মানবাধিকার, এবং সমাজের নৈতিক কাঠামো রক্ষা করা (তুরাইন ১৯৮৮:২২-২৫)। তুরাইন নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোকে সমাজের "স্বনির্মাণ"[14] প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখেন, যেখানে জনগণ সক্রিয়ভাবে নতুন মূল্যবোধ ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে। এই আন্দোলনগুলো রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেয়। আলাঁ তুরাইন আধুনিক সমাজে নতুন সামাজিক আন্দোলনের স্বরূপ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন। তাঁর মতে, সমাজে পরিবর্তন আনতে "ঐতিহাসিকতা" বা সমাজের আত্মনির্মাণের ক্ষমতা প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষমতা সমাজের সদস্যদের তাদের নিজস্ব পরিচিতি, সংস্কৃতি, এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন চালানোর সুযোগ তৈরি করে। তুরাইন নতুন সামাজিক আন্দোলনকে "সিস্টেম বনাম ব্যক্তি" দ্বন্দ্বের মধ্যে স্থাপন করেন। তিনি দেখান, আধুনিক সমাজে সংঘর্ষ আর অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পরিচিতির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তুরাইনের মতে, আধুনিক সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটই প্রধান সংঘর্ষের ভিত্তি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও পরিচিতি রক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোর নির্দিষ্ট বিরোধী শক্তি নেই; বরং এগুলো বহুমুখী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়। তিনি দেখান, আধুনিক সমাজে *মেটাসোশ্যাল গ্যারান্টিস*[15]-এর অভাবের ফলে মানুষ

[14] স্বনির্মাণ বলতে বোঝানো হয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়, আত্মউন্নয়ন এবং স্বকীয়তা গঠনের প্রক্রিয়া। এটি একটি সচেতন ও অবচেতন উভয় প্রক্রিয়া, যেখানে ব্যক্তি তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের পরিচয় ও অবস্থান গড়ে তোলে।

[15] "মেটাসোশ্যাল গ্যারান্টিস" (Metasocial Guarantees) বলতে সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত এমন নীতিগুলিকে বোঝানো হয়, যা সমাজের স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। এটি মূলত রাষ্ট্র

তাদের *হিস্টোরিসিটি* বা আত্মনির্মাণ ক্ষমতার মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে চায়। এসব আন্দোলন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরের বিষয়। আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামো সাংস্কৃতিক অধিকার দমন করায় নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তুরাইনের এই তত্ত্ব আধুনিক সামাজিক আন্দোলনের বহুমাত্রিক চরিত্র বুঝতে সহায়ক।

নতুন সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে ক্লাউস অফির ধারণা আধুনিক সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করার উপর ভিত্তি করে। তিনি মনে করেন, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক বা শ্রেণিভিত্তিক দ্বন্দ্বের চেয়ে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এগুলো সাধারণত জীবনের গুণগত মান, পরিচয়, পরিবেশ, মানবাধিকার, এবং নাগরিক অংশগ্রহণের মতো ইস্যুগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনগুলো রাষ্ট্র এবং বাজারের মতো কাঠামোগত প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নতুন ধরনের যোগাযোগ ও সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করে। অফি বিশ্বাস করেন যে, এসব আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যক্তিরা এবং গোষ্ঠীগুলি আরও স্বতন্ত্র এবং সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়। ক্লাউস অফি তাঁর *"নিউ সোশ্যাল মুভমেন্টস: চ্যালেঞ্জিং দ্য বাউন্ডারিজ অফ ইনস্টিটিউশনাল পলিটিক্স"* প্রবন্ধে নতুন সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। অফি, দেখিয়েছেন যে ১৯৬০-এর দশকের পর যে আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছে, সেগুলো ঐতিহ্যবাহী শ্রেণি-ভিত্তিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এবং আদর্শিক পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করেছে (অফি ১৯৮৫:৮১৭-২৭)। নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো পুরনো রাজনৈতিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ব্যক্তি অধিকার, সামাজিক পরিচয় ও ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্ব দেয়। এগুলো অর্থনৈতিক দাবির চেয়ে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পরিবর্তনের দিকে বেশি মনোযোগী, যেমন পরিবেশবাদী ও নারীবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলো প্রথাগত রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং সামাজিক শক্তিকে সংগঠিত করে এবং জনগণের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে আনে। এদের বৈশিষ্ট্য হলো—বিকেন্দ্রীভূত সংগঠন, বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক প্রতীকী লড়াই। তিনি দেখিয়েছেন যে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোর লক্ষ্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিবর্তন নয়; বরং সমাজের

ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা প্রদান করে, যাতে নাগরিকরা নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা পায়।

সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন করা। এগুলো ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর পরিচয়, অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। আধুনিক সমাজে এই আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র প্রথাগত রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে না, বরং মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে একটি নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করতে চায়।

মেলুচি তাঁর *"নোম্যাডস অফ দ্যা প্রেজেন্ট: সোশ্যাল মুভমেন্টস অ্যান্ড ইনডিভিজুয়াল নিডস ইন কনটেম্পোরারি সোসাইটি"* বইয়ে নতুন সামাজিক আন্দোলনের ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দাবির জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলো মানুষের পরিচয়, সাংস্কৃতিক অধিকার, এবং জীবনের মান উন্নয়নের মতো বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে (মেলুচি ১৯৮৯:২৮-৩০)। মেলুচি যুক্তি দেন যে এই আন্দোলনগুলো একক কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। তিনি এই আন্দোলনগুলোকে "পরিচয় আন্দোলন" বলে অভিহিত করেন, যা সামাজিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং বিকল্প সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। মেলুচির দৃষ্টিতে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রতীকী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। এগুলো "লাইফওয়ার্ল্ড" রক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। তিনি মনে করেন, এগুলো হলো আধুনিক সমাজে ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং মানুষের আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রতিফলন। তিনি নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলিকে "প্রতীকী সংঘাত"[16] হিসেবে দেখেন, যেখানে আন্দোলনগুলোর লক্ষ্য আধুনিক জীবনের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া। এই সংঘাতের মধ্যে, মানুষের পরিচিতি, সাংস্কৃতিক ধারণা এবং মানসিক অবস্থা প্রাধান্য পায়, যা পরবর্তীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। মেলুচি বিশ্বাস করেন যে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোর মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিচিতি সংরক্ষণ এবং তাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করা। এটি শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক এবং মানসিক পরিবর্তনের জন্যও। আধুনিক সমাজে, যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনগণের মধ্যে বৈষম্য, বিভাজন এবং একে অপরের প্রতি অবহেলা রয়েছে, সেখানে এসব আন্দোলন তাদের পরিচিতি

[16] প্রতীকী সংঘাত বলতে বোঝানো হয় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মধ্যে ভাষা, প্রতীক, সংস্কৃতি ও পরিচিতির ভিত্তিতে সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটি শারীরিক সংঘাত নয়, বরং ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ভাষার মাধ্যমে সংঘাতের প্রকাশ।

এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করে। উদাহরণস্বরূপ, নারীবাদী আন্দোলন বা এলজিবিটি অধিকার আন্দোলন, যেখানে মূল দাবি হলো তাদের বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতির সম্মান রক্ষা এবং সমাজে সমান সুযোগের দাবী। এই আন্দোলনগুলি কেবল একটি সামাজিক স্তরের পরিবর্তন নয়, বরং সমাজের সাংস্কৃতিক এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে চায়।

এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সাধারণ থিম হচ্ছে যে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো শুধু বাহ্যিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করে না, বরং সমাজের গভীরে, মানুষের সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং পরিচিতির স্তরে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। ক্যাস্টেলস শহরের সমস্যা ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলনকে দেখেন, তুরাইন সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং সংরক্ষণকে কেন্দ্রীভূত করেন, হেবরমাস সমাজে সম্পর্ক এবং সামাজিক ন্যায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং মেলুচি ব্যক্তিগত এবং প্রতীকী স্তরে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেন। মেলুচির বিশ্লেষণের আলোকে বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে নতুন সামাজিক আন্দোলনের ধারণাগুলি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মেলুচির মতে, নতুন সামাজিক আন্দোলন কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সাংস্কৃতিক পরিচিতি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের দাবি নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে।

এই গবেষণা পত্রের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হলো, ছাত্র আন্দোলন কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে তাদের পরিচয় ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে। মেলুচির "পরিচয় আন্দোলন" ধারণার আলোকে, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনগুলোকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যাবে না; বরং এগুলো তরুণদের সামাজিক পরিচয় ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নতুন সামাজিক আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রতীকী সংঘাত, যা মেলুচি ব্যাখ্যা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোতেও এই প্রতীকী সংঘাতের উপাদান স্পষ্ট। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, সরকারি নীতি, এবং ছাত্রদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনগুলো মূলত সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীকী প্রতিফলন। বিশেষঃ করে, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে

ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি জানায় না, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গটি তুরাইনের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও আত্মপরিচয়ের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। মেলুচি যেমন দেখিয়েছেন, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো কোনো নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় না, বরং একটি জটিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান নেয়। এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মেলুচির "লাইফওয়ার্ল্ড" ধারণার আলোকে ছাত্র আন্দোলনগুলোর সামাজিক তাৎপর্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। অতএব, এই গবেষণা নতুন সামাজিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে চায় এবং মেলুচির প্রতীকী সংঘাত, সাংস্কৃতিক অধিকার ও আত্মপরিচয়ের ধারণাগুলোর আলোকে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক্যাস্টেলস তাঁর *নেটওয়ার্কস অফ আউটরেজ অ্যান্ড হোপ: সোশ্যাল মুভমেন্টস ইন দ্যা ইন্টারনেট এজ* বইয়ে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই আন্দোলনগুলো প্রথাগত নেতৃত্বের চেয়ে বিকেন্দ্রীভূত এবং নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক, যেখানে ইন্টারনেট দ্রুত তথ্য ছড়ানো, যোগাযোগ স্থাপন এবং জনগণকে সংঘটিত করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে (ক্যাস্টেলস ২০১২:২১৩-২৫)। ক্যাস্টেলস নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলোকে "ক্ষোভ" এবং "আশা"র মিশ্রণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ক্ষোভ আসে সামাজিক অবিচার, রাষ্ট্র বা বাজার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আর আশা জন্মায় গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের জন্য। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, এই আন্দোলনগুলো প্রথাগত রাজনৈতিক কাঠামোকে পাশ কাটিয়ে নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পথ তৈরি করে এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুক্ত হয়।

ক্যাস্টেলসের শহুরে আন্দোলনের তিনটি মূল লক্ষ্য নিম্নরূপে চিহ্নিত করেছেন—

- সমষ্টিগত ভোগের অধিকারের দাবি: শহরাঞ্চলে জনগণের জন্য মৌলিক সেবা (যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন) নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলনগুলো সংগঠিত করে। এগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিনিময় মূল্যের বিপরীতে ব্যবহার মূল্যের উপর জোর দেয়।

- সংস্কৃতি ও পরিচিতি রক্ষা: স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সম্প্রদায়ের স্বকীয়তা এবং স্থানভিত্তিক পরিচিতি সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনগুলো ভূমিকা পালন করে। এটি প্রশাসনিক মানসন্মতকরণ এবং শহরের একরূপীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
- রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন: বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে তাদের নিজস্ব এলাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আন্দোলনগুলো সচেষ্ট। তারা স্বশাসন ও স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবি তোলে।

ক্যাস্টেলস দেখিয়েছেন, এই ধরনের আন্দোলনগুলো শুধু স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাসস্থান এবং পরিবেশ রক্ষার জন্যই নয়, বরং বৃহৎ পুঁজিবাদী কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁর তত্ত্ব শহরকেন্দ্রিক নতুন সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে চিহ্নিত করে। উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ ও পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলো সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি রক্ষার প্রতীক। এটি প্রমাণ করে, শহরের প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মুনাফার জন্য নয়, বরং মানবিক এবং পরিবেশগত প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রেও দায়বদ্ধ হওয়া উচিত। নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট তত্ত্ব সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এটি সমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে জোর দেয়। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রেক্ষাপটে নারীবাদী এবং পরিবেশ আন্দোলনের মতো উদাহরণে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান গবেষণা পত্রটি পূর্ববর্তী গবেষণাগুলির তুলনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি উপস্থাপণ করেছে। প্রধানতঃ, এটি পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ককে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছে। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে, সাধারণত ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবগুলি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এই গবেষণা পত্রটিতে বিশেষতঃ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব ও ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে।

লাক্লাউ-এর মতে, পপুলিজমের প্রকৃত অভ্যন্তরীণ শর্তগুলির অভাবই তাকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতি সীমাবদ্ধ করে এবং শেষপর্যন্ত পপুলিস্ট সরকারগুলি কখনোই পূর্ণতায় গণতান্ত্রিক হতে পারে না, বরং তারা সাধারণত কর্তৃত্ববাদী বা অগণতান্ত্রিক পথে চলে যায়। পপুলিজম একটি রাজনৈতিক শৈলী হিসেবে জনসাধারণের মধ্যে একটি "জনগণের" ধারণা সৃষ্টি করে, যেখানে সমাজের বৈষম্য, অবিচার এবং রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি অসন্তোষ একত্রিত হয়। তবে, লাক্লাউ-এর তত্ত্ব অনুসারে, পপুলিজম একটি "অস্থির রাজনৈতিক প্রকল্প" যা গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার পরিসরে সাফল্য অর্জন করতে অক্ষম। গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা একাধিক রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে কার্যকর সমঝোতা এবং সহমত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, কিন্তু পপুলিজমের প্রকৃত স্বভাব এই ধারণাকে মেনে নিতে পারে না (লাক্লাউ ২০০৫:১১০)। পপুলিস্ট সরকারগুলি তাদের শক্তি ধরে রাখতে একটি সংকটের মধ্যে পরে, যেখানে তাদের পক্ষে জনগণের কাছে নিজেদের বৈধতা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে, পপুলিস্ট সরকারগুলি "জনগণতন্ত্র" বা "পপুলার ডেমোক্রেসি" তৈরির নামে প্রায়ই এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা প্রকৃত গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিপরীত। পপুলিজমের অপরিহার্য চরিত্র হল—এটি একধরনের কেন্দ্রীয়কৃত নেতৃত্বের ধারণা তৈরি করে, যেখানে নেতা বা নেত্রী জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বিভিন্ন রাজনৈতিক, জাতিগত বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার পথকে কঠিন করে তোলে। এক্ষেত্রে, 'জনগণ' একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, এর বাস্তবায়ন যখন স্বৈরাচারী পথে হয়, তখন গণতন্ত্রের মৌলিক প্রক্রিয়া এবং আভ্যন্তরীণ শর্তগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণ হিসেবে ভেনেজুয়েলার চাভেজ সরকারের কথা বলা যেতে পারে। হুগো চাভেজ পপুলিস্ট নেতা হিসেবে জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তবে তাঁর শাসনকালে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হয়ে পরে এবং অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। চাভেজের শাসনকালে, "জনগণতন্ত্র" বা জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার পাশাপাশি, সরকার কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ নেয় যা গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে। এর ফলে, পপুলিজমের প্রকৃতি একটি অগণতান্ত্রিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

লাক্লাউ-এর মতে, পপুলিজম একটি "অস্থির রাজনৈতিক প্রকল্প" যা গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার পরিসরে সাফল্য অর্জন করতে পারে না। গণতন্ত্র কার্যকর হতে হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সমঝোতা

ও মতৈক্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু পপুলিজমের প্রকৃতি তা মেনে নিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন নিজেদের আদর্শ ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে আন্দোলন পরিচালনা করায়, এক ধরনের বিভাজন তৈরি হয় এবং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনগুলোর প্রকৃত চরিত্র কি গণতান্ত্রিক নাকি তা দলীয় স্বার্থে পরিচালিত, সে বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পপুলিস্ট সরকারগুলো নিজেদের 'জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি' হিসেবে তুলে ধরে, কিন্তু ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাত্র আন্দোলনের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলেছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলন, চাকরি নিয়োগ কেলেঙ্কারি, বা নির্বাচনী সহিংসতার মতো ঘটনাগুলোতে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। ফলে, ছাত্র আন্দোলনগুলো অনেক সময় তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক চেতনাকে হারিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের এই দলীয় নির্ভরশীলতা পপুলিস্ট শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য। লাক্লাউ দেখিয়েছেন, পপুলিস্ট শাসন জনগণের স্বার্থরক্ষার দাবি করলেও, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে দুর্বল করে। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায়শই সহিংসতার রূপ নেয় এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর কণ্ঠ দলীয় অবস্থানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায় না। উদাহরণস্বরূপ- শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতি ইস্যুতে আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া দলীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হয়েছে, যা আন্দোলনগুলোর প্রকৃত গণতান্ত্রিক চরিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত সাধারণ অন্য তত্ত্ব

মার্টিন টি. আল্টব্যাক ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত তত্ত্বে দশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা কথা তুলে ধরেছেন। এই প্রস্তাবনাতে তিনি ছাত্র আন্দোলনের কারণ, চরিত্র এবং প্রভাব নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এই প্রস্তাবনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো: আল্টব্যাকের মতে, ছাত্র আন্দোলন ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য। এটি বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ ছাত্র আন্দোলন এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। অর্থাৎ, ছাত্র আন্দোলন সাধারণত সমাজের ঐতিহাসিক অস্থিরতা বা সংকটের সময়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এটি সামাজিক পরিবর্তনের একটি পূর্বাভাস হিসেবে কাজ করে (আল্টব্যাক ২০১৮:১৫)। ছাত্র আন্দোলন প্রায়শই একটি

বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অংশ হয়ে ওঠে। যেমন- ভারতে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিহার ছাত্র আন্দোলন যা জরুরি অবস্থার সূচনা ঘটিয়েছিল। এটি রাজনৈতিক দলগুলো এবং সামাজিক আন্দোলনগুলোর সঙ্গে একটি জটিল সম্পর্ক তৈরি করে, যেখানে ছাত্ররা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। ছাত্র আন্দোলনের মূল লক্ষ্য প্রায়শই প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং একটি নতুন সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা। যেমন- ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের প্যারিস ছাত্র বিদ্রোহ। ছাত্ররা প্রায়শই মূলধারার রাজনৈতিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে গিয়ে নতুন রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের দাবি জানায়। আল্টব্যাক দেখিয়েছেন যে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি ও চরিত্র ভৌগোলিক অবস্থান এবং স্থানীয় সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন- পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা, যা স্থানীয় কৃষি সমস্যার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত ছিল। এটি বোঝায় যে, স্থানীয় সমস্যা এবং সুযোগগুলো আন্দোলনের রূপ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়া আধুনিক ছাত্র আন্দোলনের সফলতায় একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। যেমন, ২০১৯ সালের হংকং-এর ছাত্র আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহার। মিডিয়ার মাধ্যমে আন্দোলনের বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি একটি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করে। ছাত্ররা তাদের তরুণ বয়সের উদ্যম এবং নতুন ধারনার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- গ্রেটা থুনবার্গের নেতৃত্বে *গ্লোবাল ক্লাইমেট স্ট্রাইক*। তরুণ প্রজন্মের শক্তি কেবলমাত্র তাদের প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি নতুন ধরনের নেতৃত্ব এবং কৌশলের জন্ম দেয়। আল্টব্যাক উল্লেখ করেন যে ছাত্র আন্দোলনগুলো সংগঠনের নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়। সংগঠনের কাঠামো শক্তিশালী হলে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং প্রভাব বাড়ে। ছাত্র আন্দোলন প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বা চেতনার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। উদাহরণ- ১৯৭১-এর বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা। যা বোঝায় যে আদর্শিক ভিত্তি আন্দোলনের লক্ষ্যে ছাত্রদের উজ্জীবিত করে। মার্টিন টি. আল্টব্যাকের তত্ত্ব শুধুমাত্র ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে না, এটি এর বহুমাত্রিক প্রভাব এবং কারণগুলিও বিশদে আলোচনা করে। এই তত্ত্বটি বোঝার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের বৈশ্বিক চরিত্র এবং তার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব।

রবার্ট লিন্ড (১৯৩৯) ছাত্র আন্দোলনকে সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি এবং প্রগতিশীল চিন্তার সূতিকাগার হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ছাত্র আন্দোলন কেবলমাত্র বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের একটি

শক্তিশালী মাধ্যম। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে যুবসমাজের সক্রিয় প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তর আনতে পারে (লিন্ড ১৯৪১:১২-১৫)। ছাত্র আন্দোলন সামাজিক পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিন্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ের ছাত্র আন্দোলন বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার জন্ম দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- *আমেরিকান নাগরিক অধিকার আন্দোলনে* ছাত্র সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ সামাজিক সমতার প্রতি একটি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছিল (লিন্ড ১৯৪১:৩৫)। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ স্থানীয় কৃষকদের জমির অধিকারের প্রশ্নকে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করেছিল, যা এই গবেষণার প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। লিন্ড ছাত্র আন্দোলনকে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সূতিকাগার হিসেবে দেখেছেন, যেখানে নতুন ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শের বিকাশ ঘটে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন যেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল, তেমনই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ আধুনিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির নতুন মাত্রা তৈরি করেছে (লিন্ড ১৯৪১:৪৫-৪৮)। এই গবেষণাতে আলোচনায়, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে লিন্ডের তত্ত্ব আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে। ছাত্র আন্দোলন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রতীক। লিন্ড দেখিয়েছেন, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ছাত্র আন্দোলন বৃহত্তর সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছে। ভারতের ১৯৭০-এর নকশাল আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, যা বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি গুরুতর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল (লিন্ড ১৯৪১:৬০)। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা জরুরি, কারণ এটি আন্দোলনের প্রকৃত গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

আধুনিক যুগে, ছাত্র আন্দোলন জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গসমতা এবং শিক্ষা অধিকারের মতো বিভিন্ন বৈশ্বিক ও স্থানীয় ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলেছে (লিন্ড ১৯৪১:৭৫)। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রচারণা এবং সংগঠনের ভূমিকা কীভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে, তা এই গবেষণার একটি

গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। রবার্ট লিন্ডের মতে, ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র সামাজিক প্রতিবাদের একটি রূপ নয়; এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রগতিশীল ভিত্তি তৈরির মাধ্যম। এটি যুবসমাজের শক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রতীক, যা বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে (লিন্ড ১৯৪১:৯০)। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে লিন্ডের তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি দেখায় কীভাবে আন্দোলনগুলো বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় এবং কীভাবে তারা গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক চর্চাকে প্রভাবিত করে।

বর্তমান গবেষণা পত্রে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত যে তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়েছে, তাদের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের বৈশ্বিক চরিত্র, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত, গবেষণায় মার্টিন টি. আল্টব্যাক, কার্ল মানহাইম, রবার্ট লিন্ড, মত তাত্ত্বিকদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে যে বহুমাত্রিক এবং আন্তঃসম্পর্কিত দিকগুলি বিদ্যমান তা স্পষ্টভাবে উঠে আসে। এখানে মার্টিন টি. আল্টব্যাকের তত্ত্বের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রতিবাদ এবং পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষতঃ, ছাত্র আন্দোলন যখন বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অংশ হয়ে ওঠে, তখন তার চরিত্র কীভাবে পরিবর্তিত হয় এবং সামাজিক কাঠামোতে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও, আল্টব্যাকের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং তরুণ প্রজন্মের শক্তির বিষয়টি বর্তমান গবেষণায় যুক্ত করা হয়েছে। রবার্ট লিন্ডের তত্ত্বের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা সমাজে নতুন ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে। বর্তমান গবেষণায় লিন্ডের চিন্তা আধুনিক যুগে কতটা প্রাসঙ্গিক, যেখানে ছাত্র আন্দোলন জলবায়ু পরিবর্তন, শিক্ষা অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার মতো বিষয়েও জড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবে, এই গবেষণা পত্রে ছাত্র আন্দোলনের তত্ত্বগুলির মাধ্যমে ছাত্রদের ভূমিকা এবং তাদের সমাজে পরিবর্তন আনার সক্ষমতা সম্পর্কে একটি গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করেছে। পাশাপাশি, পপুলিজম ও ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক এবং সামাজিক কাঠামোয় এর প্রভাব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন

ভারতে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বিভিন্ন লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। এই অংশে তাঁদের তত্ত্ব এবং ধারণাগুলি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকাকে আরও বিশদে বোঝাতে সহায়ক হতে পারে। নীচে প্রধান কয়েকজন লেখকের কাজ এবং ধারণাগুলি বর্তমান গবেষণা গবেষণার প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা হিসেবে দেওয়া হলো—

প্রাক স্বাধীন ভারতঃ আন্দোলনের ইতিহাস

প্রাক-স্বাধীন ভারতে আন্দোলনের ইতিহাস বহুমাত্রিক এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—এই সবকিছু একত্রে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে তোলে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ) ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বৃহৎ সশস্ত্র বিদ্রোহ, যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণঅসন্তোষকে চিহ্নিত করেছিল। এটি একদিকে ব্রিটিশ শাসনের নিষ্ঠুরতা ও শোষণের প্রতিক্রিয়া, আবার অন্যদিকে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও এই বিদ্রোহ সফল হয়নি, তবে এটি পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। ১৯ শতকের শেষ দিকে কংগ্রেসের জন্মের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি সাংগঠনিক রূপ পায়। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথমদিকে ছিল উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি সংস্থা, যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া উত্থাপন করতে শুরু করে। বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পালের মতো নেতা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ধারাকে জোরদার করেন। তাঁদের নীতি ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলা, যা স্বদেশি আন্দোলনের জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালের রাউলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। মহাত্মা গান্ধী অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে শুরু করেন, যার মধ্যে ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ সালের সল্ট মার্চ বা সিভিল ডিজওবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক এবং ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ

বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া প্রাক-স্বাধীন ভারতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এবার থেকে AITUC বলবো) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠে। একইভাবে, তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬) এবং তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ (১৯৪৬-৫১) কৃষকদের ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৃহত্তম আন্দোলনের উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসও প্রাক-স্বাধীন ভারতে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০-এর দশকে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

আমার গবেষণার প্রেক্ষিতে এই আন্দোলনগুলোর গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কিছু ধারা প্রতিফলিত হয়, বিশেষত ছাত্র সংগঠনগুলির রাজনৈতিক ভূমিকা এবং সরকারবিরোধী অবস্থান। যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন একধরনের প্রতিরোধমূলক আন্দোলন, যা ঔপনিবেশিক যুগের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়। স্বাধীনতা-পূর্ব ছাত্র আন্দোলনের মতোই, আধুনিক ছাত্র আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র ছাত্রস্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংঘটিত হয়। অতএব, প্রাক-স্বাধীন ভারতের আন্দোলনের ইতিহাস বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্র বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। এটি দেখায় কিভাবে বিভিন্ন সময়কালে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং ছাত্র সমাজ কিভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ হয়ে ওঠে।

বিপান চন্দ্র তাঁর *"ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেনডেন্স"* বইয়ে দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যই পূরণ করেনি, বরং তা জনগণের মধ্যে সাম্য, ন্যায়, ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাগুলির বীজ বপন করেছে (চন্দ্র ১৯৮৮:১৪০-৪৫)। তাঁর মতে, ছাত্র আন্দোলন জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে প্রেরণা দিয়েছিল, যা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছাত্রদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে,, ছাত্র সমাজ তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রাসঙ্গিক ইস্যুতে অংশগ্রহণ করেছে, বিশেষতঃ নন্দীগ্রাম আন্দোলন বা

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়ও বিদ্যমান।

বর্তমান গবেষণা পত্রে এই ঐতিহ্যকে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সঙ্গে সংযুক্ত করছে, যেমন- নন্দীগ্রাম আন্দোলন, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন। যা দেখাচ্ছে যে, ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র অতীত দিনের ক্ষেত্রে নয়, বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের অভিমুখে কীভাবে কাজ করছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা। এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলিকে একটি বৃহত্তর জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যা বোঝাতে সাহায্য করেছে যে, স্থানীয় ছাত্র আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে, যা পূর্বে কম আলোচিত হয়েছে। বিশেষতঃ, এই গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করছে যে, ছাত্র আন্দোলন কেবল সামাজিক ন্যায় বা রাজনৈতিক চেতনার জন্য নয়, বরং বিশেষ রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও কীভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান গবেষণা পত্রে ছাত্র আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে নয়, বরং সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে দেখেছে। এই গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, কীভাবে ছাত্র সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো এবং স্থানীয় সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রকৃতি ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। যেমন- শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, ভোট পরবর্তী হিংসা বা অন্যান্য সাম্প্রতিক ঘটনাবলি। এই বিষয়গুলোকে ছাত্র আন্দোলনের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, গবেষণা পত্রটি একটি নতুন আলোচনার দিক খুলে দিয়েছে যেখানে ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে আধুনিক সমস্যার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক সমাজ এবং ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের কাঠামো ছিল বহুমাত্রিক শোষণ ও নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমেও নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ছিল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, যা একদিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের উপযোগী একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুলতে সাহায্য

করেছিল, অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশেও ভূমিকা রেখেছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তারের ফলে এক নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে, যা ছাত্রসমাজকে ক্রমশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলে এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের দিকে ধাবিত করে। প্রথমদিকে ছাত্ররা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত না হলেও, তারা সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষার প্রসার, সামাজিক অনাচার দূরীকরণ এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির সমালোচনার মাধ্যমে প্রতিবাদী চেতনা গড়ে তোলে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হতে শুরু করে, তখন ছাত্রসমাজ সরাসরি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে, যখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। তারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, স্বদেশী প্রচার, জনসভা আয়োজন এবং জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের প্রথমভাগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাত্রদের ভূমিকা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বহু ছাত্র ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে এবং বিকল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশ হয়। একইভাবে, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহেও ছাত্ররা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়। তারা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সাথেও সংযুক্ত হতে থাকে। কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রসারের ফলে ছাত্রসমাজ ক্রমশ শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশবিরোধী লড়াইকে শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস নেয়। ১৯৩৬ সালে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এবার থেকে AISF বলবো) গঠিত হওয়ার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলন আরও সংগঠিত রূপ লাভ করে এবং বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এটি ব্রিটিশ বিরোধিতার পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। বিশেষত, ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহ এবং তেভাগা আন্দোলনে ছাত্ররা সরাসরি কৃষক ও শ্রমিকদের সাথে মিলে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন ভারত স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, তখন ছাত্রদের আন্দোলন শুধু ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা কেমন হবে, সেই প্রশ্নেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

আমার গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ

শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ছিল, তেমনি বর্তমান ছাত্র আন্দোলনগুলিও প্রাথমিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, চাকরি নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। ঔপনিবেশিক যুগে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে বিরোধ ও সহযোগিতার সম্পর্ক, যা বর্তমান সময়েও পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে লক্ষ করা যায়। এছাড়া, ঔপনিবেশিক ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং এটি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলিও শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। ফলে ঔপনিবেশিক ছাত্র আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমার গবেষণার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক অবস্থান, আন্দোলনের কৌশল এবং রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়ার একটি তুলনামূলক কাঠামো তৈরি করতে সহায়তা করে।

রণজিৎ গুহ *"এলিমেন্টারি অ্যাসপেক্টস অব পিজেন্ট ইনসারজেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া"* বইয়ে ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজে ছাত্র এবং তরুণদের আন্দোলনের সামাজিক মাত্রা বিশ্লেষণ করেছেন। গুহ বলেছেন, শিক্ষিত তরুণদের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয়, সামাজিক অসন্তোষ এবং প্রতিবাদেরও প্রতিফলন ছিল (গুহ ১৯৮৩:১০৩-১০)। গুহর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলির উদাহরণগুলো (যেমন- ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদ বা চাকরি দুর্নীতির প্রতিবাদ) কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং শিক্ষিত যুব সমাজের সামাজিক দায়িত্বের প্রতিফলন। গুহ'র তত্ত্ব অনুসারে, ঔপনিবেশিক ভারতে ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রা কেবলমাত্র তৎকালীন বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বরং এর ধারাবাহিক প্রভাব স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও দেখা যায়। বর্তমান গবেষণা পত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন, যেমন- ভোট-পরবর্তী হিংসা বা চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। গুহ'র ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবি নয়, বরং সামাজিক অসন্তোষ ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ।

এই গবেষণা পত্রটি একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনগুলোর বহুমাত্রিক চরিত্র বিশ্লেষণ করছে, যা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে প্রাসঙ্গিক। গুহের তত্ত্বের আলোকে, বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে শিক্ষিত যুব সমাজের ভূমিকা এবং দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গ তুলে ধরছে। যা দেখাচ্ছে যে ছাত্র আন্দোলন আজও একটি

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিদ্যমান। উপনিবেশিক শাসনের মতো, বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে ছাত্র আন্দোলন কীভাবে পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বর্তমান গবেষণা পত্রটি গুহের মতো ঐতিহাসিকদের তত্ত্বকে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ- পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে শুধুমাত্র স্থানীয় বা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ব এবং শিক্ষিত যুব সমাজের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন হিসেবে দেখান হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক অসন্তোষের প্রতিফলন নয়, বরং তা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতিক্রিয়া। যেমন- দুর্নীতি, অন্যায় এবং বৈষম্য। গুহর ধারণার ভিত্তিতে, বর্তমান গবেষণায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্য এবং বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছে। যা দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কীভাবে বর্তমান আন্দোলনকে রূপায়িত করেছে। বর্তমান গবেষণায় গুহের ঔপনিবেশিক ভারতের বিশ্লেষণ থেকে আলাদা হয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। বর্তমান গবেষণা পত্রটি ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক দায়িত্বের ধারণাগুলোকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করেছে। যা দেখানোর চেষ্টা করেছে—ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র অতীতের রাজনৈতিক প্রতিবাদের ধারাকে বহন করছে না, বরং সমসাময়িক সামাজিক অসামঞ্জস্য এবং সমস্যাগুলোর প্রতিক্রিয়া হিসেবেও কাজ করছে। এই গবেষণায় একটি নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মোচন করেছে যেখানে ইতিহাস, সমাজ এবং রাজনীতির সংযোগকে পুনঃব্যাখ্যা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের চিত্র

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই বর্তমান গবেষণার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গবেষণা পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছাত্র আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীভাবে ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, সেটি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। গান্ধীর সময়কার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বর্তমান গবেষণার কয়েকটি মূল প্রশ্নের সাথে এটি যুক্ত হয়।

- প্রথমত, গান্ধীর আন্দোলনগুলিতে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক ও আদর্শগত পরিবর্তনের অংশ ছিল। এই গবেষণার ক্ষেত্রেও ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যেভাবে ছাত্র সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, নির্বাচনী সহিংসতা বা রাজনৈতিক দখলদারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন (যেমন স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ) গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, যেখানে নৈতিক অবস্থান বজায় রেখে ছাত্ররা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল (বিপিন চন্দ্র, ১৯৮৯: ২১০)।
- দ্বিতীয়ত, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ছাত্রদের অংশগ্রহণে দেখা যায়, তারা কেবল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদই করেনি, বরং অনেকক্ষেত্রে সক্রিয় প্রতিরোধে নেমেছিল, রেললাইন বিচ্ছিন্ন করা, প্রশাসনিক দপ্তর আক্রমণ করা ইত্যাদি তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার অংশ ছিল (সুমিত সরকার, ১৯৯৭: ৩৫২)। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনেও আমরা দেখতে পাই যে অনেকসময় ছাত্র সংগঠনগুলি শুধু প্রতিবাদ সভা বা অবস্থান কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষত, এই গবেষণায় উঠে আসা নন্দীগ্রাম, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, নির্বাচনী সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের ভূমিকা—এসব ক্ষেত্রেও একই রকম প্রতিরোধের ধরন দেখা যায়।
- তৃতীয়ত, গান্ধীর সময়কার ছাত্র আন্দোলন একটি বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের অংশ ছিল, যা কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়া হয়নি, বরং সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যও রেখেছিল। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুর প্রতিক্রিয়াও বহন করে। যেমন, চাকরির অনিশ্চয়তা, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, রাজনীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব—এসব বিষয় ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে উঠে আসে (গুহ, ২০০৩: ১৪৫)। অতএব, গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে এবং এটি বোঝার সুযোগ দেয় যে ছাত্র

আন্দোলনের চরিত্র কীভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, বিশেষত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব কেমনভাবে ছাত্রদের আন্দোলনকে রূপ দেয়।

অতএব, গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা এই গবেষণার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে এবং এটি বোঝার সুযোগ দেয় যে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র কীভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, বিশেষত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব কেমনভাবে ছাত্রদের আন্দোলনকে রূপ দেয়। এটি ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য একটি তুলনামূলক কাঠামো তৈরি করতে সহায়তা করবে।

স্বাধীনোত্তর ভারতের চিত্র

স্বাধীনোত্তর ভারতে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন ভারতীয় গণতন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী, আদিবাসী ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এই গবেষণা স্বাধীনোত্তর ভারতের আন্দোলনের বিভিন্ন চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করছে যে কীভাবে এই আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সামাজিক পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে এবং এটি পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ (১৯৪৬-৫১), যা মূলত কৃষকদের ভূমি অধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল (গুপ্ত, ২০০৮: ৭২)। এটি দেখায় যে, ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী সময়েও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কীভাবে টিকে ছিল এবং কৃষক আন্দোলন কীভাবে নতুন রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন (১৯৬৭) একই রকমভাবে কৃষকদের জমির অধিকারের প্রশ্ন তুলে ধরে এবং ছাত্রদের একটি বড় অংশ এতে যুক্ত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালের রেলওয়ে ধর্মঘট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা শ্রমিক শ্রেণির অধিকারের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে (বাসু, ২০১০: ১১০)। পশ্চিমবঙ্গেও শ্রমিক সংগঠনগুলির শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল এবং এই ধরনের আন্দোলনগুলি ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়িয়ে তুলেছিল। জেপি আন্দোলন (১৯৭৪-৭৫) ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে দুর্নীতি, স্বৈরতন্ত্র ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে একটি

গণআন্দোলন গড়ে ওঠে (ওমভি, ২০০৫: ৩৫৫)। এটি ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্বকে সামনে আনে এবং জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-৭৭) সময় রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকাকে বোঝার জন্য এই সময়কার আন্দোলনগুলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে মণ্ডল আন্দোলন (১৯৯০) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ও পক্ষে ব্যাপক আন্দোলনে জড়িত হয় (জোশী, ২০১২: ১৯৪)। এটি রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাব ও ছাত্রদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধরণ বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলিও রাষ্ট্রের নীতি ও ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আসামের জাতিগত আন্দোলনগুলির মধ্যে আসাম আন্দোলন (১৯৭৯-৮৫) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 'বিদেশি' বা অনুপ্রবেশকারী ইস্যু, যা আসামের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার ওপর প্রভাব ফেলছিল বলে দাবি করা হয়েছিল (গোহাই, ২০০৩: ১৪৫)। অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (AASU) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়, যা ছাত্র সংগঠনগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলিতেও দেখা যায় যে, ছাত্র সংগঠনগুলি কেবল শিক্ষার প্রশ্নে নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

সৌমদীপ সিনহার লেখা *"পলিটিসাইজেশন অফ ইউনিভার্সিটিজ ইন আ পোস্টকোলোনিয়াল কনটেক্সট: আ হিস্টোরিক্যাল স্কেচ অফ স্টুডেন্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম ইন ইন্ডিয়া"* বইয়ে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতির সমন্বয় এবং তার ইতিহাসের ভেতর গড়ে ওঠা রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তাঁর বিশ্লেষণে, ছাত্র সমাজকে একটি শক্তিশালী ও সচেতন রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা বৃহত্তর পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে অথবা ক্যাম্পাসের ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করে থাকে।

এই গবেষণায় স্বাধীনোত্তর ভারতের বিভিন্ন আন্দোলনের বিশ্লেষণ মূলত ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া, এবং সামাজিক পরিবর্তনের গতিশীলতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ এবং নকশাল আন্দোলন দেখায় কীভাবে কৃষক আন্দোলনে ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার একটি

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা প্রকাশ করে। জেপি আন্দোলন এবং জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা বর্তমান গবেষণার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি রাষ্ট্রীয় দমননীতি এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, তা মণ্ডল আন্দোলনের সময়কার ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনীয়।

সামগ্রিকভাবে, এই গবেষণা বিশ্লেষণ করতে চায় যে, স্বাধীনোত্তর ভারতের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন কীভাবে ছাত্র সংগঠনগুলির রাজনৈতিক অবস্থান, আন্দোলনের কৌশল এবং রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার ধরনকে প্রভাবিত করেছে এবং তা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কীভাবে প্রতিফলিত হয়। সিনহার মতে, ছাত্র আন্দোলন ভারতের মতো উপনিবেশোত্তর সমাজে, বিশেষতঃ স্বাধীনতার পর, একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রদের নিজেদের দাবি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখা গেছে। সিনহার তত্ত্ব অনুযায়ী, ভারতের ছাত্র আন্দোলন শতাধিক বছরের একটি ইতিহাসের ধারক, যা ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এবং পরেও সক্রিয় ছিল। বিশেষতঃ ১৯৬০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের আবেগ, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দীর্ঘকাল ধরে চলমান ছাত্র রাজনীতির ধারাবাহিকতা তুলে ধরে। সৌমদীপ সিনহা দেখিয়েছেন যে, ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্র রাজনীতি শুধু ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি জাতীয় অঙ্গণে এবং রাজনৈতিক কাঠামোয় তাদের অবদান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, ছাত্ররা যেমন নাগরিকত্ব ও জাতীয় পরিচয়ের পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তারা রাজনীতির অঙ্গণে প্রবেশ করেছে। এই গবেষণার সাথে সৌমদীপ সিনহার ধারণার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্র আন্দোলনকে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের জন্য একটি শক্তিশালী এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সিনহার মতে, ছাত্ররা শুধুমাত্র ক্যাম্পাসের বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেনি, তারা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, যা একদিকে তাদের নিজেদের অধিকার ও দাবির প্রশ্ন, অন্যদিকে সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করে, বিশেষঃ করে পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকে ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে।

এই গবেষণা পত্রটি অতীতের ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছে, যেখানে সৌমদীপ সিনহার তত্ত্বগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে, এই গবেষণার মধ্যে একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে, এটি পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ছাত্র আন্দোলন এবং তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সম্পর্কের বিশেষ বিশ্লেষণ করতে চায়। যেখানে সিনহার লেখায় জাতীয় স্তরের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে, এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ছাত্র আন্দোলন এবং তার প্রভাব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে, সিনহার তত্ত্ব যেখানে ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক নিয়ে ধারণা দিয়েছে, এই গবেষণায় তার মধ্যে আরও গভীরভাবে সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ছাত্র আন্দোলনের পরিণতি বিশ্লেষণ করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ- নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ইত্যাদি আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে ছাত্ররা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে তাদের ভূমিকা পালন করেছে, যা এই গবেষণায় মূল আলোচ্য বিষয়। অনির্বাণ ব্যানার্জির লেখাগুলি ছাত্র আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। তাঁর দুটি প্রধান বই *স্টুডেন্টস অ্যান্ড র‍্যাডিক্যাল সোশ্যাল চেঞ্জ (২০০৩), চেঞ্জ অ্যান্ড কন্টিনিউটি ইন স্টুডেন্ট র‍্যাডিক্যালিজম (২০১৫)* ছাত্র আন্দোলনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করেছে। ছাত্র আন্দোলন সমাজে লুকিয়ে থাকা এক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রধান চালক। ছাত্ররা তাদের আদর্শবাদ, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। আন্দোলনগুলির মূল চালিকা শক্তি হল—একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া। ছাত্র আন্দোলন প্রায়শই নতুন আদর্শিক ধারা তৈরি করে যা স্থানীয় এবং জাতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। ব্যানার্জি দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন যুগে ছাত্র আন্দোলন সমাজে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠেছে। ছাত্র আন্দোলন তাদের আদর্শগত মূলে চরমপন্থা বজায় রাখলেও, তাদের কৌশল ও সংগঠনে সময়ের সাথে পরিবর্তন আসে। তাঁর ধারনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুল হল—প্রযুক্তির ব্যবহার: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাত্র আন্দোলনের নতুন রূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনীতির সাথে সম্পর্ক: আন্দোলনগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব এবং পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে প্রায়ই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

ধারাবাহিকতা বনাম পরিবর্তন: ঐতিহ্যবাহী ছাত্র আন্দোলনের চেতনা বজায় রাখার সাথে সাথে তাদের সংগঠন এবং লক্ষ্য আধুনিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টায় কখনও আদর্শগত চরমপন্থার দিকে যায়, আবার কখনও বাস্তবতার সাথে আপস করে। অনির্বাণ ব্যানার্জি ছাত্র আন্দোলনকে সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই আন্দোলনগুলো একদিকে আদর্শগত এবং চরমপন্থী ধারা বজায় রাখে, অন্যদিকে সময়ের সাথে নতুন কৌশল এবং প্রযুক্তি গ্রহণ করে। তাঁর গবেষণা ছাত্র আন্দোলনকে একটি ক্রমবিবর্তনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখায় যা সমাজ ও রাজনীতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে। অনির্বাণ ব্যানার্জির লেখাগুলি ছাত্র আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলোকে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। তবে, বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের গত দুই দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছাত্র আন্দোলনের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে স্থানিক ও সমসাময়িক বাস্তবতাকে আলোকিত করতে চায়। ব্যানার্জি তাঁর *"স্টুডেন্টস অ্যান্ড র‍্যাডিক্যাল সোশ্যাল চেঞ্জ"* বইয়ে দেখিয়েছেন যে, ছাত্র আন্দোলন সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রধান চালক। এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম, সন্দেশখালি এবং চাকরি কেলেঙ্কারি আন্দোলনের মাধ্যমে দেখাতে চায় যে এই ছাত্র আন্দোলনগুলি স্থানীয় সমস্যার প্রতিবাদের পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেছে। ব্যানার্জি *"চেঞ্জ অ্যান্ড কন্টিনিউটি ইন স্টুডেন্ট র‍্যাডিক্যালিজম"* (২০১৫) বইয়ে দেখিয়েছেন যে ছাত্র আন্দোলনের আদর্শগত চেতনা অব্যাহত থাকলেও কৌশলগত এবং সাংগঠনিক দিক থেকে সময়ের সাথে পরিবর্তন আসে। এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনে প্রযুক্তি (যেমন-সোশ্যাল মিডিয়া) এবং ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়। এতে বোঝা যায় কীভাবে আন্দোলনের কৌশল আধুনিক বাস্তবতায় অভিযোজিত হয়েছে। ব্যানার্জি ছাত্র আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব এবং এর চরমপন্থী ধারা নিয়ে আলোচনা করেছে।

এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় ভূমিকা আন্দোলনের চরিত্র এবং তার প্রভাবকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্যানার্জি ছাত্র আন্দোলনের উপর একটি সাধারণ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করেছেন যা বৈশ্বিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে লেখা।

বর্তমান গবেষণা পত্রে পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট স্থানীয় এবং সাম্প্রতিক (গত দুই দশকের) রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে আলোকিত করে। এখানে ছাত্র আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাবের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যানার্জি আন্দোলনের চরমপন্থা এবং আদর্শিক দিকগুলির উপর জোর দিয়েছেন। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- কীভাবে ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেই প্রভাব আন্দোলনের চরিত্রকে কীভাবে রূপান্তরিত করে, তা এই গবেষণায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ব্যানার্জি আন্দোলনে প্রযুক্তির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, তবে এটি তাঁর বিশ্লেষণের মূল বিষয় নয়। এই গবেষণায় সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমকে ছাত্র আন্দোলনের সংগঠন এবং প্রভাব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্যানার্জির লেখা ছাত্র আন্দোলনের তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক ভিত্তি বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। তবে, বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের স্থানীয় ও সমসাময়িক দিকগুলোকে আলোকিত করে। এই গবেষণায় বিশেষত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতি এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের অনন্য দিকগুলো তুলে ধরতে চায়।

ঘনশ্যাম শাহের *"সোশ্যাল মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া"* বইটি ভারতের সামাজিক আন্দোলনগুলোর বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা। এই বইয়ে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলি নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। শাহ রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক তাত্ত্বিকতা বিশ্লেষণ করেছেন, যা এই গবেষণার জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। শাহ উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিক আন্দোলনগুলোর মূল উদ্দেশ্য সমাজের অবিচার ও বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করা। তাঁর গবেষণায় বলা হয়েছে যে, ভারতের বিভিন্ন আন্দোলন জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সরকারি নীতির প্রতি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যা সরাসরি বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু, যেখানে রাজনৈতিক দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে, ছাত্র আন্দোলনগুলি প্রায়শই বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে কাজ করে। শাহের গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছাত্ররা সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী উদ্যোক্তা হিসাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, যা এই গবেষণার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। নন্দীগ্রাম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা বিশ্লেষণের কথা

বলা হয়েছে, যা শাহ-এর কাজের আলোকে যথাযথ। শাহ সামাজিক আন্দোলনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলে আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্লেষণ করার একটি সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কিভাবে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং নিজেদের দলের ভিত্তি ধরে রাখতে চেষ্টা করে। এই নির্ভরতা পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও দেখা যায়, যেমন- এই গবেষণায় উল্লিখিত। ঘনশ্যাম শাহ সামাজিক আন্দোলনের সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন, যেখানে তিনি ভারতের নানা আন্দোলন এবং তাদের সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক ও সাধারণ, যেখানে আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য এবং তা কিভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সরকারি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ছাত্র আন্দোলনের উপর আরও নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন- নন্দীগ্রাম আন্দোলন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এগুলো শাহের কাজের তুলনায় বেশি স্থান পেয়েছে। শাহ সামাজিক আন্দোলনগুলির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং সেগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে শাহের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং তিনি আন্দোলনের প্রভাবকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে দেখেছেন।

এই গবেষণা পত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া যেমন বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তেমনি ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং দলের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ছাত্র আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তন নয়, বরং রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। শাহ ছাত্র আন্দোলনগুলিকে সামাজিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দেখেছেন, যেখানে ছাত্ররা শক্তিশালী উদ্যোক্তা হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে, তিনি এটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখেছেন। বর্তমান গবেষণা পত্রে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ছাত্র আন্দোলনগুলি শুধু সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং ক্ষমতা অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। শাহ সামাজিক আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য হিসেবে অবিচার ও বৈষম্য দূর করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এসব আন্দোলন সাধারণত জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং সরকারের প্রতি

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই গবেষণায় একদিকে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা নিয়েও আলোচনা করছে। ছাত্র আন্দোলনগুলির লক্ষ্য শুধু সামাজিক পরিবর্তন নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ক্ষমতার পরিবর্তন আনা, যা শাহের সাধারণ ধারণার তুলনায় আরও সরাসরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধারন করে।

অমিতেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর *Social Movements of India* গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, যেখানে বিশেষভাবে দলিত, মহিলা এবং পরিবেশগত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের সামাজিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে এসব আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠেছে, কীভাবে তারা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বদলেছে এবং শিল্প বিপ্লব ও বিশ্বায়নের ফলে এগুলির গতিপথ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (মুখোপাধ্যায়, ২০১২:১০-১২)।

ভারতে দলিত আন্দোলনের ইতিহাস গভীর এবং বহুস্তরীয়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে দলিতদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন প্রয়াস দেখা গেলেও, প্রকৃত অর্থে এটি সংগঠিত রূপ নেয় স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে, বিশেষত ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বে। সংবিধানে জাতিভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ হলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে দলিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক নিপীড়ন অব্যাহত থাকে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২:৩৫-৪০)। এ কারণে দলিত আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক অধিকার বা সংরক্ষণ ব্যবস্থার দাবিতেই থেমে থাকেনি, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও সক্রিয় হয়েছে। অমিতেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, শিল্পায়ন এবং বিশ্বায়নের ফলে যদিও কিছু দলিত জনগোষ্ঠী মূলধারার অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে, তবুও সামাজিক বৈষম্য ও জাতপাতের রাজনীতি দলিত মুক্তির পথে বড় বাধা হিসেবে থেকে গেছে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২:৪৮-৫০)। নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই রকম প্রবণতা দেখা যায়। ঔপনিবেশিক আমলে নারী শিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহ আইন এবং অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন নারীর সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটালেও, প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন একটি দীর্ঘ ও চলমান প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২:৭২-৭৫)। স্বাধীনতার পর শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী নারীদের অধিকারের প্রশ্ন উঠে আসে, যা পরবর্তী সময়ে শহরাঞ্চলে কর্মজীবী নারীদের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২ঃ ৮০-৮৫)। বিশ্বায়নের ফলে অনেক নারী কাজের সুযোগ পেলেও, লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে তারা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পায় এবং

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন একটি অসম্পূর্ণ বাস্তবতা হিসেবেই থেকে গেছে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২:৯০-৯৫)।পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও শিল্প বিপ্লব এবং বিশ্বায়নের প্রভাব সুস্পষ্ট। চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মতো বিভিন্ন পরিবেশগত লড়াই শুধুমাত্র প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এগুলোর মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা এবং ভূমির অধিকারের প্রশ্নও জড়িত ছিল (মুখোপাধ্যায়, ২০১২ঃ ১১০-১১৫)। বিশ্বায়নের ফলে বড় শিল্প ও কর্পোরেট সংস্থাগুলি যখন পরিবেশ নষ্ট করে উন্নয়নের নাম করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, তখন সাধারণ জনগণের জন্য পরিবেশগত ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২:১২০-১২৫)। রাষ্ট্র ও কর্পোরেট স্বার্থ যেখানে এক হয়ে যায়, সেখানে পরিবেশ আন্দোলন প্রায়শই দমন-পীড়নের শিকার হয়, যা বর্তমান সময়ে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২ঃ ১৩০-১৩৫)। অমিতেশ মুখোপাধ্যায় এই বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, ভারতের সামাজিক আন্দোলনগুলি কেবল অতীতের ঘটনা নয়, বরং বর্তমান বাস্তবতায়ও এগুলির গভীর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। দলিত, নারী ও পরিবেশ আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবিত করলেও, শিল্প বিপ্লব ও বিশ্বায়নের ফলে এগুলির সামগ্রিক সাফল্য এখনও সীমিত। বর্তমান সময়ে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশ রক্ষার দাবিগুলি নতুনভাবে গড়ে উঠছে, যা এই আন্দোলনগুলির ভবিষ্যৎ রূপ এবং প্রভাবের দিকেও নির্দেশ করে (মুখোপাধ্যায়, ২০১২:১৪৫-১৫০)।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলন

ভারতের সামাজিক আন্দোলনগুলো একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। এই আন্দোলনগুলির পেছনে সমাজের নানা সমস্যার সমাধান, ন্যায় ও সমতার দাবির ভিত্তিতে সংগঠিত একটি বৃহত্তর জনগণের প্রচেষ্টা রয়েছে। সাহিত্যে ভারতের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিভিন্ন লেখকরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, যা বর্তমান গবেষণা পত্রের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। এম. এস. রাও ভারতীয় সমাজ এবং রাজনীতিতে সামাজিক আন্দোলনগুলোর উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তাঁর লেখাগুলিতে তিনি বিশেষ করে সামাজিক আন্দোলনের গঠন, কার্যকারিতা এবং পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিচে এম. এস. রাওয়ের কিছু মূল ধারণা তুলে ধরা হলো—

সামাজিক আন্দোলনের গঠন: এম. এস. রাও সামাজিক আন্দোলনগুলিকে একটি কাঠামোগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি মনে করেন যে, সামাজিক আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে তার সংগঠন, নেতৃত্ব এবং লক্ষ্যগুলির স্পষ্টতা এবং কার্যকারিতা উপর। তিনি লেখেন, "সামাজিক আন্দোলনগুলি তখনই কার্যকরী হয়, যখন তার সদস্যদের মধ্যে একটি সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে।" জনগণের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে রাও বলেন যে, সামাজিক আন্দোলনগুলিতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তিনি উল্লেখ করেন, "যত বেশি সংখ্যক মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হবে, তত বেশি তা সমাজের উপর প্রভাব ফেলবে।" বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয় সম্পর্কে এম. এস. রাওয়ের গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার গুরুত্ব উল্লেখিত (রাও ২০১২:৮০-৮৫)। তিনি বলেন, "বিভিন্ন জাতি, ধর্ম এবং শ্রেণির মানুষের সমন্বয় ঘটানো একটি সামাজিক আন্দোলনের সফলতার চাবিকাঠি।" এম. এস. রাও সামাজিক আন্দোলনের কাঠামো এবং জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তাঁর কাজের মূল বিষয় ছিল সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করা। তবে, বর্তমান গবেষণায় শুধুমাত্র সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে নয়, বরং ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতার প্রতিযোগিতাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং তাদের ক্ষমতার রাজনীতি এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে, যা রাওয়ের সাধারণ সামাজিক আন্দোলন বিশ্লেষণের তুলনায় আলাদা। এম. এস. রাও সামাজিক আন্দোলনগুলিকে একটি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হিসেবে দেখেছেন, যেখানে ছাত্রদের ভূমিকা বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ছাত্র আন্দোলনগুলি সাধারণত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে ছিল। বর্তমান গবেষণা গবেষণায় অবশ্য, ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ক্ষমতার পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিচ্ছে, যেখানে ছাত্ররা কেবলমাত্র সমাজে পরিবর্তনই আনেনি, বরং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়াও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এম. এস. রাও বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয় এবং সহযোগিতাকে সামাজিক আন্দোলনের সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে দেখেছেন। এই গবেষণায় যদিও গোষ্ঠীগত একীকরণের কথা বলা হয়েছে, তবুও ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক দলের ভিতরকার বিভাজন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এখানে ছাত্রদের একত্রীকরণের পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলের প্রতি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং দলের ভিতরে সংঘর্ষও বিশ্লেষিত হয়েছে। এম. এস. রাও সামাজিক আন্দোলনগুলিকে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে চাপ সৃষ্টি করার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বর্তমান গবেষণা পত্রে এই চাপ সৃষ্টির ধারাকে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষমতার পরিবর্তন হিসেবে দেখা হয়েছে। ছাত্ররা কেবলমাত্র সামাজিক পরিবর্তন নয়, বরং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার পুনঃবিন্যাস ঘটাচ্ছে। বিশেষঃ করে, ছাত্র আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক দলগুলির আচার-ব্যবহার এবং নীতির পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে, যা রাওয়ের সাধারণ সামাজিক কাঠামোগত বিশ্লেষণের বাইরে।

বাংলা - পশ্চিমবঙ্গের[17] ছাত্র আন্দোলনঃ ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে ছাত্র আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়, বিশেষ করে সাম্প্রতিক দুই দশকে, এই আন্দোলন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন সময় ছাত্র সমাজ শুধুমাত্র শিক্ষাগত দাবির জন্যই নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধিতায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে, ছাত্র আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের ভূমিকা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রতিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও কর্মসংস্থান ঘিরে ছাত্র অসন্তোষ, সবকিছুই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ছাত্র আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া ঘিরেই আবর্তিত হয়নি; বরং বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের দাবিতে এটি একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন

ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, যিনি ১৯ শতকের গোড়ার দিকে কলিকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর নেতৃত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' গঠিত হয়। যা শিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং ধর্মীয় পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

[17] স্বাধীনতার আগের আন্দোলন বোঝাতে বাংলার আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তীতে আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন লেখা হয়েছে।

করেছিল (বাগচী ১৯৮৩:৪৫-৫২)। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী মূলত মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ এবং আধুনিক শিক্ষার প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। তাঁরা বিধবা বিবাহ চালু, সামাজিক কুসংস্কারের বিরোধিতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিল। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা ব্রিটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা করতেন এবং ব্যক্তি অধিকার ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন (গুহ ১৯৯৭:১০২-১০৭)।

ডিরোজিওর নেতৃত্বে ছাত্ররা বিভিন্ন বিতর্ক সভা এবং পত্র-পত্রিকায় মতপ্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালিয়েছিল। যদিও এই আন্দোলন ক্লাস রুম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সচেতন করার মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল, কোনও ভাবেই রাস্তায় নেমে নয়। তবুও এটি ভবিষ্যতের ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল (চট্টোপাধ্যায় ২০০২:৭৮-৮৫)। এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ছাত্র আন্দোলন কীভাবে রাস্তায় না নেমে, রাজনীতির দলের বা কোনও সংগঠনের সাথে যুক্ত না হয়ে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবিত করে এবং পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনগুলোর প্রকৃতি কীভাবে গঠিত হয়েছে। যেহেতু, এই ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিবাদ ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রেক্ষাপটে ছাত্রদের প্রথম সমাজ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ।

স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলন

অধ্যাপক সুমিত সরকার তাঁর *"দ্যা স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯০৩-১৯০৮"* বইয়ে ভারত এবং বিশেষতঃ অবিভক্ত বাংলার আধুনিক ইতিহাসের বহুস্তর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। যা বিশেষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বাংলায় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোর বিকাশ এবং উত্থানকে কেন্দ্র করে। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন কিভাবে বাংলার জনগণ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একত্রিত হয়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড এই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মাধ্যমে জনগণের ঐক্য এবং সাহসিকতার প্রতিফলন ঘটে, যা পরে স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশি পণ্যের বর্জন এবং নিজস্ব পণ্যের প্রচারের মধ্যে দিয়ে আরেকটি রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে (সরকার ২০১৪:৪৬৮-৭২)। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনেও স্বতন্ত্র

জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। সুমিত সরকারের গবেষণায় এই আন্দোলনগুলোর বিশদ বিবরণ রয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের মূল অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের গবেষণার সঙ্গে বর্তমান গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা এবং পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে। সরকারের গবেষণা, যা ভারতের ও বিশেষভাবে অবিভক্ত বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রামকে কেন্দ্র করে, মূলত রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপন করে। তাঁর বিশ্লেষণে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের আলোকে বাংলার জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বিকাশ দেখানো হয়েছে। বর্তমান গবেষণাতে একইভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎপত্তি এবং তার বিকাশের জন্য জনগণের অসন্তোষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্লেষণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে জনগণের অসন্তোষের এই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যা রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাদের অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অধ্যাপক সরকার প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক সময়কাল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর দিকে মনোনিবেশ করেছে, যেখানে এককভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। বর্তমান গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশে ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দলগুলির সংঘর্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরও আলোকপাত করেছে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একাধিক বিরোধ রয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

খাদ্য আন্দোলন

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতার পরও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে একাধিক গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের খাদ্য আন্দোলন ছিল সেই ধরনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গণআন্দোলন, যা রাজ্যের কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ এবং ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। খাদ্যের দাবিতে এই আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে এক বিশাল গণপ্রতিরোধে পরিণত হয়। এই সময়ে খাদ্যের অভাব এবং চাল-গমের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করেছিল। দুর্নীতি ও মজুতদারদের স্বার্থরক্ষার অভিযোগে সরকারের প্রতি জনগণের ক্ষোভ চরমে পৌঁছায়। ১৯৫৯

খ্রিষ্টাব্দের ৩১ আগস্ট কলকাতায় এক বিশাল বিক্ষোভ সংগঠিত হয়, যেখানে ছাত্র ও শ্রমজীবী মানুষরা মিলিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই আন্দোলনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর (যেমন- ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র পরিষদ) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তারা কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় এবং খাদ্যের দাবিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে (মুখার্জি ২০০৮:২১০-১৫)। সরকারের দমননীতির কারণে আন্দোলন আরও সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে ওঠে। ৩১ আগস্ট পুলিশের গুলি চালনায় বহু বিক্ষোভকারী নিহত হন, যা আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করে তোলে। এই দমনপীড়নের ফলে ছাত্রসমাজ আরও সক্রিয় হয় এবং পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণে এই আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৬০-এর দশক ও পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলনগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য, শিক্ষা ও শ্রম অধিকারের দাবিতে তারা আরও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে (বসু ২০১১:১৪২-৪৫)। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের খাদ্য আন্দোলন শুধুমাত্র খাদ্যের দাবিতে পরিচালিত একটি বিক্ষোভ ছিল না, যা ছিল পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণ একে আরও তীব্র করে তোলে এবং পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে।

নকশালবাড়ি ছাত্র আন্দোলন

নকশালবাড়ি আন্দোলনের আগে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গণআন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ এবং শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। তবে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেখানে ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এটি পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির গতি-প্রকৃতিকে বদলে দেয় এবং ছাত্র আন্দোলনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র রাজনীতি একটি নতুন মোড় নেয়। এ সময় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে সত্তরের দশকে এই ছাত্র আন্দোলন আরও উগ্র রূপ নেয় এবং সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, গেরিলা কৌশল গ্রহণ এবং রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ

গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এরপর থেকে ছাত্র আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান হয়। সৌমদীপ সিনহা তাঁর প্রবন্ধে ছাত্র আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ছাত্রদের একটি সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যারা শুধু শিক্ষার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এবং আদর্শিক গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষতঃ নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময়, ছাত্ররা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। নকশালবাড়ি আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই সময়ে ছাত্ররা কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জমি পুনর্বণ্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনটি ছাত্রদের আদর্শিক গভীরতা প্রদান করে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা আরও প্রসারিত করে। সিনহা উল্লেখ করেছেন যে, এই আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে পার্টি ভিত্তিক বিভাজন এবং আদর্শিক সংঘাত সৃষ্টি করলেও, এটি রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করে তোলে (সিনহা ২০২২:৪২)। ১৯৭০-এর দশকের জরুরি অবস্থার সময় ছাত্র আন্দোলন দমন করা হলেও, এই দমন-পীড়ন একটি নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করে। ছাত্ররা এই সময়ে সক্রিয়ভাবে সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। সিনহা দেখিয়েছেন যে, নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা ছাত্র রাজনীতিতে আদর্শগত এবং কাঠামোগত পুনর্গঠনের পথ প্রশস্ত করে।

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভারতের ছাত্র আন্দোলন শুধু স্থানীয় সমস্যাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বৈশ্বিক ঘটনাবলীর প্রভাবেও গঠিত হয়েছে, যেমন ১৯৬০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী ছাত্র আন্দোলন। এই প্রভাব ছাত্রদের স্থানীয় রাজনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হতে সাহায্য করেছে। সাথে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক উত্থান, পতন এবং পুনরুজ্জীবনের দিকগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রদের অধিকারের বিষয় নয়, এটি বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। এই আন্দোলন ভারতীয় সমাজের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোতে গভীর পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়েছে। সিনহা'র গবেষণা ভারতীয়

ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক এবং আদর্শিক গতিপথ বিশ্লেষণ করে, যেখানে ছাত্র আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি এবং সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গার ছাত্র আন্দোলনের উত্থান, পতন এবং পুনরুজ্জীবনের সামগ্রিক কাঠামো তুলে ধরেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ছাত্ররা শুধু স্থানীয় নয়, বরং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত থেকেছে।

সুমন্ত চ্যাটার্জী নকশালবাড়ি আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটি কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে দেখেন না; বরং তিনি এটিকে ভারতীয় বামপন্থী রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল একদিকে কৃষকদের জমির অধিকারের লড়াই, অন্যদিকে এটি ছিল একটি বিপ্লবী মতাদর্শের প্রকাশ, যা মূলত মাওবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত (চাটার্জী ১৯৮৩:৫৪-৫৮)। চ্যাটার্জীর মতে, নকশালবাড়ি আন্দোলনকে বুঝতে গেলে শুধু ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনাগুলোর দিকে তাকালেই হবে না, বরং তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তৎকালীন বাম রাজনীতির দ্বন্দ্ব এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত বিভক্তির বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হবে। তাঁর বিশ্লেষণে উঠে আসে, কীভাবে এই আন্দোলন কৃষক, শ্রমিক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের একত্রিত করেছিল এবং কেমন করে এটি ছাত্র আন্দোলনেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল (চ্যাটার্জী, ১৯৯১:১০২-১০৭)। তিনি মনে করেন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এর ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া। ১৯৭০-এর দশকের কলকাতা এবং অন্যান্য শহরে যে ছাত্র বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, তা মূলত নকশালবাড়ির আদর্শকে ধারন করেই হয়েছিল। তিনি এই আন্দোলনকে নিছক একটি স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে দেখেন না, বরং এটিকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি র‍্যাডিকাল পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন, যেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল (চ্যাটার্জী, ১৯৮৭:৭৫-৭৯)। তবে সুমন্ত চাটার্জী এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার দিকও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, আন্দোলনের কৌশলগত ভুল, গণভিত্তির অভাব এবং সরকারের কঠোর দমননীতির কারণে এটি দীর্ঘমেয়াদী হতে পারেনি। তবুও, তিনি মনে করেন, নকশালবাড়ি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিদ্রোহ ছিল না; এটি ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের গতিপথকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করেছে এবং পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপে এর চিহ্ন থেকে গেছে (চ্যাটার্জী, ১৯৯৫:১১৮-১২৩)।

বর্তমান গবেষণা পত্রের ক্ষেত্র যদিও একই ধরনের, একটি ভিন্ন এবং স্পষ্ট ফোকাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে গত দুই দশকের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে (নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতি ও সন্দেশখালিতে শাসক দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অসন্তোষ) কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা এবং তার বিভিন্ন দিকের প্রভাব নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি শুধু ঐতিহাসিক নয়, বরং সমসাময়িক ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে, ছাত্র আন্দোলনের স্থানীয় বাস্তবতাগুলি গভীরভাবে অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে সিনহা'র গবেষণা ছাত্র আন্দোলনের আদর্শিক ও গঠনগত দিকগুলিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে। এই গবেষণায় রাজনৈতিক সংঘাত এবং ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা ও প্রভাবের উপর গভীর মনোযোগ দেয়। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রাসঙ্গিকতা, রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ এবং স্থানীয় সমাজের কাঠামোগত দ্বন্দ্বগুলিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সার্বিকভাবে, এই গবেষণায় সিনহা'র কাজের একটি সম্পূরক রূপ, যেখানে জাতীয় পর্যায়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে একটি স্থানীয় এবং সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ প্রদান করা হয়েছে। এটি ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতার একটি নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

ছাত্র আন্দোলন ও দলীয় রাজনীতি: সামাজিক পরিবর্তন থেকে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের উত্থান

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন ঔপনিবেশিক সময় থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী খাদ্য ও নকশালবাড়ি আন্দোলন পর্যন্ত সময় ধরে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এই সময়ের পর আন্দোলন কেবল শিক্ষাঙ্গণের দাবি-দাওয়া কেন্দ্রিক ছিল, তবে সময়ের সাথে সাথে এটি দলীয় রাজনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকারের (১৯৭৭-২০১১ খ্রিঃ) সময়ের শুরুর দিক থেকেই। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সংকট, শিক্ষাখাতে দুর্নীতি, কর্মসংস্থান সংকট, মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের মতো ইস্যুগুলো যখন সামনে আসে, তখন ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলের নীতির সাথে একাত্ম হয়ে যায়। ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের স্বার্থে ছাত্র আন্দোলনকে ব্যবহার করতে

শুরু করে, কখনও সরাসরি সমর্থন দিয়ে, আবার কখনোও আন্দোলন দমন করার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে। বিশেষতঃ, যখন সরকারবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়, তখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্রদের মাধ্যমে সেই আন্দোলনকে আরও বৃহৎ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে, আন্দোলনের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং এটি সরাসরি সংসদীয় রাজনীতির ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের রূপ নেয়। ছাত্র আন্দোলনের নেতারা অনেক সময় নিজেদের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে প্রবেশের পথ হিসেবে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। অতীতে দেখা গেছে, বহু রাজনৈতিক নেতা ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে উঠে এসে মূলধারার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই প্রবণতা আরও জোরালো হয় যখন দেখা যায় যে, সরকার বা বিরোধী দল ছাত্রদের আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। ফলে, ছাত্র রাজনীতি আর কেবল শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ের অংশ হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন সংসদীয় রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করে এবং ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের চরিত্র গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ সংকট, শিক্ষার অধিকার, দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন বা চাকরির দাবির মতো বিষয়গুলি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ছাত্র সংগঠনগুলিও দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করতে থাকে এবং আন্দোলনের লক্ষ্য কেবল সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসাবের মধ্যেও স্থান পেতে শুরু করে।

ফলস্বরূপ, এক সময় যেসব ছাত্র আন্দোলন কেবল শিক্ষাঙ্গনের দাবি-দাওয়া নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল, সেগুলো ক্রমে জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে। সংসদীয় রাজনীতির প্রতিফলন ছাত্র আন্দোলনের ভেতরে প্রবেশ করে, এবং দলীয় রাজনীতির ছায়ায় ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারিত হতে থাকে। এটি কেবল ছাত্র রাজনীতির স্বাধীনতাকে সীমিত করে না, বরং আন্দোলনের চরিত্রকেও মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশলগত অবস্থান ছাত্র আন্দোলনের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ছাত্র অসন্তোষ

অশোক মুখার্জি তাঁর *"ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্স অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন"* বইয়ে আলোচনা করেছেন যে, ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রকট হয়ে ওঠে (মুখার্জি ১৯৮১:১৯০)। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে বেসরকারি সংস্থাগুলির একচেটিয়া আধিপত্য এবং সরকারি সংস্থার অব্যবস্থাপনার ফলে সাধারণ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিংয়ের শিকার হয়। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন (এবার থেকে CESC লিখবো)[18]-এর দুর্নীতি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে অব্যবস্থাপনা, সরকারি প্রকল্পে অর্থ অপচয় এবং রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎ বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সাধারণ নাগরিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত লোডশেডিংয়ের মুখে পড়ে। এ সময় সরকারি তহবিল থেকে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় না হওয়া, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ ওঠে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ছাত্ররা বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিবাদে সরব হয়। তারা বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি করে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে মিছিল ও অবরোধ সংগঠিত হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ সরকারি দপ্তরগুলিতেও ছড়িয়ে পরে, যেখানে তারা বিদ্যুৎ বিভাগের দুর্নীতির স্বচ্ছ তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানায়। আন্দোলনের চাপে পরে রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়। যদিও এই কমিটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে ছাত্র আন্দোলনের চাপে বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের জন্য সরকারের ভূমিকা এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

[18]CESC (Calcutta Electric Supply Corporation) হল একটি বেসরকারি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা, যা মূলত কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে। এটি RPG Group-এর অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান এবং 1899 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন

১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে গণপরিবহনের ভাড়া অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। সঞ্জয় বসু তাঁর *"স্ট্রাগল ফর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রিফর্মস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল"* বইয়ে লিখেছেন, সরকারি পরিবহন সংস্থাগুলির আর্থিক অব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে পরিবহন ব্যয় ক্রমশ বাড়তে থাকে (বসু ১৯৯০:১৭৫)। দুর্নীতি এবং অপচয়ের ফলে সরকারি পরিবহন সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক সংকটে পরে এবং এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য বাস ও ট্রামের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারি সংস্থাগুলির আর্থিক অনিয়মের মধ্যে ছিল অবৈধ চুক্তি, ঠিকাদারি ব্যবস্থায় স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা সরকারি অর্থের অপব্যবহার। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ প্রবল প্রতিক্রিয়া জানায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আন্দোলন সংগঠিত করে। তারা বাস ও ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেয়, বিভিন্ন স্থানে পথ অবরোধ করে এবং পরিবহন ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলে। এই আন্দোলন সাধারণ যাত্রীদেরও সমর্থন পায়, কারণ বাস ভাড়া বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ চরম সংকটে পরেছিল। ছাত্ররা দাবি তোলে যে, পরিবহন সংস্থাগুলির আয়-ব্যয় সম্পর্কে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি নিরপেক্ষ প্রশাসনিক সংস্থা এই খাতা পরিচালনা করবে। তাদের আন্দোলন চলাকালীন একাধিকবার পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

কিন্তু আন্দোলনের চাপে পরে সরকার কিছু ক্ষেত্রে বাস ভাড়া কমাতে বাধ্য হয় এবং সরকারি পরিবহন সংস্থাগুলির আর্থিক অনিয়মের তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই আন্দোলন পরিবহন ব্যবস্থার দুর্নীতি নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং গণপরিবহন খাতে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবিকে প্রবল করে তোলে। ছাত্রদের এই প্রতিবাদ রাজ্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করে এবং পরবর্তী সময়েও গণপরিবহনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে।

জনগণের অসন্তোষে ছাত্র আন্দোলন

১৯৯০-এর পর পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এর আগে ছাত্র আন্দোলন মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ছিল, যেখানে শিক্ষার অধিকার, পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনা, বৃত্তি বা ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়গুলি আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে ছাত্র আন্দোলন ক্রমশ জনগণের বৃহত্তর অসন্তোষকেই ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে এবং সেই অসন্তোষকে সামনে রেখে সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়। অর্থাৎ, এই সময় থেকে ছাত্র আন্দোলন আর কেবল ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন সংকটকেও তাদের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তোলে। এই পরিবর্তনের একটি বড় কারণ ছিল অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রভাব। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে নতুন অর্থনৈতিক নীতি চালু হওয়ার পর বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিক উদারীকরণ এবং বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার ঘটে, যা সরাসরি শিক্ষাক্ষেত্রে ও যুবসমাজের ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। চাকরির সুযোগ কমে যাওয়া, সরকারি চাকরির ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়া এবং শিক্ষার খরচ বেড়ে যাওয়া—এসব কারণেই ছাত্ররা আর কেবলমাত্র নিজেদের একাডেমিক দাবি-দাওয়া নিয়েই আন্দোলন করেনি, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষকেও তুলে ধরেছে। এরপর, ২০০০-এর দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, সরকারি চাকরির অনিয়ম এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র রাজনীতি আরও জটিল রূপ নিতে শুরু করে। এসএসসি এবং অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করলে ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই সময় দেখা যায়, ছাত্র আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং সাধারণ মানুষের অসন্তোষকেও ধারণ করে। আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বেকারত্বের সমস্যা এবং সরকারি নীতির ব্যর্থতা। ২০১০-এর পরবর্তী সময়ে এই প্রবণতা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, শিক্ষাক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হ্রাস, নিয়োগ দুর্নীতি, কৃষক আন্দোলনের মতো বিষয়গুলি ছাত্র আন্দোলনের এজেন্ডায় জায়গা করে নেয়। ছাত্র সংগঠনগুলো একদিকে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রের সংকট নিয়ে সরব হয়, তেমনি অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেও অবস্থান নিতে থাকে। ফলে, ১৯৯০-এর পর থেকে ছাত্র আন্দোলন ক্রমে জনগণের অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন দেখায় যে, ছাত্র

আন্দোলন আর কেবল ক্যাম্পাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। ১৯৯০-এর পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে ছাত্রদের ভূমিকা আর নিছক শিক্ষাগত সমস্যা নিয়েই নয়, বরং তারা সমাজের ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং রাজনৈতিক স্বচ্ছতার জন্য লড়াই করতে শুরু করেছে। এই ধারা পরবর্তী দশকগুলিতেও বহাল থাকে, যেখানে ছাত্র আন্দোলন সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে সংগঠিত করে এবং রাজনৈতিক পরিসরে নতুন মাত্রা যোগ করে। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁর গবেষণায় বিশ্লেষণ করেছেন যে জনগণের অসন্তোষই রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। জনগণ যখন কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অসন্তোষের শিকার হন, তখন তাদের মধ্যে পরিবর্তনের ইচ্ছা এবং চাপ তৈরি হয়, যা আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। এই অসন্তোষের মূল কারণ হতে পারে রাজনৈতিক দুর্নীতি, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, ন্যায়বিচারের অভাব, এবং প্রতিদিনকার জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া (সেনগুপ্ত ২০১২:৪৪-৪৬)।

এই পরিস্থিতিগুলি জনগণের মধ্যে গভীর হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়, এবং তারা রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের অবস্থান প্রকাশ করতে চান। সামাজিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে নানা স্তরের জনগণের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ- অর্থনৈতিক বৈষম্য যখন বাড়তে থাকে বা শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেয়, তখন ছাত্রসমাজ সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে আসে, যা দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে। নতুন সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব আধুনিক সমাজে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনগুলিকে বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সামন্তবাদী বা শিল্পযুগের শ্রমিক শ্রেণির লড়াইয়ের পরিবর্তে উত্তর-শিল্পায়ন পর্বে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে সংগঠিত আন্দোলনগুলি বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। ঐতিহ্যবাহী শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনের তুলনায় নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলিতে পরিচয়, পরিবেশ, মানবাধিকার, লিঙ্গ সমতা, শিক্ষা, দুর্নীতি ও নাগরিক অধিকারের মতো বিষয়গুলি প্রাধান্য পায় (তুরাইন ১৯৮৮:৫৪)। নতুন সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব দাবি করে যে, এসব আন্দোলন কেবল রাষ্ট্র বা শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নয়, বরং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে সংগঠিত হয় (মেলুচি ১৯৯৬: ১১২)। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশ আন্দোলন, নারী আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়গত বা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এই আন্দোলনগুলিতে

রাজনৈতিক দলগুলির নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কম এবং সামাজিক সংগঠন বা অসংগঠিত যুবসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়—পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যালোচনা—এই তত্ত্বের আলোকে বোঝা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি ও ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ, মূলত নতুন সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বহন করে। এখানে ইস্যুটি মূলত শিক্ষা ও স্বচ্ছতার দাবির ওপর ভিত্তি করে গঠিত, যা রাষ্ট্রের কাঠামোগত অন্যায় ও প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ হিসেবে কাজ করেছে (হাবারমাস, ১৯৮৭: ২০১)। নতুন সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব অনুযায়ী, এই ধরনের ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক ক্ষোভের প্রতিফলন নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রদের আন্দোলন শুধু নিয়োগ দুর্নীতি বা প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে নয়, বরং শিক্ষার অধিকার, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মতো বৃহত্তর সামাজিক চেতনার অংশ হিসেবে কাজ করছে। অতএব, নতুন সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ছাত্র আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিরিখে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি নাগরিক সমাজের সক্রিয়তার প্রতিফলন এবং সামাজিক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

পরিশেষে, আমরা যদি এই ছাত্র আন্দোলনের ধারাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব ঔপনিবেশিক সময়ে ছাত্রদের ভূমিকা সমাজ সচেতন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর মতবাদের ভিত্তিতে সমাজের বাকি অংশের সাথে ছাত্ররা দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছিল। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পরে এসে নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ছাত্র আন্দোলন যা সমাজকে আমূল ভাবে পরিবর্তন করার শপথ নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনকে এক যুগান্তকারি দিকে নিয়ে যায়। এবং এখান থেকেই বামপন্থী সংগঠন বা পার্টি অতিবামদের থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরী করে নিজেদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রবেশ করলো এবং অতিবামরা ধীরে ধীরে বামপন্থীদের থেকে নিজেদের দূরত্ব তৈরী করলো। এর ফলে নকশালবাড়ি অতিবাম আন্দোলনের যে ধারা সেটা খানিকটা স্থগিত হয়ে গেল নানা ভাবে। যদিও বর্তমানে অতিবাম সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গে নানাভাবে তাদের কর্মসূচী করে চলেছে। কিন্তু ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের যে সংসদীয় রাজনীতি সেটা অনেকাংশেই নকশালবাড়ি আন্দোলনের ধারাকে স্তিমিত করে সংসদীয় রাজনীতির কায়দায় মানুষের প্রয়োজনের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ছাত্র আন্দোলন করার চেষ্টা করেছিল।

এখান থেকে এই গবেষণায় তিনটে ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছে যা হল—সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন ও সন্দেশখলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন। এবং এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে ভূমি সুরক্ষা, ভূমিহীনদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন এবং বামফ্রন্ট সরকারের অমানবিক চেহারা। এর পাশাপাশি আমরা খুবই নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি আন্দোলন; যেমন- দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, যেখানে আন্দোলনটা সমস্ত কিছুকে আমূল পরিবর্তনের আন্দোলন নয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রশাসন, সরকারের নানাবিধ পদস্খলন। সেই পদস্খলনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আন্দোলন তৈরি হয়েছে। যে পদস্খলনের একটি উদাহরণ নিয়োগ দুর্নীতি ও আরেকটি হল সন্দেশখালি। যেখানে একপ্রকার স্থানীয় জায়গার ব্যাপক দুর্নীতির পরিসর তৈরী করেছিল এবং যেখানে একরকম সমস্ত ধরনের শোষণের ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত হয় যেখানে সমাজের পুরো অংশ, বিশেষতঃ মহিলারা অংশ নিয়েছিল ও তাদের সাথে ছাত্র সমাজ অংশ নিয়েছিল। সুতরাং এই গবেষণায় আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আমূল পরিবর্তনের কথা না বলে কোনখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপশাসন, দুর্নীতি; কোথায় মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে এই ধরণের ইস্যু ভিত্তিক এবং সিস্টেমের মধ্যে থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ বদলের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্যগুলি হলো:

- বিগত দুদশকের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের বিশিষ্টগুলি কি চিহ্নিত করা।
- সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে ছাত্র আন্দোলনের ধরনধারণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা।
- ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য খুঁজে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষিতে তার প্রভাবগুলি কি তা ব্যাখ্যা করা।
- বিভিন্ন আন্দোলন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলনের গতিপথে কি প্রভাব ফেলেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করা।

বর্তমান গবেষণাতে পশ্চিমবঙ্গের তিনটে প্রধান ঘটনা বা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন; দ্বিতীয়ত, সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি; তৃতীয়ত, সন্দেশখালির ঘটনাবলি। প্রতিটি অধ্যায়ে এই ঘটনাগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আন্দোলনের ধরন, উদ্দেশ্য, প্রভাব ও গতিপথ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্তমান গবেষক গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা (methodology) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। যেখানে গবেষণার কাঠামো, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি, বিশ্লেষণের কৌশল এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হয়েছে। এই গবেষণাটি মূলত গুণগত (qualitative) বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে, যেখানে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি গবেষণার নীতিগত ও কাঠামোগত ভিত্তি তৈরি করছে, যা পরবর্তী অধ্যায়ের গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমি সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো। প্রথমে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারনে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচনা করবো। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের ভুমিকা যেমন – কৃষক, মজুর, মহিলা এবং স্থানীয় জনগণের চিন্তা ও মতামত কেমন ছিল ইত্যাদি বলবো। তার পরের অংশে আমি আলোচনা করবো যে পার্টি সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ, নীতি নিয়ে। এবং এর মাধ্যমে কিভাবে সরকার এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের ভুমিকা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভুমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করবো। এই আলোচনা করার পর এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এর পর আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানা ভুমিকা পালন করেছিল। এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারণা প্রদান করেছে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করবো।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমি মূলত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাখাতে চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করবো প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি বিরোধী

অভিযোগ গুলির পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারনে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এবং তার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচনা করবো। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলণের প্রেক্ষাপটে কারা কারা সরাসরি ভুক্তভোগী বা আন্দোলনের বিভিন্ন ভুমিকায় জড়িত ছিল – যেমন, চাকরি প্রার্থী, প্রশাসন ও সরকার, এদের বক্তব্য কি এবং কেমন ছিল ইত্যাদি বলবো। তার পরের অংশে আমি আলোচনা করবো যে পার্টি সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ, নীতি নিয়ে। এবং এর মাধ্যমে কিভাবে সরকার এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভুমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করবো। এই আলোচনা করার পর এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এর পর আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই চাকরি দুর্নীতি আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানা ভুমিকা পালন করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমি সন্দেশখালি অঞ্চলের জমি দখল ও অত্যাচার কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। প্রথমে সন্দেশখালি ঘটনার বা আন্দোলনের পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারনে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচনা করবো। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের ভুমিকা যেমন – জমিহারা সম্প্রদায়, মহিলা এবং স্থানীয় জনগণের চিন্তা ও মতামত কিভাবে এই আন্দোলনকে প্রতিবাদীদের হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। তার পরের অংশে আমি আলোচনা করবো যে পার্টি সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ ও নীতি নিয়ে। এবং এর মাধ্যমে কিভাবে সরকার এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভুমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করবো। এই আলোচনা করার পর এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এর পর আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানা ভুমিকা পালন করেছিল। এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারণা প্রদান করেছে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করবো।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার উপসংহারে, উপরোক্ত ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব, এবং ছাত্র আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্র আন্দোলন কীভাবে

রাজনৈতিক দলগুলির কৌশল এবং সমাজের বৃহত্তর সামাজিক গতিশীলতাকে প্রভাবিত করে, এবং আন্দোলনের গতিপথে পরিবর্তনশীলতার বিষয় নিয়ে এই গবেষণা একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ

গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা একটি কাঠামোবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যা আমাদের গবেষণার প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিবিদ্যা, গবেষণার প্রতিটি ধাপকে সুসংগঠিত করে এবং গবেষণার ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য, বৈধ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করবে গবেষণার ফলাফল পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব কিনা, অর্থাৎ একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে একই ফলাফল পাওয়া যায় কিনা। এই বৈধতা নিশ্চিত করবে যে, গবেষণার ফলাফল গবেষণার উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করছে কিনা। এক্ষেত্রে "পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।" এই গবেষণার মূল প্রশ্ন বা সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে—কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির আঙিণায় ঘটে যাওয়া ঘটনার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ কোন দিকের দিশা দেখাচ্ছে? গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে গবেষণার প্রশ্ন বা সমস্যার যথাযথ সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়। প্রতিটি ধাপ সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হলে গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়ে যায়। গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা অন্যান্য গবেষকদের জন্য গবেষণার প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি ও যাচাই করার সুযোগ দেয়। এই সন্দর্ভে বর্তমান গবেষক গবেষণার প্রতিটি ধাপ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছে কারণ, অন্যান্য গবেষকরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ফলাফল যাচাই করতে পারেন। এটি গবেষণার ফলাফলের বিশ্বাস যোগ্যতা বাড়ায় এবং গবেষণার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করে তোলে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করাও গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়, যেমন সার্ভে, ইন্টারভিউ বা পর্যবেক্ষণ। সংগ্রহীত তথ্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত পরিসংখ্যানিক বা গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যা গবেষণার ফলাফলকে নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য। এই নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধ গবেষণা উপসংহার তৈরিতে সহায়তা করেছে এবং গবেষণার ফলাফলকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে সহায়কের ভূমিকায় এবং জ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান

রেখেছে। গবেষণার ফলাফল নতুন তত্ত্ব ও ধারণা বিকাশে সাহায্য করেছে, যা ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে বাস্তব সমস্যার সমাধান করা যায় এবং নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য পাওয়া যায়। গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা গবেষণার প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করে, যার ফলে গবেষণার প্রতিটি ধাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। এটি গবেষণার ফলাফলকে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। সুতরাং, গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা গবেষণার প্রক্রিয়াকে কাঠামোবদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও বৈধ করে তোলে। এটি গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করে, জ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান রাখে এবং গবেষণার ফলাফলকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ যোগ্য করে তোলে। সঠিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করলে গবেষণার উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করা সম্ভব হয় এবং গবেষণার ফলাফল গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এজন্য গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা অধ্যায়টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

এই অধ্যায়ে "পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।" শীর্ষক গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে গুণগত পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে, যা গবেষণার জটিল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য কার্যকর। যা গবেষণার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়ক হবে বলে মনে করেছি। এই গবেষণা সন্দর্ভটি ছাত্রদের আন্দোলন এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে লেখা।[19] ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কার্যকলাপ নয়; বরং এটি সমাজের আরও বিস্তৃত পরিবর্তন এবং জনগণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। সুতরাং, গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটের গতিপথের বিষয়ে, এবং তার প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এই উদ্দেশ্য অর্জনে, এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিকোণ, যা ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের গভীর পর্যালোচনা করতে সাহায্য করছে। এই গবেষণায় বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে ছাত্র আন্দোলনগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে, ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক পরিচিতি, আন্দোলনের ধরণ, আন্দোলনগুলির পরিবর্তনের গতিপথ এবং এর প্রভাবগুলি নিয়ে বর্ণনা ও

[19]গবেষণা সন্দর্ভ (Research Thesis) হল একটি বিশদ একাডেমিক লেখা, যা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর গবেষণা, বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত আলোচনা উপস্থাপন করে। এটি সাধারণত উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে (মাস্টার্স বা পিএইচডি) লেখা হয় এবং গবেষকের মৌলিক অবদান, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে, সংগ্রহ করা উপাত্তগুলি স্থানভিত্তিক এবং আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ প্রস্তাব করা যায়। পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে কী ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়েও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতিগত দিক থেকে এই গবেষণার বিশেষ তাৎপর্য হলো, এটি তিনটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের সম্পর্ক ও গতিপথ সম্পর্কে নির্দিষ্ট চলমান পথের আলোকে বিশ্লেষণ করা। ফলে, গবেষণার কাঠামোতে ঘটনাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতাগুলি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

- প্রথমত, গবেষণার ক্ষেত্রে গভীরতর রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম, ভোট পরবর্তী হিংসা, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি এবং সন্দেশখালি ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকলেও এই বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলনের অভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা গেছে, কিভাবে প্রতিটি আন্দোলনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাজ করার মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের ভূমিকা ও গতিপথ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।
- দ্বিতীয়ত, এই গবেষণায় অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে মূলত মিডিয়া রিপোর্ট, সরকারি নথি, ইতিহাসবিদদের গবেষণা-প্রবন্ধ এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্যগুলো ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছে। তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং নীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায়, সময়ের সাথে সাথে ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য ও কৌশল কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া, সরকারের ভূমিকা এবং আন্দোলনের পরবর্তী ফলাফল কিভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক গতিশীলতার সাথে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গবেষণাটি শুধুমাত্র ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাবলির বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, বরং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাঠামোর মধ্যে এই আন্দোলনগুলির তাৎপর্য নির্ণয় করা। এই পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্র আন্দোলনগুলোর পরিবর্তনশীল চরিত্র বুঝতে সাহায্য করেছে এবং ভবিষ্যতে ছাত্র রাজনীতির প্রবণতা কী হতে পারে? তা বিশ্লেষণের একটি ভিত্তি তৈরি করেছে। সুতরাং, এই গবেষণার ফলস্বরূপ, ছাত্র আন্দোলনের গভীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সমাজের মূলধারায় কিভাবে পরিবর্তন আনার পথে সহায়ক হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং এর অবদান নিয়ে একটি মূল্যায়ন তৈরি হয়েছে, যা ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত ভূমিকা এবং এর সময়োপযোগী পরিবর্তনকে আরও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। এই গবেষণার পদ্ধতিগত কাঠামো ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।[20] শুধুমাত্র সময়কালিক বা ঘটনাভিত্তিক আলোচনা নয়, বরং আন্দোলনের প্রতীকী ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কিভাবে গঠিত হয়েছে, তার বিশ্লেষণও করা হয়েছে। যার ফলে এই গবেষণার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক, দীর্ঘমেয়াদী ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনার পদ্ধতি

গবেষণা প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে সম্পাদিত করতে বর্তমান গবেষক সন্দর্ভের বিষয় সম্পর্কিত লেখা বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকার খোঁজ করে সেই বিষয়ে তথ্য আহরণ করেছে। গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য সমীক্ষা একটি অপরিহার্য সহায়ক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অতীতে গবেষকেরা কি কি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, কি কি বিষয়ে আনুসন্ধান করেছেন তা লিখিত সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সাহিত্য পর্যালোচনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলি হল— বই, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, গবেষককে গবেষণা কার্যে আরও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে আমি গবেষণার

[20]বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় কোনো বিষয় বা সমস্যার বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করার পদ্ধতি। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ বা একক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে বিভিন্ন তাত্ত্বিক, পদ্ধতিগত ও বাস্তবসম্মত উপাদানকে বিবেচনায় নেওয়া হয়।

উপযোগী সঠিক প্রকল্প নির্মাণ করতে পেরেছি। সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার সীমা নির্ধারণের সাহায্য করেছে। এই পর্যালোচনার সাহায্যে গবেষণার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণায়, সাহিত্য পর্যালোচনা একটি মৌলিক অংশ হিসেবে কাজ করেছে, যা ছাত্র আন্দোলন এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ককে গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক এবং ইতিহাসভিত্তিক কাঠামো তৈরি করেছে। সাহিত্য পর্যালোচনার পদ্ধতিটি মূলত তাত্ত্বিক ভিত্তি, ইতিহাস ভিত্তিক বিশ্লেষণ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং বিচার-বিশ্লেষণ এই চারটি মূল দৃষ্টিকোণকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে।

তত্ত্ব ভিত্তিক আলোচনা

ক্রেসওয়েল, তাঁর গবেষণা পদ্ধতির উপর লেখা বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাহিত্য পর্যালোচনা একটি গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করে এবং পূর্ববর্তী গবেষণার ফাঁক বা দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। তিনি বলেন, "একটি কার্যকরী সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করে, যার মাধ্যমে গবেষক তার গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করতে পারেন এবং একইসঙ্গে বিদ্যমান তত্ত্ব ও ধারণাগুলোর সঙ্গে তার গবেষণার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন।" ক্রেসওয়েলের মতে, সাহিত্য পর্যালোচনার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল: তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ফাঁক চিহ্নিত করা—গবেষণায় ব্যবহৃত তাত্ত্বিক কাঠামো ও পদ্ধতিগত ঘাটতি বোঝা যায়, যা নতুন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে (ক্রেসওয়েল, ২০১৪:৪১-৪৩)। এক্ষেত্রে গবেষণার সাহিত্য হিসেবে মূল বইগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। এই পর্যালোচনা গবেষণার কাঠামো গঠনে সহায়তা করে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব, ধারণা ও পদ্ধতিগত দিকগুলো বিশদে ব্যাখ্যা করেছে। এই গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত তত্ত্ব ও ধারণাগুলি স্পষ্ট করে। যেমন- এডওয়ার্ড শিলসের *"অ্যাক্টিভ পাব্লিক পার্টিসিপেটেসন"* তত্ত্ব বা আন্তোনিও গ্রামশির "হেজিমনি অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি" তত্ত্ব ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা প্রদান করেছে।

বিশ্লেষণধর্মী বই পর্যালোচনা করলে গবেষণার যুক্তি নির্মাণ আরও শক্তিশালী হয়। যেমন- চার্লস টিলির *সোশ্যাল মুভমেন্টস, ১৭৬৮–২০০৪* বইটি সামাজিক আন্দোলনের গতিশীলতা ব্যাখ্যা করে, যা ছাত্র আন্দোলনের

বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। গবেষণার ফাঁক চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও অনালোচিত দিকগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে।[21] উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্দিষ্ট প্রভাব নিয়ে তুলনামূলক কম আলোচনা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা ছাত্র আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব, এবং আদর্শিক রূপান্তরের প্রকৃতি বোঝাতে সাহায্য করেছে। ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক ও তাত্ত্বিকরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। ই. এইচ. কার তাঁর গ্রন্থ *হিস্ট্রি কী?*-এ উল্লেখ করেছেন, ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনা নয়, বরং সেই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি বলেন, গবেষককে অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করতে হবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে (কার ১৯৬১:৫৬)। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আন্দোলনগুলোর চরিত্র ও অভিমুখ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। স্কট তাঁর *সোশ্যাল মুভমেন্টস অ্যান্ড দেয়ার হিস্টরিজ* বইয়ে সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা কাঠামো এবং আদর্শিক দ্বন্দ্বের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ছাত্র আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষাঙ্গনের বিষয় নয়, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর অংশ (স্কট ১৯৯৯:৭৮)। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন, সন্দেশখালি আন্দোলন এবং শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদগুলোও বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। কোসেলেক তাঁর *"দ্যা প্র্যাকটিস অফ কনসেপচুয়াল হিস্টরি"* বইতে ইতিহাসের বিশ্লেষণে ধারণাগত পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো নির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে তৈরি হয় এবং সময়ের সাথে সেই ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে। ছাত্র আন্দোলনের আদর্শিক পরিবর্তন বোঝার জন্য তাঁর বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক, কারণ বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনগুলোর মূলমন্ত্র, দাবি ও কৌশলে পার্থক্য দেখা যায় (কোসেলেক ২০০২:২২-২৫)। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত দিক নিয়ে বারোজ এ হিস্টরি অফ হিস্টরিজ (বুরো, ২০০৭) বইয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, গবেষককে অবশ্যই নথিপত্র, মৌখিক ইতিহাস এবং

[21]গবেষণার ফাঁক (Research Gap) বলতে সেই বিষয়গুলোকে বোঝায়, যা বিদ্যমান গবেষণায় সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়নি বা যেগুলো আরও বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এটি গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ গবেষণার ফাঁক চিহ্নিত করেই নতুন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা প্রতিস্থাপিত হয়।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে একত্রে বিবেচনা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনায় এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ও রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয়। এই গবেষণায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সামাজিক প্রভাব, এবং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করেছে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া, সরকারি নীতি, এবং আন্দোলনকারীদের সংগঠিত শক্তির ওপর। ইতিহাস ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে এসব আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা ছাত্র আন্দোলনের গতিশীলতা ও প্রভাব বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ।

এই গবেষণায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা করার সময় বেশ কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। একই সঙ্গে, নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির অনুসরণ করে এই সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একাধিক উৎসের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। বিভিন্ন লেখকের বিশ্লেষণে একেকটি আন্দোলনের প্রভাব ও কারণ ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট থাকা সম্ভব, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে। প্রাথমিকভাবে গুণগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে ঐতিহাসিক দলিল, গবেষণাপত্র ও সংবাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য, যেমন- আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, সরকার বা পুলিশের প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলনের সফলতার হার বিশ্লেষণে নেওয়া হয়েছে। তবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণার সংমিশ্রণ এবং প্রাথমিক ও গৌণ তথ্যের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হয়েছে। গবেষণার নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে একাধিক উৎস পর্যালোচনা ও তথ্য যাচাই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে। এই গবেষণা সন্দর্ভে, ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত সাধারণ তত্ত্ব এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে এর প্রতিফলন বিশ্লেষণ করার জন্য সাহিত্য পর্যালোচনার পদ্ধতিটি একটি বহুস্তরীয় এবং গবেষণাভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। সাহিত্য পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণভাবে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে: সাধারণ তত্ত্বের আলোকে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি এবং তাৎপর্য, ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, প্রভাব এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ রাজনৈতিক পরিবেশে ছাত্র আন্দোলনের সংগঠন ও কার্যকলাপ।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তুলনামূলক বিশ্লেষণ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি, যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্যে মিল-অমিল নির্ধারণ করে গবেষণাকে সুসংগঠিত করতে সহায়তা করে। এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভারত ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে এর বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ও সাদৃশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্দোলনের কার্যকারিতা, সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক প্রভাব, আদর্শিক রূপান্তর এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। স্কিমিড তাঁর *স্টেটস অ্যান্ড সোশ্যাল রেভলিউশন্স* বইয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যে কোনো আন্দোলনকে বুঝতে হলে তার সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ক্ষমতার ভারসাম্য তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি (স্কিমিড, ১৯৭৯:৫৯)। এই সন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের তুলনায় তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রেন্ট তাঁর "*কমপ্যারেটিভ পলিটিক্স: অ্যাপ্রোচেস অ্যান্ড ইশ্যুজ*" বইয়ে তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত দিক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তুলনামূলক বিশ্লেষণ কেবল পার্থক্য চিহ্নিত করার জন্য নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তন বোঝার একটি কার্যকরী পদ্ধতি (ট্রেন্ট ১৯৯৮:৩৭)।

এই গবেষণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য মাল্টি-কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহজতর করেছে।[22] তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে সাক্ষাৎকার, নথিপত্র, সংবাদপত্র ও গবেষণা প্রবন্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যের বৈধতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন স্তরে আন্দোলনের গঠন, অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা এবং প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে সহায়ক হয়েছে।

[22]মাল্টি-কেস স্টাডি (Multi-Case Study) হল একটি গবেষণা পদ্ধতি, যেখানে একাধিক ঘটনা বা কেস (Case) বিশ্লেষণ করে একটি সাধারণ ধারণা বা তত্ত্ব তৈরি করা হয়। এটি কোয়ালিটেটিভ (গুণগত) গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যেখানে বিভিন্ন কেস তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের মিল-অমিল, প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা হয়।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত, আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও কাঠামোর পার্থক্যের কারণে সরাসরি তুলনা করা কঠিন হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করতে হলে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নির্ভরযোগ্য তথ্যের সীমাবদ্ধতা ছিল একটি বড় সমস্যা। বিশেষতঃ, স্থানীয় ও আঞ্চলিক আন্দোলনের তথ্য সহজলভ্য নয় এবং অনেক তথ্য রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয়েছে। তাই তথ্য যাচাই করতে একাধিক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয়ত, আন্দোলনের সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছাত্রদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের ধরন বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পৃথক সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োগ করতে হয়েছে।

এই গবেষণা সন্দর্ভে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক প্রভাব নির্ধারণ করা হয়েছে। সন্দর্ভে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে, যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভিন্ন এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই অনন্য। তুলনামূলক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ কী এবং সামাজিক পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যের সীমাবদ্ধতা ও আন্দোলনের পার্থক্য জনিত চ্যালেঞ্জ থাকলেও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণাকে বস্তুনিষ্ঠ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিচার-বিশ্লেষণ

সাহিত্য পর্যালোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিচার-বিশ্লেষণ, যা বিদ্যমান গবেষণাগুলোর শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে এবং নতুন গবেষণার জন্য একটি সমালোচনামূলক ভিত্তি তৈরি করে। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, গবেষণা প্রবন্ধ, প্রতিবেদন এবং ঐতিহাসিক দলিল বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন মতামত ও তথ্যের মধ্যে থাকা পার্থক্য এবং সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। অনেক গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সরলীকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের

জটিলতা উপেক্ষিত হয়েছে।[23] কিছু গবেষণায় আন্দোলনকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে, যেখানে আন্দোলনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার, কিছু গবেষণা রাজনৈতিক পক্ষপাত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যেখানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে, আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, কৌশল এবং ফলাফল সম্পর্কে একক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া কঠিন হয়েছে। এই বিচার-বিশ্লেষণমূলক সাহিত্য পর্যালোচনায় সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার মধ্যে যে পার্থক্য বা মতানৈক্য রয়েছে, তা চিহ্নিত করতে তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে, ইতিহাস-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রেক্ষিত বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে, তুলনামূলক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ভারত ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যাতে আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রভাব আরও সুস্পষ্ট হয়। বিচার-বিশ্লেষণমূলক সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। বোর্ডিও সামাজিক আন্দোলন বিশ্লেষণে ক্ষমতা ও সামাজিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্র তত্ত্বর[24] ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন, যা ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান বুঝতে সহায়ক হয়েছে (বোর্ডিও ১৯৯৩:২৯-৩১)। এই পর্যালোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি সমস্যা সামনে এসেছে। প্রথমত, বিভিন্ন গবেষণায় তথ্যের পার্থক্য থাকার কারণে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুঁজে পাওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু গবেষণা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ায় একাধিক উৎস যাচাই করে তথ্যের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সীমিত তথ্যপ্রাপ্তি বড় একটি সমস্যা ছিল। অনেক গবেষণায় আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা থাকলেও, দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণার অভাব রয়েছে। ফলে, এই গবেষণায় বিভিন্ন তথ্যসূত্র ও সাক্ষাৎকার ব্যবহার করে তথ্যের গভীরতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

[23]মাল্টি-কেস স্টাডি মানে হলো একাধিক ঘটনা বা কেস নিয়ে গবেষণা করা এবং সেগুলোর তুলনা করে একটা সাধারণ বিষয় বোঝার চেষ্টা করা।

[24]ক্ষেত্র তত্ত্ব পিয়ের বোর্দিয়ুর প্রদত্ত একটি সমাজতাত্ত্বিক ধারণা, যা সমাজের বিভিন্ন কাঠামোগত ক্ষেত্র বা Field-এর মধ্যে বিদ্যমান শক্তি, প্রতিযোগিতা ও সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। বোর্দিয়ুর মতে, সমাজকে একক সত্তা হিসেবে না দেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমষ্টি হিসেবে বোঝা উচিত, যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রের নিজস্ব নিয়ম, শক্তি সম্পর্ক এবং প্রতিযোগিতার ধরন রয়েছে। রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি—প্রতিটি ক্ষেত্র ভিন্ন নিয়ম ও কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয় এবং এখানে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

এই গবেষণায় বিচার-বিশ্লেষণ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমত, গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র বোঝার জন্য ঐতিহাসিক দলিল, সংবাদপত্র এবং গবেষণা প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে বিভিন্ন সময়ের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনের মিল-অমিল নির্ধারণ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বিভিন্ন গবেষণার শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে নিরপেক্ষ ও গভীরতর উপসংহার টানা যায়। এই গবেষণায় বিচার-বিশ্লেষণ ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি, প্রভাব এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণার সমালোচনামূলক পর্যালোচনা বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সহায়ক হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের অনন্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সাহায্য করেছে। তথ্যের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, একাধিক পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণাকে নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিবিদ্যা

গবেষণার উদ্দেশ্য একটি গবেষণা সন্দর্ভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ এটি গবেষণার দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করে, গবেষণার সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করে এবং গবেষকের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হলে গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করা, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সহজ হয় এবং গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যার বিভিন্ন লেখক গবেষণার উদ্দেশ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ক্রেসওয়েল উল্লেখ করেছেন যে, গবেষণার উদ্দেশ্য গবেষণার কাঠামো নির্ধারণে সহায়ক এবং এটি গবেষণা প্রশ্ন ও পদ্ধতির সঙ্গে সুসংগত হতে হবে। তিনি বলেন, “A well-defined research purpose guides the entire study and aligns the research questions with the methodology” (ক্রেসওয়েল ২০১৪:২৫)। অন্যদিকে, পাঞ্চ তার গবেষণার উদ্দেশ্যকে গবেষণা নকশার ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে, গবেষণার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হলে গবেষণা সমস্যা ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি সহজ হয় (পাঞ্চ ২০১৬:১৭-১৮)। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলন এবং তার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য, গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো সুস্পষ্ট

এবং ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। এখানে ছাত্র আন্দোলনগুলির প্রকৃতি, তার পটভূমি এবং ফলস্বরূপ যে সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণার এই উদ্দেশ্যগুলির বিশ্লেষণের জন্য সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে পরিমাণগত উপাদানের ব্যবহারও যুক্ত হয়েছে।

গবেষণায় ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য নথিভিত্তিক গবেষণার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। সরকারী প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশনা, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং আন্দোলন সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে (স্কট ১৯৯০:৩২)। নথিভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে চারটি মানদন্ডের কথা উল্লেখ করেছেন—প্রামাণ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, প্রতিনিধিত্বযোগ্যতা এবং অর্থবোধকতা। এই মানদন্ডগুলোর আলোকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ কাঠামো, উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি বোঝার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ব্যবহার করে আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত গবেষণায় সাক্ষাৎকার পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন যে, এটি গবেষককে প্রতিক্রিয়াশীল তথ্য সংগ্রহ এবং সামাজিক বাস্তবতার গভীরতর বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে (ডেনজিন, লিংকোলন ২০১১:৩০১)। গবেষণার দ্বিতীয় এবং চতুর্থ উদ্দেশ্য অনুসারে, নন্দীগ্রাম আন্দোলন, সন্দেশখালি আন্দোলন, এবং অন্যান্য ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঘটনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। "সাংস্কৃতিক আধিপত্য"-এর তত্ত্ব ব্যবহার করে গ্রামশি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ছাত্র আন্দোলন কীভাবে বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং প্রতিরোধের সংস্কৃতি গড়ে তোলে (গ্রামশি ১৯৭১:২৪৫)। শিলস-এর "সক্রিয় জনসাধারণ অংশগ্রহণ" তত্ত্ব ব্যবহার করে ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে (শিলস ১৯৭১:৪৫-৪৬)। ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বুঝতে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। টোস্কান ঐতিহাসিক গবেষণায় উৎসসমূহের যথাযথ বিশ্লেষণের গুরুত্বের কথা বলেছেন (টোস্কান ২০১৫:৪৪-৪৫)। গবেষণার উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবসম্মত ভাবে

বিশ্লেষণ করার জন্য উপরোক্ত গবেষণা পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বা প্রভাব বুঝতে একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য চয়ন করতে গিয়ে আমাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত, তথ্যসংগ্রহের সীমাবদ্ধতা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে নির্ভরযোগ্য ও সংগঠিত নথির অভাব থাকায় মৌখিক সাক্ষাৎকার ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অনেকেই খোলামেলা মত প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, ফলে নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ ছিল, যেখানে গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছে, বিশেষতঃ ছাত্র আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মূল্যায়নে। সবশেষে, নতুন আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন গবেষণার কাঠামো নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্য সংগ্রহের বহুমাত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার নকশা

গবেষণার নকশা (Research Design) হলো একটি পরিকল্পনা বা কাঠামো, যা একটি গবেষণার লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এটি গবেষণার সমগ্র প্রক্রিয়ার জন্য একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে এবং গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, প্রশ্ন, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা করে। গবেষণার নকশা মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের কাঠামো, কার্যকারিতা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় গবেষণার নকশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্রায়ম্যান উল্লেখ করেছেন যে, গুণগত গবেষণা পদ্ধতি সামাজিক প্রক্রিয়া ও ক্রিয়াকলাপ বোঝার ক্ষেত্রে কার্যকর, কারণ এটি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনার ওপর নির্ভর করে (ব্রায়ম্যান, ২০১২:৩৯-৪১)। এই গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করা

হয়েছে। ব্লালক মূলত সমাজবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানবিদ্যার সংযোগস্থলে কাজ করেছেন এবং সামাজিক গবেষণার পদ্ধতিগত কাঠামো নির্ধারণে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ব্লালক তাঁর বই *ক্যাজুয়াল ইনফারেন্সেস ইন নন-এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ*-এ গবেষণা নকশার কার্যকারিতা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ব্লালকের মতে, একটি গবেষণা নকশা সফল হতে হলে তা অবশ্যই গবেষণার উদ্দেশ্য ও তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে (ব্লালক ১৯৬৪:১১৩)। তিনি ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব দেন এবং জোর দেন পদ্ধতিগত কাঠামোর ওপর, যাতে গবেষণা থেকে সুনির্দিষ্ট ও পুনরাবৃত্তিযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়। যদিও তাঁর কাজ প্রধানত পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে, তাঁর গবেষণা নকশার দৃষ্টিভঙ্গি গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিশেষ করে যখন গবেষণার কাঠামো সুসংগঠিত ও সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন হয়। এই গবেষণার ক্ষেত্রে, যেখানে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, ব্লালকের গবেষণা নকশার ধারণা নিরপেক্ষ তথ্যসংগ্রহ, কার্যকারণ বিশ্লেষণ এবং কাঠামোগত গবেষণা পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়ক করে তুলেছে।

গবেষণা নকশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এর উদ্দেশ্যনিষ্ঠতা, যা গবেষণাকে নিরপেক্ষ ও বাস্তবভিত্তিক করে তোলে। এটি একটি যৌক্তিক কাঠামো প্রদান করে, যা গবেষণার ফলাফলকে নির্ভরযোগ্য করে এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নিশ্চিত করে, যাতে একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে একই ফলাফল পাওয়া যায়। কার্যকারণ বিশ্লেষণের জন্য গবেষণা নকশার সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন, যা গবেষণার মূল প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, এটি নমনীয় হওয়া দরকার, যাতে গবেষণার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। যাচাই যোগ্যতা গবেষণা নকশার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা গবেষণার উপসংহার পরীক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য পদ্ধতিগত ও সুসংগঠিত কাঠামো থাকা জরুরি, যা গবেষণার মান উন্নত করে এবং এর ফলাফলকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিজাইন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন—

- বর্ণনামূলক (Descriptive Research): একটি ঘটনা বা পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা করা।

- বিশ্লেষণমূলক (Analytical Research): তথ্যের উপর ভিত্তি করে কারণ-প্রভাব সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

- আবিষ্কারধর্মী (Exploratory Research): একটি নতুন ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বা তথ্য সংগ্রহ করা।

- পরীক্ষামূলক (Experimental Research): নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে একটি ভেরিয়েবলের প্রভাব পরীক্ষা করা।[25]

এই গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা হিসেবে পরিকল্পিত। গবেষণার বিষয়বস্তু এবং এর প্রেক্ষাপটের জটিলতা বিবেচনায়, এই নকশাটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ছাত্র আন্দোলনের ধারা বা গতি প্রকৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

বর্ণনামূলক গবেষণা

বর্ণনামূলক গবেষণা এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা, পরিস্থিতি বা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো যে বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, সেটির একটি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা। এটি মূলত "কি ঘটছে" এবং "কিভাবে ঘটছে" তা বিশ্লেষণ করে, তবে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণের পরিবর্তে ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেয়। বেস্টওকাহান বলেছেন, বর্ণনামূলক গবেষণা সেই পরিস্থিতি বা সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে, যা বর্তমানে বিদ্যমান, গৃহীত মতামত, চলমান প্রক্রিয়া এবং উদীয়মান প্রবণতাগুলোর একটি চিত্র তুলে ধরে। এই গবেষণা বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার একটি গঠনমূলক বিশ্লেষণ প্রদান করে (বেস্টওকাহান ২০০৬:১১)। বর্ণনামূলক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়, ঘটনা, বা গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে তুলে ধরা। এটি গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্ট করে যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনা কীভাবে বিদ্যমান এবং কী বৈশিষ্ট্য দ্বারা এটি চিহ্নিত হয়। এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ধারা, আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে

[25]ভেরিয়েবল (Variable) হলো গবেষণায় ব্যবহৃত কোনো বৈশিষ্ট্য বা উপাদান, যা পরিবর্তিত হতে পারে। এটি গবেষণার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন মাত্রা বোঝাতে সাহায্য করে।

কিনা, যদি হয় তাহলে কি পরিবর্তন হয়েছে এবং কেন হয়েছে সেই বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। তাই বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি এই গবেষণাতে আন্দোলনের সময়কাল, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রভাব, আন্দোলনের ধারা, সামাজিক অবস্থান এবং ছাত্রদের মোটিভেশন বিশ্লেষণ করে সেই ঘটনার সামগ্রিক একটি ছবি তুলে ধরেছে। কারলিঙ্গার ব্যাখ্যা করেছেন যে, বর্ণনামূলক গবেষণা শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের একটি উপায় নয়, বরং এটি জ্ঞানতাত্ত্বিক নীতির বিকাশ ও সমস্যার সমাধানের পথ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি শুধু কোনো ঘটনার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং সেই ঘটনার বিভিন্ন উপাদান ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে (কারলিঙ্গার ১৯৮৬:৪৫-৪৬)। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে, চিহ্নিত করবে যে আন্দোলনের পেছনে থাকা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীভাবে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেছে এবং এই প্রভাব কীভাবে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ কেন হয়েছিল, ছাত্রদের আন্দোলনের প্রভাব কিভাবে সমাজের ওপর প্রতিফলিত হয়েছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন কতটা প্রভাব ফেলেছে এই রকম কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের গতি প্রকৃতির ওপর কি প্রভাব পড়েছে সেই বিষয়ে এই গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) গবেষণা

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ধারা ও গতি প্রকৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করা জরুরি, কারণ এটি শুধু ঘটনার বর্ণনা নয়, বরং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে সহায়তা করে। এই গবেষণায় গত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র, তাদের আভ্যন্তরীণ কাঠামো, রাজনৈতিক প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা এই গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বিভিন্ন সময়কালের আন্দোলনগুলোর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা কীভাবে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ- নন্দীগ্রাম আন্দোলন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন, সন্দেশখালি আন্দোলন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ছাত্র

সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে হলে কেবল ঐতিহাসিক তথ্য পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়; বরং আন্দোলনের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা করাও জরুরি। এই প্রসঙ্গে গুড ও হাট উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা কেবল ঘটনা পর্যবেক্ষণ নয়, বরং ঘটনাগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক অনুধাবনের মাধ্যমে একটি সুসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করে (গুড, হাট ১৯৫২:৯২-৯৪)। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারণ বিশ্লেষণ, আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা গবেষণার গভীরতা বাড়িয়েছে। কোটারি মনে করেন, বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য যাচাই ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর একটি কার্যকর উপায় (কোটারি ২০০৪:৩৫)। এই গবেষণায় সংবাদপত্র, প্রতিবেদন, ইন্টারভিউ, রাজনৈতিক বক্তব্য এবং ছাত্র সংগঠনের নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে আন্দোলন কীভাবে বিভক্ত হয় এবং কীভাবে কিছু আন্দোলন রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশলের অংশ হয়ে ওঠে, তা ব্যাখ্যার জন্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা অপরিহার্য ছিল।

আমার গবেষণার ধরণ

বর্তমান গবেষণায় বর্ণনামূলক গবেষণা নকশা এমন একটি পর্যায়ে কাজ করেছে, যেখানে একটি নতুন বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি গবেষণার প্রাথমিক স্তর, যা পরবর্তী বিশ্লেষণমূলক বা পরীক্ষামূলক গবেষণার জন্য ভিত্তি তৈরি করে। তাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হল "পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ছাত্র আন্দোলনের পরিবর্তন", এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণার মাধ্যমে সেই পরিবর্তনের ধরন এবং তার ফলাফল সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এই গবেষণায় বর্ণনামূলক নকশা বেছে নেওয়ার প্রয়োজনে সেইমত গবেষণার সঠিক মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রদানের জন্য পর্যবেক্ষণ এবং জরিপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো ছাত্র আন্দোলনের কাঠামো, গতিপ্রকৃতি এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গ বিশদভাবে বোঝা। গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা এবং এর গতি প্রকৃতি বা ধারা আনুধাবন করা যেহেতু

এই বিষয়টি গতিশীল এবং বহুমাত্রিক, তাই শুধুমাত্র নথিভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য, বাস্তব তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ ও জরিপ পদ্ধতি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

এই গবেষণায় বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির ব্যবহার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ছাত্র আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই গবেষণায় বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা নকশার অধীনে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এটি ছাত্র আন্দোলনের পরিবর্তনশীল ধারা ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বোঝার জন্য অপরিহার্য। ঐতিহাসিক পদ্ধতি এখানে কেবল অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়, বরং সেই ঘটনাগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেমন-নন্দীগ্রাম আন্দোলন, সন্দেশখালি আন্দোলন ও শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী প্রতিবাদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো শুধুমাত্র সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল নয় বরং এগুলোর ঐতিহাসিক শিকড় রয়েছে।

তাই, গবেষণায় ঐতিহাসিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় ছাত্র আন্দোলনের কাঠামো, কৌশল এবং প্রভাব কীভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকা কী ছিল। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গবেষণায় অতীতের কৃষক আন্দোলন ও বাম আমলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাবকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। একইভাবে, শিক্ষাখাতে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে বোঝার জন্য অতীতের ছাত্রদের সংগঠিত প্রতিবাদ, বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক আন্দোলন এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গেছে যে এসব আন্দোলনের বেশিরভাগই রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন, যা এককভাবে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়। এছাড়া, ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে এই গবেষণায় দেখা হয়েছে যে ছাত্র আন্দোলনগুলোর ফলাফল স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে, তবে তার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও রয়েছে। গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে সাক্ষাৎকার ও জরিপ থেকে সংগৃহীত সাম্প্রতিক তথ্যের সাথে অতীতের ঘটনা ও রাজনৈতিক

সিদ্ধান্তের সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। অতীতের আন্দোলনের রূপরেখা, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থানকে তুলনা করে বর্তমানে ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতএব, এই গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের গভীরতর বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। এটি শুধু অতীতের ঘটনাগুলোর রেকর্ড উপস্থাপন নয়, বরং বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে তার সম্পর্ক ও প্রভাব মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি, যা গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বেছে নিয়েছি কারণ ছাত্র আন্দোলনের মতো ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনের সময় ছাত্রদের ভূমিকা, অংশগ্রহণের ধরন, তাদের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রতিক্রিয়া সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়। ক্রেসওয়েল উল্লেখ করেছেন যে, পর্যবেক্ষণ গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করে, কারণ এটি গবেষককে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ও সংবেদনশীল করে তোলে (ক্রেসওয়েল ২০১৪:২৯)। এছাড়া, আন্দোলনের সময়কার ভাষণ, স্লোগান, প্রতীকী প্রতিবাদ, সংগঠনের ধরন এবং বাহ্যিক আচরণও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, যা ছাত্র আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহের কার্যকর উপায়। ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিপ্রায় বুঝতে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্লালক বলেছেন যে, জরিপ পদ্ধতি সামাজিক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যা গবেষকের কাছে বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যাশা এবং অভিজ্ঞতার তথ্য সরবরাহ করে (ব্লালক ১৯৮৫:২২-২৩)। এই গবেষণায় ছাত্র সংগঠনের সদস্য, সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে ছাত্র আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ও কাঠামোবদ্ধ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এই দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ গবেষণার ফলাফলকে আরও নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল করেছে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য প্রদান করে, যেখানে জরিপ পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সংগ্রহ করে গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ফলে, গবেষণার মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা এবং ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণায় বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক, পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিগত নকশা ব্যবহার করতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

- প্রথমত, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ ছিল যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা। ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ কাঠামো, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা এবং আন্দোলনের বহুমাত্রিক প্রভাব ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে তথ্যের ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল।
- দ্বিতীয়ত, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি বা সীমিত পরিসরে করা হয়েছে, কারণ কিছু আন্দোলনের ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে নন্দীগ্রাম বা অন্যান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি, ফলে এই তথ্যের জন্য মূলত সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্র ও অন্যান্য নথির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।
- তৃতীয়ত, জরিপ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত মতামত সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।সেই সমস্যাগুলি হল প্রথমত, রাজনৈতিক কারণে অনেকে খোলাখুলি মতামত দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন বা পক্ষপাতদুষ্ট উত্তর দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কিছু আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন ছিল, বিশেষত যারা বর্তমানে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছেন বা যাদের অবস্থান বদলেছে। চতুর্থত, ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংরক্ষণ ও যাচাই করা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দলিল, সংবাদ প্রতিবেদন এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্যে পার্থক্য থাকায় তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে, ফলে উপাত্ত বিশ্লেষণ ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়েছে। সর্বোপরি, এই গবেষণায় একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ও তথ্যের অমিল মেলানো এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা একটি সময়সাপেক্ষ ও কঠিন কাজ ছিল। তবুও, বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণাটি ছাত্র আন্দোলনের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণকে আরও শক্তিশালী করেছে।

জনসংখ্যা এবং নমুনা

গবেষণায় জনসংখ্যা এবং নমুনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি গবেষণার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা ও সাধারণীকরণের সক্ষমতা নির্ধারণ করে। জনসংখ্যা বলতে সেই সমগ্র গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়, যাদের নিয়ে গবেষণা করা হয়, এবং নমুনা হলো সেই গোষ্ঠীর একটি অংশ, যাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমস্ত জনসংখ্যার উপর গবেষণা করা প্রায়শই কঠিন হয়, তাই গবেষকরা যথাযথভাবে নির্ধারিত নমুনার মাধ্যমে বৃহত্তর জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষণায় জনসংখ্যা ও নমুনা ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো সময়, খরচ এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে যথাযথ গবেষণা পরিচালনা করা। বড় আকারের জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা জটিল এবং ব্যয়বহুল, তাই যথাযথ নমুনা নির্বাচন করলে গবেষণা আরও কার্যকর হয়। গবেষণায় নমুনা নির্বাচন যথাযথ না হলে ফলাফল বিভ্রান্তিকর হতে পারে এবং তা জনসংখ্যার প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত নাও করতে পারে। এজন্য গবেষকরা বিভিন্ন নমুনা গ্রহণের পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যেমন সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য নমুনা পদ্ধতি। জনসংখ্যা ও নমুনার গুরুত্ব সম্পর্কে গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। কেরলিঞ্জার বলেন, “একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সঠিক নমুনা নির্বাচন করা জরুরি, কারণ এটি গবেষণার ফলাফলের প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করে” (কেরলিঞ্জার ১৯৮৬:১৩৪)। এই গবেষণার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ও নমুনার নির্বাচন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটি ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো বিষয় বিশ্লেষণ করে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের রাজনৈতিক সংযুক্তি, আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও মতামত বিশ্লেষণের জন্য একটি বৈচিত্র্যময় নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে তা বৃহত্তর ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। নমুনা নির্বাচন করার সময় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজন, বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণের স্তর বিবেচনা করা হয়েছে।

নমুনার ধরন

গবেষণায় নমুনা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি গবেষণার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা ও সাধারণীকরণের সক্ষমতা নির্ধারণ করে। সাধারণত, নমুনা নির্বাচন দুটি প্রধান পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়: সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য নমুনা। সম্ভাব্য নমুনা পদ্ধতিতে জনসংখ্যার প্রতিটি সদস্যের সমানভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে, যা

গবেষণার বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করে। এর মধ্যে সিম্পল র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং, স্তরীকৃত, ক্লাস্টার এবং পদ্ধতিগত নমুনা উল্লেখযোগ্য, যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। অন্যদিকে, অসম্ভাব্য নমুনা পদ্ধতিতে গবেষক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা সহজলভ্যতার ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করেন, যা সাধারণত গুণগত গবেষণায় বেশি ব্যবহৃত হয়। এখানে সুবিধামূলক, উদ্দেশ্যমূলক, তুষারপাত এবং কোটা নমুনার মতো পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহে সহায়ক। এই গবেষণায় নমুনা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অসম্ভাব্য নমুনার উদ্দেশ্যমূলক এবং তুষারগোলক নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা গবেষণার লক্ষ্য ও কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতি নির্বাচনের মূল কারণ হলো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে উপযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা, যারা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান রাখে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং আন্দোলনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, তুষারগোলক নমুনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কারণ ছাত্র আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই সরাসরি চিহ্নিত করা কঠিন ছিল।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে একজন অংশগ্রহণকারী অন্য অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ করেছেন, যা গবেষকের জন্য আন্দোলনের গভীরে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি করেছে। বিশেষত, রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এবং ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সহজ হয়েছে। এই দুটি নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার বিশ্লেষণ আরও সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ এতে ছাত্র আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা, অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা হলো একটি অ-প্রতীকী নমুনা পদ্ধতি যেখানে গবেষক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এমন ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীগুলিকে বেছে নেন, যারা গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে সক্ষম। এই পদ্ধতিতে গবেষকের অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষমতা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্যাটন উল্লেখ করেছেন যে, উদ্দেশ্যমূলক নমুনার মূল লক্ষ্য হলো গবেষণার জন্য অর্থবহ ও যথাযথ তথ্য প্রদান করতে সক্ষম এমন অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা। তাঁর মতে, "Purposeful sampling focuses on selecting information-rich cases whose study will illuminate the questions under study" (প্যাটন ২০০২:২৪৯)। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক প্রভাব বোঝার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষত, আন্দোলনে সক্রিয় ছাত্রনেতা, আন্দোলন সংগঠকদের নির্বাচন করা হয়েছে, যাদের অভিজ্ঞতা গবেষণার মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে সহায়ক। আন্দোলনের বিশ্লেষণের জন্য শুধুমাত্র সাধারণ ছাত্র নয়, বরং আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী, সংগঠক ও রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম, সন্দেশখালি, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন এবং নির্বাচনী পরবর্তী সহিংসতায় ছাত্রদের ভূমিকা বিশ্লেষণে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা, মতামত এবং আন্দোলনের কৌশলগত দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে গিয়ে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তথ্যের নিরপেক্ষতা ও বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা। ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রকৃতির কারণে নির্দিষ্ট মতাদর্শের অংশগ্রহণকারীদের বেশি অন্তর্ভুক্তির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, ফলে ভিন্নমতাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এছাড়া, রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে অনেকে খোলামেলা তথ্য দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যা তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইকে জটিল করে তুলেছে। আরেকটি সমস্যা ছিল বৃহত্তর ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের ওপর নির্ভর করায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত থেকেছে, ফলে আন্দোলনের প্রকৃত প্রভাবের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া কঠিন হয়েছে। পাশাপাশি, অতীত আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহের সময় অনেক অংশগ্রহণকারীর স্মৃতিভ্রংশ ও রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে তথ্যের সঠিকতা বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তুষারগোলক নমুনা পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে তথ্যের বৈচিত্র্য ও নির্ভরযোগ্যতা কিছুটা বাড়ানো যায়। পাশাপাশি, একাধিক উৎস থেকে তথ্য যাচাই করে গবেষণার ফলাফলের যথার্থতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তুষারগোলক নমুনা

তুষারগোলক নমুনা একটি অপ্রত্যাশিত বা হার্ড-টু-রিচ জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি, যেখানে প্রাথমিক নমুনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আরও অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করা হয়।[26] বিখ্যাত গবেষক গুডম্যান প্রথম এই পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং এটি নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক নমুনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে (গুডম্যান ১৯৬১:১৪৮-১৭০)। পরে ব্যাকম্যান ও স্যালে উল্লেখ করেন যে, এই পদ্ধতি বিশেষত তখন কার্যকরী হয়, যখন গবেষণার লক্ষ্যগোষ্ঠী ছোট বা ছদ্মবেশী থাকে এবং সাধারণ পদ্ধতিতে তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় (ব্যাকম্যান,স্যালে, ১৯৯৮:৯৬)। বর্তমান গবেষণায় তুষারগোলক নমুনা ব্যবহার করা হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। যেহেতু আন্দোলনের অনেক অংশগ্রহণকারী সংবেদনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সরাসরি গবেষণায় অংশ নিতে আগ্রহী ছিলেন না, তাই প্রথমে কিছু বিশ্বস্ত উৎসের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়। এরপর, তাঁদের সুপারিশে ধাপে ধাপে আরও অংশগ্রহণকারী যুক্ত করা হয়, যাতে বিভিন্ন মতাদর্শের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও তথ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত, আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের পাশাপাশি সাধারণ কর্মী এবং প্রাক্তন আন্দোলনকারীদের মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, যা গবেষণার ফলাফলকে আরও ব্যাপক ও তথ্যসমৃদ্ধ করেছে। তবে, এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ছিল মতামতের সম্ভাব্য পক্ষপাত এবং নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সীমাবদ্ধতা, যা গবেষণার তথ্য সংগ্রহে কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

এই বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে, নমুনা নির্বাচন করতে সাধারণত নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করেছি

- লক্ষ্য জনসংখ্যা[27]- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রনেতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কর্মী নেতা, সাধারণ নাগরিক, যারা আন্দোলন বা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, যেমন সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের বেছে নেওয়া হয়েছে।

[26]হার্ড-টু-রিচ (Hard-to-Reach) বলতে বোঝানো হয় সেই ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী, যাদের কাছে পৌঁছানো বা যাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। সাধারণত, সামাজিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কারণে এই গোষ্ঠীগুলো গবেষণার আওতায় সহজে আসে না।

[27] লক্ষ্য জনসংখ্যা (Target Population) হলো সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, যাদের নিয়ে গবেষণা করা হয় বা যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি গবেষণার মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

- নমুনার আকার- ১০০ জন অংশগ্রহণকারী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪০ জন ছাত্রনেতা, ৪০ জন রাজনৈতিক কর্মী, ১০ জন সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং ১০ জন সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং গবেষক রয়েছে।
- নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রসমূহ- গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি প্রধান ঘটনা বা আন্দোলন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত অঞ্চলে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে: সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন: কলকাতা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সন্দেশখালির ঘটনা: উত্তর ২৪ পরগনা এবং সন্দেশখালি অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীরা।

বর্তমান গবেষণায় নমুনা নির্বাচন করতে গিয়ে আমাকে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

- প্রথমত, রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে অনেক অংশগ্রহণকারী তথ্য দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যা নমুনা বৈচিত্র্যকে সীমিত করেছে।
- দ্বিতীয়ত, তুষারগোলক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নমুনা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকি তৈরি করেছে, ফলে বৃহত্তর ছাত্র সমাজের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি।
- তৃতীয়ত, আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট বা অসম্পূর্ণ হওয়ায় নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এছাড়া, সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতাও নমুনা বিস্তৃত করতে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও, যথাযথ কৌশল অনুসরণ করে গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহ সামাজিক গবেষণার একটি অপরিহার্য স্তম্ভ, যা গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্লেষণের গভীরতা নির্ধারণ করে। গবেষণার ধরন ও লক্ষ্য অনুসারে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। বর্তমান গবেষণায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছাত্র আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে, যা গুণগত ও

পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাকে সুসংহত করেছে। গোডার্ড ও মেলভিল তথ্য সংগ্রহকে কেবলমাত্র একটি তথ্য আহরণের প্রক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী যথাযথ উৎস নির্বাচন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (গোডার্ড, মেলভিল ২০০৪:৩৭)। অ্যাডামস খান ও রাহমান তথ্য সংগ্রহকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—প্রাথমিক ও দ্বিতীয়িক (খান, রাহমান ২০১৪:৫৮)। ব্রাইম্যান আরও যুক্ত করেন যে, সামাজিক গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগ গবেষণার ফলাফলকে আরও কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে (ব্রাইম্যান ২০১২:৩৯)। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণের জন্য উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলনের গতিশীলতা বোঝার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্লেষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা (ব্লুমার ১৯৬৯:৬৮) প্রতীকী আন্তঃক্রিয়া তত্ত্বের আলোকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতি অনুধাবনে সহায়তা করেছে। দ্বিতীয়িক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দলগুলোর বিবৃতি ও পূর্ববর্তী গবেষণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নথিপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা বুঝতে সাহায্য করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা ব্রাইম্যানের তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি আন্দোলনের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ নিশ্চিত করেছে এবং ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক প্রভাবকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সহায়ক হয়েছে। গবেষণার কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল পারস্পরিক সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছে, যা গবেষণার ফলাফলকে আরও বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য করেছে। গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করতে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। "পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ” শীর্ষক এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) ডেটা সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য

প্রাথমিক তথ্য সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক ও পদ্ধতিবিদ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করেছেন। সামাজিক গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য হলো সেই তথ্য, যা গবেষক সরাসরি সংগ্রহ করেন এবং যা গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সংগৃহীত হয়। এটি সাধারণত সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। গোডার্ড ও মেলভিল গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, এটি গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, গবেষণার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হলে সেটি বিদ্যমান তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে (গোডার্ড, মেলভিল ২০১৪:৪২)। ব্রাইম্যান প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, গুণগত তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, গভীর সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ব্যবহৃত হয়, যেখানে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সার্ভে ও পরীক্ষামূলক গবেষণা বেশি কার্যকর (ব্রাইম্যান ২০১২:২৪)। বেবি গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রাথমিক তথ্য গবেষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাই এটি গবেষণার নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী সংগৃহীত হয় এবং গবেষণার মূল প্রশ্নের সাথে অধিক প্রাসঙ্গিক হয়। তিনি সামাজিক গবেষণায় ক্ষেত্র গবেষণা ও সরাসরি পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, যা গবেষককে বাস্তবিক পরিস্থিতি থেকে তথ্য আহরণে সহায়তা করে (বেবি ২০১৫)। ক্রুগার ও কেসি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক ইস্যুতে মানুষের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য ফোকাস গ্রুপ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর (ক্রুগার, কেসি ২০১৫:৩৪)। তবে, তারা এই তথ্য সংগ্রহের কিছু চ্যালেঞ্জও তুলে ধরেছেন, যেমন—সময় ও ব্যয় বেশি হওয়া এবং তথ্য বিশ্লেষণের জটিলতা।

বর্তমান এই গবেষণার প্রতিটি বিষয়ের ওপর প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যেখানে

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেখানে মূলত সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছাত্রনেতা, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতি গ্রুপে ৬ জন করে নিয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যাতে আন্দোলনের লক্ষ্য, কৌশল এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার নানা দিক উঠে আসে। পাশাপাশি আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আন্দোলন চলাকালীন সংগৃহীত প্রচারপত্র, ব্যানার, প্রতিবাদী পোস্টার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা আন্দোলনের প্রকৃতি ও তার বিস্তার বুঝতে সাহায্য করেছে।

যেখানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেখানে সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছাত্রনেতা, ক্ষতিগ্রস্ত চাকরিপ্রার্থীরা, সাংবাদিক এবং শিক্ষানীতির বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যাতে আন্দোলনের মূল কারণ, প্রতিক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে আন্দোলনের স্থান পরিদর্শন করে আন্দোলনকারীদের অভিজ্ঞতা ও তাদের প্রতিবাদের ধরন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে আন্দোলন চলাকালীন সংগৃহীত তথ্য, ব্যানার, প্রতিবাদী পোস্টার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবাদী প্রচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা আন্দোলনের গতিশীলতা বুঝতে সহায়ক হয়েছে। সন্দেশখালি ঘটনার প্রেক্ষাপটে সামাজিক আন্দোলন ও ছাত্র প্রতিবাদ বিশ্লেষণের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে সরেজমিনে গিয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দা, আন্দোলনকারী ছাত্র, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যাতে আন্দোলনের বাস্তবিক চিত্র ও প্রভাব সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। আন্দোলনের স্থান ও কর্মসূচি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং সংঘর্ষের প্রকৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা ছিল উত্তরদাতাদের পক্ষপাতদুষ্ট মতামত, বিশেষ করে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষ্য করা গেছে। অনেক সময় তারা নিজেদের সংগঠনের স্বার্থে তথ্য উপস্থাপন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে উত্তর না দেওয়া, নানা রকম অজুহাত সহযোগে কথা বলা এবং কথা ঘোরানোর বিষয় লক্ষ্য করা গেছে যা গবেষণার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার ক্ষেত্রে সময় ও স্থান সংক্রান্ত কিছু বাধা এসেছে। বিশেষ করে সন্দেশখালি ও নির্বাচনী পরবর্তী হিংসার ক্ষেত্রে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ অনেক প্রত্যক্ষদর্শী নিরাপত্তার কারণে মুখ খুলতে চাননি বা রাজনৈতিক ভীতির কারণে নিরপেক্ষ মতামত দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে অনেক সময় আলোচনা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেয়নি। ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মতাদর্শগত বিভেদ থাকার কারণে তারা একে অপরের মতামতকে খণ্ডন করেছেন, যা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করেছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলো সত্ত্বেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে গবেষণার নির্ভুলতা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রতিটি অধ্যায়ে যথাযথভাবে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্কের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সংমিশ্রণে গবেষণার বিশ্লেষণ আরও বাস্তবসম্মত এবং গভীরতর হয়েছে, যা গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

গৌণ তথ্য

গৌণ তথ্য সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। বেস্ট গৌণ তথ্যকে পূর্বে সংগৃহীত তথ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা গবেষকের নিজস্বভাবে সংগৃহীত নয়, বরং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সংবাদমাধ্যম বা অন্যান্য গবেষকদের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় (বেস্ট ১৯৮১)। কোহেন গৌণ তথ্যকে গবেষণার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে দেখেছেন, যা গবেষণার সময় ও ব্যয় কমাতে সহায়ক হলেও এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষণায় গৌণ তথ্য প্রাথমিক

তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যবহার করলে বিশ্লেষণ আরও গভীর ও প্রসঙ্গ ভিত্তিক হয় (কোহেন ২০০৭:২১৪)। বর্তমান গবেষণায় গৌণ তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কারণ এটি ছাত্র আন্দোলন ও তার গতি প্রকৃতির ধারা, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও আন্দোলনের ধরণ পরিবর্তনের বিষয় বুঝতে সহায়ক হয়েছে। গবেষণায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের লেখা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য, আন্দোলনকালীন লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার এবং প্রতিবাদী প্রচারপত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

বিশেষ করে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর প্রকাশিত লিফলেট, ব্যানার এবং পোস্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এগুলো বিশ্লেষণ করে আন্দোলনের মূল বার্তা, কৌশল এবং দাবি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের লেখা পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের প্রচারপত্র ও ব্যানার পর্যালোচনা করে আন্দোলনের দাবিগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও জনমতের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদালতের রায়, সরকারি প্রতিবেদন এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি আন্দোলনকারীদের তৈরি পোস্টার, ব্যানার ও প্রচারপত্র আন্দোলনের ভাষা ও প্রতিবাদের ধরন বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে। এই প্রতিবাদী উপকরণগুলো দেখায় যে কিভাবে ছাত্র আন্দোলন গণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লিফলেট ও পোস্টার ব্যবহার করেছে, এবং কিভাবে আন্দোলনের কৌশল সময়ের সঙ্গে বদলেছে। সন্দেশখালি ঘটনার প্রেক্ষাপটে আন্দোলনকারীদের প্রকাশিত লিফলেট ও প্রচারমূলক ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতিবাদী বার্তা এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য একত্রিত করে ঘটনার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে ঘটনাগুলোর কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দ্য টেলিগ্রাফ, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ইকোনমিক টাইমস-এর প্রকাশিত নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের পোস্ট, ভিডিও, লিফলেট ও ব্যানার বিশ্লেষণ করে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রকাশিত প্রচারপত্রও আন্দোলনের ভাষা ও কৌশল অনুধাবনে সহায়ক হয়েছে। তবে, সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিবেদন প্রায়ই পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। তাই, বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে

গবেষণার নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়েছে। গৌণ তথ্য ব্যবহারের একটি বড় সুবিধা হলো, এটি গবেষণাকে ঐতিহাসিক ও প্রসঙ্গভিত্তিক ভিত্তি দেয়, যা কেবলমাত্র প্রাথমিক তথ্যের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে, গৌণ তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ সংবাদমাধ্যম, রাজনৈতিক প্রচারপত্র বা আন্দোলনকারীদের পোস্টার প্রায়ই নিরপেক্ষ নাও হতে পারে। তাই, গবেষণায় একাধিক উৎস বিশ্লেষণ করে তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে, যাতে গবেষণার নির্ভুলতা বজায় থাকে এবং ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

গবেষণায় গৌণ তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্লেষণের গভীরতাকে প্রভাবিত করেছে। অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল তথ্যের নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাত। সংবাদমাধ্যম, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন প্রায়ই নির্দিষ্ট আদর্শিক অবস্থান থেকে উপস্থাপন করা হয়, যার ফলে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া কঠিন হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গবেষণায় একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। এছাড়া, তথ্যের অপ্রাপ্যতা ও সীমাবদ্ধতা গবেষণাকে জটিল করে তুলেছে। নির্দিষ্ট সময় ও প্রসঙ্গভিত্তিক অনেক তথ্য সরকার, রাজনৈতিক দল বা সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেনি কিংবা সংরক্ষিত ছিল না, যার ফলে আন্দোলনের কার্যকারিতা বিশ্লেষণে কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। বিশেষত, ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের প্রচারপত্র, লিফলেট ও ব্যানারের মতো তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন ছিল, কারণ এসব নথি সাধারণত সংরক্ষিত থাকে না। তথ্যের সত্যতা যাচাই করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও রাজনৈতিক প্রচারপত্রে পাওয়া তথ্য প্রায়ই অতিরঞ্জিত বা বিকৃত হতে পারে, যার ফলে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও প্রচারণামূলক তথ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা কঠিন হয়েছে। গবেষণায় এই সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রতিটি তথ্যসূত্র যাচাই করা হয়েছে এবং একাধিক উৎসের সাথে তথ্য মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের অসংগতি গবেষণার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কিছু পুরোনো প্রতিবেদন বা বিশ্লেষণে তথ্য অসম্পূর্ণ ছিল, যা ছাত্র আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। ভাষাগত ও আঞ্চলিক বৈষম্যও গবেষণার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় ছাত্র আন্দোলনগুলোর উপর নির্ভরযোগ্য গৌণ তথ্য তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া গেছে, ফলে আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা

করতে মৌখিক সাক্ষাৎকার ও প্রাথমিক তথ্যের উপর বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, গবেষণায় একাধিক উৎসের সমন্বয় ও তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণকে যথাসম্ভব নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হয়।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি গবেষককে সরাসরি সামাজিক প্রক্রিয়া, আচরণ, মিথস্ক্রিয়া ও ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন গবেষক এই পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন। কোহেন, ম্যানিয়ন ও মরিসন পর্যবেক্ষণকে এমন একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখিয়েছেন, যেখানে গবেষক সরাসরি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, যা অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় আরও বাস্তবসম্মত ও নির্ভরযোগ্য (কোহেন ও অন্যান্য ২০০৭:৩২৩)। বেস্ট পর্যবেক্ষণকে একটি কার্যকর কৌশল বলে মনে করেন, বিশেষ করে তখন, যখন গবেষককে সামাজিক প্রক্রিয়া, আচরণ ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নিতে হয় (বেস্ট ১৯৮১:২৯২)। ডেনজিন ও লিংকলন বলেছেন যে, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নয়, বরং এটি গবেষকের জন্য একটি বিশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া, যা গবেষণার গভীরতা বাড়ায় এবং বিষয়ভিত্তিক উপলব্ধিকে আরও শক্তিশালী করে (ডেনজিন, লিংকলন ২০০০:৫৮৭-৯১)। এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গত দুই দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছাত্র আন্দোলনের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষক বিভিন্ন আন্দোলনের স্থান পরিদর্শন করে ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম, আন্দোলনের কৌশল, স্লোগান, ব্যানার ও পোস্টারের ভাষা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিশেষত, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের গঠনপ্রক্রিয়া, কৌশলগত অবস্থান ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ মূলত নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন এবং সন্দেশখালি ঘটনা—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আলোকে পরিচালিত হয়েছে, যা ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন—এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ভাষাগত উপাদান, ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল পরিদর্শন করে পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট ও স্লোগানের ভাষা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যা আন্দোলনের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া, আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা, কৌশল এবং রাজনৈতিক অবস্থান সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শাসক ও বিরোধী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনার জন্য সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও সামাজিক মাধ্যমের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা আন্দোলনের বহুমাত্রিক রূপ তুলে ধরতে সাহায্য করেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন—এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে এসএসসি ও টেট কেলেঙ্কারি ঘিরে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি, প্রতিবাদী কার্যক্রম ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল যেমন ধর্মতলা, বিকাশ ভবন ও প্রেস ক্লাব পরিদর্শন করে আন্দোলনকারীদের কার্যক্রম, স্লোগান, পোস্টার ও ব্যানারের ভাষা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ছাত্রদের প্রতিবাদী কৌশল, পুলিশের প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক সংগঠনের অবস্থান সরাসরি লক্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও সামাজিক মাধ্যমের তথ্য বিশ্লেষণ করে আন্দোলনের প্রচার কৌশল ও প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা ছাত্র আন্দোলনের বহুমাত্রিক রূপ বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

সন্দেশখালির ঘটনায় ছাত্র সংগঠনের প্রতিক্রিয়া—পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ কর্মসূচি, স্লোগান, পোস্টার ও বিক্ষোভের ধরন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আন্দোলনের স্থান পরিদর্শন করে ছাত্রদের সক্রিয়তা, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য এবং বিরোধী ও শাসকপন্থী সংগঠনগুলোর অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবাদ কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলোর কৌশলগত পরিবর্তন, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসঙ্গ কীভাবে ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। আন্দোলনের ভাষা, প্রতিবাদের ধরন এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অবস্থান বিশ্লেষণ করে গবেষণার ফলাফলকে আরও বাস্তবসম্মত ও প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু আন্দোলনস্থলে প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা থাকায় সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যেখানে প্রশাসনের কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল। এছাড়া, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে আন্দোলনকারীরা তাঁদের বক্তব্য অনেক সময় অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করেছে। গবেষণার আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলোর গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতা। অনেকে তাঁদের সংগঠনের কৌশলগত সিদ্ধান্ত বা অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যা সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি, সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং সামাজিক মাধ্যমের ওপর নির্ভর করতে হলেও, এসব উৎসের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে, কারণ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। এছাড়া, আন্দোলনের প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তনশীল হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়নি, ফলে কিছু তথ্যের ঘাটতি রয়ে গেছে। এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির পাশাপাশি সাক্ষাৎকার ও তথ্য-নথি বিশ্লেষণের মতো অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে, যাতে গবেষণার ফলাফল আরও নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ হয়।

নৈতিক বিবেচনা

গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যায় নৈতিক বিবেচনার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা এবং অংশগ্রহণকারীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সন্মতি, তথ্যের সঠিক ব্যবহার এবং গবেষণার সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করা আবশ্যক। গবেষণার নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণকারীদের সন্মতি, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা, পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখা এবং গবেষণা থেকে কোনো পক্ষের ক্ষতি না হওয়া নিশ্চিত করা। এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক ও পণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা উপস্থাপন করেছেন। বেলমন্ট রিপোর্ট, ১৯৭৯[28] গবেষণার নৈতিকতা নির্ধারণে তিনটি প্রধান নীতি নির্ধারণ করে - সুবিচার, কল্যাণবোধ এবং

[28]ন্যাশনাল কমিশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব হিউম্যান সাবজেক্টস অব বায়োমেডিক্যাল অ্যান্ড বিহেভিয়োরাল রিসার্চ (১৯৭৯)-এর দ্যা বেলমন্ট রিপোর্ট: গবেষণায় মানব বিষয়ের সুরক্ষার জন্য নৈতিক নীতিমালা ও নির্দেশিকা। ওয়াশিংটন, ডি.সি.: ইউ.এস. গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস।

শ্রদ্ধাবোধ। ইমানুয়েল গবেষণার নৈতিকতার ছয়টি মূল উপাদান চিহ্নিত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য, বৈজ্ঞানিক যথার্থতা, অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি, ঝুঁকি ও সুবিধার ভারসাম্য, ন্যায্যতা এবং গবেষণার স্বচ্ছতা (ইমানুয়েল ২০০০:২৮৩)। ডেভিড রেসনিক তাঁর গবেষণার নৈতিক চর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, গবেষণার মাধ্যমে যদি কোনো পক্ষের ক্ষতি হয় বা তথ্যের অপব্যবহার ঘটে, তাহলে সেটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না এবং গবেষণার নৈতিক ভিত্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয় (ডেভিড রেসনিক, ১৯৯৮)।এই নৈতিক বিবেচনাগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যখন গবেষণা রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে পরিচালিত হয়। গবেষককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হয় যে, পর্যবেক্ষণ বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত এবং বিশ্লেষিত হচ্ছে, যাতে কারও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষতি না হয়। সুতরাং, গবেষণার প্রতিটি ধাপে নৈতিক বিবেচনাগুলো অনুসরণ করা গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যায় নৈতিক বিবেচনার গুরুত্ব অপরিসীম, বিশেষত যখন গবেষণা মানুষের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে বা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

একজন গবেষকের নৈতিক দায়িত্ব হলো অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা এবং তাদের অধিকার, গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গবেষণার শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের সচেতন সম্মতি নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা বুঝতে পারেন যে গবেষণায় তাদের ভূমিকা কী এবং তথ্য কীভাবে ব্যবহৃত হবে। গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষার বিষয়টি গবেষণার নৈতিকতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গবেষকের দায়িত্ব হলো অংশগ্রহণকারীদের তথ্য সংরক্ষণ করা এবং তা তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ না করা, যদি না অংশগ্রহণকারীরা স্বেচ্ছায় অনুমতি দেন। গবেষণার মাধ্যমে কারও শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক ক্ষতি যেন না হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হয়। গবেষণার প্রশ্নবিদ্ধতা এড়াতে সত্যনিষ্ঠতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি, যাতে তথ্য বিকৃতি বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ না থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণা পরিচালনার আগে নৈতিক অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, বিশেষত যদি গবেষণার বিষয়বস্তু সংবেদনশীল হয় বা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দিক, কারণ গবেষণার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি যেন অংশগ্রহণকারীদের সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়, তা গবেষকের নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে

নৈতিকতা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি গবেষণার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে এবং গবেষণার ফলাফল যেন সামাজিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখে। এই গবেষণায় নৈতিক বিবেচনার গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নৈতিকতার কঠোর অনুসরণ করা হয়েছে। যেহেতু গবেষণাটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ছাত্র আন্দোলনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে, তাই অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন এবং স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছেন। গবেষণার সময় তাদের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে এবং তথ্য ব্যবহারের শর্তাবলী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা কোনো ঝুঁকির মুখে না পড়েন।

তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও নৈতিকতা বজায় রাখা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং সত্যনিষ্ঠ উপস্থাপন নিশ্চিত করা হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তথ্য বিকৃতি বা অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, বরং যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশ্লেষণে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে হেয় করা হয়নি বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো পক্ষের সমর্থনে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। গবেষক নিজে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে গবেষণার বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক মান অক্ষুণ্ণ থাকে। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংবেদনশীলতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু এবং ব্যবহৃত ভাষা এমনভাবে গঠিত হয়েছে, যাতে এটি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, সংগঠন বা ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি না করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত জটিল, তাই গবেষণার উপস্থাপনা পদ্ধতিতে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে, যাতে গবেষণা কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে না দেয় এবং এটি মূলত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দিক। যেহেতু গবেষণার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত দিয়েছেন, তাই তাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে তা কোনোভাবেই তাদের জন্য ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা তৈরি না করে। গবেষণার প্রকাশনার সময়ও এই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে, যাতে সংবেদনশীল তথ্যের ব্যবহার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। গবেষণার উপস্থাপনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল যেন অতিরঞ্জিত না হয় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যাখ্যা করা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং এটি যেন বিভ্রান্তি বা উসকানিমূলক ব্যাখ্যার জন্ম না দেয়, তা নিশ্চিত করা হয়েছে। গবেষণাটি সম্পূর্ণরূপে একাডেমিক মান বজায় রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং গবেষকের ব্যক্তিগত মতামত বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এতে কোনো প্রভাব ফেলেনি।

সরকারি ও একাডেমিক নীতিমালার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা নৈতিক অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নৈতিক নীতিমালার মধ্যে থেকেই তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণায় নৈতিকতার প্রতিটি দিক গভীরভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, যাতে এটি একাডেমিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার একটি নির্ভরযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। এই গবেষণায় পদ্ধতিবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনায় নৈতিক বিবেচনার গুরুত্ব ও প্রয়োগ স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার প্রতিটি পর্যায়ে নৈতিকতার বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে গবেষণার স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকে। অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা বজায় রাখা, এবং গবেষণার সত্যনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখা এই অধ্যায়ের মূল দৃষ্টিকোণ ছিল।

নৈতিক সংকট ও তার প্রভাব

নৈতিক সংকট এমন এক পরিস্থিতি যেখানে গবেষণার নৈতিক মূল্যবোধ ও বাস্তব চাহিদার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, যা গবেষককে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। গবেষণার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রকট হয় যখন অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা জরুরি হলেও গবেষণার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কিছু তথ্য প্রকাশ করতে হয়। আবার, গবেষক নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেও ব্যক্তিগত মতাদর্শ বা রাজনৈতিক প্রভাব অনেক সময় বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হতে পারে, যা গবেষণার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। একইভাবে, গবেষণার কিছু ফলাফল সমাজের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, যা গবেষককে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে বাধ্য করে। তাই নৈতিক সংকট সমাধানে গবেষকের সতর্কতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও

তথ্য সুরক্ষার নীতি মেনে চলা জরুরি, যাতে গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে। আমার গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক ও ছাত্র আন্দোলনের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সময় নৈতিক সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। এই অধ্যায়ে আমি গবেষণায় নৈতিকতার চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবিলার কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করেছি।

- তথ্য সংগ্রহ ও অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা - গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা এক বিশেষ নৈতিক চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের পরিচয় প্রকাশ পেলে তা ভবিষ্যতে তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ফলে তথ্য গোপন রাখা, ছদ্মনাম ব্যবহার করা, এবং সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়ে আমাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তথ্য বিকৃতির ঝুঁকি - গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্য যথাযথভাবে উপস্থাপন করা নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা পক্ষপাত গবেষকের তথ্য বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করতে পারে, যা গবেষণার নিরপেক্ষতা নষ্ট করতে পারে। তাই আমি ব্যক্তিগত পক্ষপাত এড়ানো এবং তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।
- রাজনৈতিক প্রভাব ও আমার ভূমিকা - গবেষণার বিষয়বস্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে হওয়ায় আমার ওপর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভাব পড়তে পারে। আমি যদি কোনো রাজনৈতিক পক্ষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হতাম, তবে গবেষণার নিরপেক্ষতা হারানোর সম্ভাবনা থাকত। এক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছি।
- গবেষণার ফলাফল ও তার সামাজিক প্রভাব - গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পর তা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তা আমার জন্য একটি নৈতিক চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে, যদি গবেষণার ফলাফল কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে আমাকে সতর্ক থাকতে হয়েছে। তাই গবেষণার তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমি সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রেখেছি।
- তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি ও অধিকার - গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি নেওয়া নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অংশগ্রহণকারীরা যদি স্বেচ্ছায় তথ্য প্রদান না করেন, তবে সেই তথ্য

ব্যবহার করা গবেষণার নৈতিকতার পরিপন্থী হতে পারে। তাই আমি নিশ্চিত করেছি যে অংশগ্রহণকারীরা স্বেচ্ছায় ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নিয়ে গবেষণায় অংশ নিয়েছেন এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

- গবেষণা পদ্ধতির স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা - গবেষণা পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। যদি গবেষণা পদ্ধতি যথাযথভাবে পরিকল্পিত না হয় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্দিষ্ট ফলাফলের দিকে পরিচালিত হয়, তবে তা গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করতে পারে। তাই পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

গবেষণার নৈতিক সংকট মোকাবিলায় আমার সতর্কতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং তথ্য সুরক্ষা কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা করার সময় তথ্যের যথাযথ ব্যবহার, অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা এবং গবেষণার নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অপরিহার্য ছিল। নৈতিকতার এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করেই গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

এই পদ্ধতিগত কাঠামোর ভিত্তিতেই গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন—বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব এবং আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম : রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ছাত্র আন্দোলন

> "Students have always been at the forefront of social and political movements, acting as a catalyst for change. Their ability to mobilize, challenge authority, and demand justice has made them a formidable force in shaping democratic and revolutionary struggles across the world." — *Philip G. Altbach, Student Politics in Comparative Perspective (1989)*

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতার পর, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং উন্নতির জন্য সরকার শিল্পায়নকে একটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকারের অধীনে শিল্পায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যেখানে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মতো কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। এই শিল্পায়ন পরিকল্পনার প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই গভীর ছিল এবং বিভিন্ন সমাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের কৃষিপ্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত, তবে স্বাধীনতার পর থেকে এই দুটি অঞ্চলে শিল্পায়ন নিয়ে বেশ কিছু পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করার সিদ্ধান্ত সরকারের কয়েকটি উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ২০০৬-২০০৮ সালের এই ঘটনাগুলি শুধু কৃষিজমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলনই ছিল না, বরং তা রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে, এই দুই আন্দোলন তখনকার বামফ্রন্ট

সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জনরোষের প্রতিফলন ঘটায় এবং পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনের নামে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন এবং নন্দীগ্রামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এবার থেকে SEZ বলবো) গঠনের পরিকল্পনা সাধারণ মানুষ, বিশেষত কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ এবং স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধের মধ্যে যে সংঘাত তৈরি হয়, তা কেবল কৃষকদের নয়, বরং ছাত্রসমাজসহ বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদেরও আন্দোলনের অংশীদার করে তোলে। তৎকালীন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির একাংশ সরকারপক্ষকে সমর্থন করলেও, বিরোধী রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলি এবং বিভিন্ন বাম-গণতান্ত্রিক সংগঠন এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়। ফলে, এই আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক নতুন মোড় তৈরি করে, যেখানে শাসক ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা ও গণ আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে একটি স্পষ্ট দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন কেবলমাত্র কৃষকদের অধিকার রক্ষার লড়াই ছিল না; এটি একদিকে রাজ্যের শিল্পায়ন বনাম কৃষির দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে ক্ষমতার রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের সক্রিয় ভূমিকার প্রশ্নকে সামনে এনেছে। ছাত্র আন্দোলন এই সময়ে কেবল রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেই থেমে থাকেনি, বরং তারা মিছিল, অবস্থান, প্রতিবাদ এবং সরাসরি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নিজেদের সক্রিয়তা প্রকাশ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির অভিমুখ কীরূপে নির্ধারিত করল, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এই অধ্যায়ে আমি সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো। এবং এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করবো ছাত্র সংগঠনগুলির ভুমিকাকে মাথায় রেখে। আমি এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ গুলি করবো – প্রথমে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারনে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচনা করবো। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের ভুমিকা যেমন – কৃষক, মজুর, মহিলা এবং স্থানীয় জনগণের চিন্তা ও মতামত কেমন ছিল ইত্যাদি বলবো। তার পরের অংশে আমি আলোচনা করবো যে পার্টি সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ, নীতি নিয়ে। এবং এর মাধ্যমে কিভাবে সরকার এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের ভুমিকা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভুমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করবো। এই আলোচনা করার পর এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এর পর

আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানা ভুমিকা পালন করেছিল। এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারণা প্রদান করেছে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করবো।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম : ভৌগোলিক পরিচিতি

সিঙ্গুর, হুগলি জেলার একটি গ্রাম, কলকাতা শহরের কাছাকাছি অবস্থিত। এটি নদীপ্রবাহ ও সমৃদ্ধ কৃষিজমির জন্য পরিচিত। এখানে মূলত ধান, সবজি, এবং বিভিন্ন শস্য চাষ করা হয়। সিঙ্গুরের জমি, বিশেষত টিঙ্কোরা নদী ও অন্যান্য খালের কাছাকাছি, অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষিকাজের জন্য উপযোগী।[29] তবে এই এলাকা শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার কারণে একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যা এখানকার কৃষকদের জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। এখানকার কৃষকরা ধান, আলু, গম, তেল, এবং শাকসবজি চাষ করতেন। তবে, জমি অধিগ্রহণের ফলে সিঙ্গুরে শিল্পায়নের উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সিঙ্গুরের কৃষিজমি নির্বাচনের পেছনে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ভৌগলিক অবস্থান। সিঙ্গুর হুগলি নদীর কাছাকাছি, এবং কলকাতা শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ছিল। নদী ও সড়ক যোগাযোগের সুবিধা কৃষি উৎপাদিত পণ্য বা কাঁচামাল পরিবহণের জন্য উপযুক্ত ছিল। এমনকি, সিঙ্গুরে যাত্রী ও মাল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নত অবস্থার কারণে এখানকার শিল্প স্থাপন অত্যন্ত সুবিধাজনক মনে করা হয়েছিল। ২০০৬ সালে টাটা গ্রুপ ন্যানো গাড়ি তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়, যা কৃষকদের মধ্যে বিরাট ক্ষোভ সৃষ্টি করে। কৃষকদের জমি হারানোর ঝুঁকি ও তাদের জীবনযাত্রায় অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। যেখানে ধান, পাট, সবজি ও অন্যান্য ফসল চাষ হতো। ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী নন্দীগ্রাম সমৃদ্ধ কৃষিজমি এবং জলাশয় দ্বারা গঠিত। এখানকার কৃষকরা প্রাচীনকাল থেকেই চাষাবাদ করে জীবন ধারণ করতেন। নন্দীগ্রামের মাটিও অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। নন্দীগ্রামেও কৃষি প্রধান অর্থনীতি ছিল। নন্দীগ্রামও একই কারণে নির্বাচিত

[29] সিঙ্গুর অঞ্চলের একটি ছোট নদী বা খাল, যা স্থানীয় কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সিঙ্গুরের জমি দামোদর নদীর অববাহিকায় অবস্থিত, যেখানে বিভিন্ন ছোট নদী ও খাল জলসেচের প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হয়েছিল, যদিও এখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অনেকটা আলাদা ছিল। একই সাথে, নন্দীগ্রামে জমির প্রাপ্যতা এবং খরচ কম থাকার কারণেও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সহজ ছিল। এই অঞ্চলগুলির জমির মূল্য অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের তুলনায় অনেক কম ছিল, এবং কৃষকদের জন্য জমি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে প্রশাসন তুলনামূলকভাবে সহজ মনে করেছিল। এই অঞ্চলের কৃষকরা অনেকটা জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল থাকলেও, সরকারের ধারণা ছিল যে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক হবে। তবে এখানে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন সরকার কিছু জমি তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, বিশেষ করে শিল্প স্থাপনের জন্য। এখানকার কৃষকরা তাদের জমির ওপর আস্থাশীল ছিল এবং সেই জমির অধিকার বজায় রাখার জন্য তারা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের [30] পটভূমি, আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, যা শুধু কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনকে নয়, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক গতিশীলতাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে এবং ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামেশিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষিজমি অধিগ্রহণের সরকারি পরিকল্পনা তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে। স্থানীয় কৃষকদের জীবিকা, জমির মালিকানা এবং রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুই আন্দোলনের মূল প্রেক্ষাপট হয়ে ওঠে। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার বিরোধিতা এবং নন্দীগ্রামেSEZ গঠনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।[31] কৃষিজীবী, নাগরিক সমাজ, ছাত্র সংগঠন এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনগুলিকে আরও প্রভাবশালী করে তোলে। বিশেষত, এই আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা স্পষ্ট হয়, যারা শুধুমাত্র আন্দোলনের

[30] আমার লেখার মধ্যে কখনও সিঙ্গুর ও নন্দিগ্রামকে একসাথে লিখবো কখনও আলাদা আলোচনা করবো। লেখার সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনায় আমি আমার মত ব্যবহার করে লিখবো।

[31] নন্দীগ্রামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিতর্কিত শিল্পায়ন প্রকল্প। ২০০৬ সালে, সলিম গ্রুপ নামে একটি ইন্দোনেশিয়ান সংস্থার বিনিয়োগে হাইটেক কেমিক্যাল হাব স্থাপনের জন্য নন্দীগ্রামের প্রায় ১০,০০০ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। এই প্রকল্পটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প নীতির অংশ, যেখানে SEZ-এর মাধ্যমে শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানোর লক্ষ্য ছিল।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণই করেনি, বরং আন্দোলনের কৌশল ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই অংশে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি, আন্দোলনের কারণ এবং এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হবে।

সিঙ্গুরের পটভূমি

সিঙ্গুরের কৃষকদের সাথে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বন্দ্ব শুরু হয় ২০০৬ সালের শেষের দিকে, যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাটা মোটরসের ন্যানো কারখানা নির্মাণের জন্য প্রায় ১,০০০ একর উর্বর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। সরকার বাসিন্দাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলেও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব এবং অনুভূত অবিচার স্থানীয় কৃষকদের বিক্ষোভের সূত্রপাত করে। সমাজকর্মী, বিরোধী দলের সদস্য এবং বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনে এই কৃষকরা সরকারকে প্রকল্পটি এগিয়ে নিতে বাধা দেওয়ার জন্য অবস্থান ধর্মঘট, সমাবেশ এবং অবরোধ সংগঠিত করতে শুরু করে। প্রাথমিক মাসগুলিতে, প্রতিবাদগুলি মূলত শান্তিপূর্ণ ছিল, গ্রামবাসীরা তাদের বিরোধিতা প্রকাশের জন্য অহিংস বিক্ষোভে জড়িত ছিল। তবে, ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় যখন নির্মাণের জন্য অঞ্চলটি সুরক্ষিত করার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সহিংসতার প্রথম বড় ঘটনাটি ঘটে যখন পুলিশ প্রস্তাবিত স্থানে প্রবেশের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, জলকামান এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে। সংঘর্ষে বয়স্ক ব্যক্তি ও মহিলা সহ অনেক কৃষক আহত হন এবং সংঘর্ষের চিত্রগুলি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।[32] সিঙ্গুরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয় জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যারা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে তাদের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে দেখেছিল। কৃষক ও বয়স্কদের ওপর শারীরিক নির্যাতনসহ পুলিশ যে কঠোর কৌশল অবলম্বন করেছে, তা রাষ্ট্রের বৈধতাকে আরও খর্ব করেছে। বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) এই ঘটনাগুলিকে পুঁজি করে বামফ্রন্ট সরকারকে স্বৈরাচারী এবং গ্রামীণ উদ্বেগের প্রতি অসংবেদনশীল হিসাবে চিত্রিত করেছে। এই আখ্যানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে যখন মিডিয়ায় পুলিশি বর্বরতার প্রতিবেদনগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে শুরু করে, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি স্পষ্ট চিত্র চিত্রিত হয় (দ্য টেলিগ্রাফ ২ নভেম্বর ২০০৭)।

---

[32] সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ ও কৃষক প্রতিরোধ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, ব্যানার্জী, পি. (২০০৬) 41 (46), 4718-4720। এই প্রবন্ধে সিঙ্গুরে প্রতিরোধের সামাজিক-রাজনৈতিক মাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নন্দীগ্রামের পটভূমি

২০০৭ সালের গোড়ার দিকে প্রস্তাবিত পেট্রোকেমিক্যাল বিশেষ এসইজেড ঘোষণার সাথে নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি আরও বড় আকারে উন্মোচিত হয়েছিল, যা ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি করেছিল। এসইজেডের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনায় হাজার হাজার গ্রামবাসীকে তাদের কৃষিজমি খালি করতে হয়েছিল, যার ফলে সরকারের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি (এবার থেকে BUPC বলবো) গঠন করা হয়েছিল।[33] স্থানীয় গ্রামবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন দ্বারা সমর্থিত বিইউপিসি দ্রুত নিয়মিত মিছিল, সমাবেশ এবং অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করে আন্দোলনের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়।[34] ২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে প্রথম বড় ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে, যখন আসন্ন জমি অধিগ্রহণের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা রাজ্য প্রশাসনকে এই অঞ্চল থেকে দূরে রাখার জন্য প্রবেশের রাস্তাগুলি অবরুদ্ধ করে ব্যারিকেড এবং পরিখা তৈরি করেছিল। এই ব্যারিকেডগুলি ভেঙে ফেলার জন্য পুলিশ প্রচেষ্টা একটি সহিংস সংঘর্ষের দিকে পরিচালিত করে, উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এই প্রাথমিক সংঘর্ষ আরও সহিংসতার মঞ্চ তৈরি করেছিল, কারণ গ্রামবাসী এবং সরকার উভয়ই দীর্ঘায়িত অচলাবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল (দ্য টেলিগ্রাফ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬)। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে পুলিশ বড় আকারের অভিযান শুরু করলে সহিংসতা চরমে পৌঁছায়। শত শত সশস্ত্র কর্মকর্তা জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে জড়ো হওয়া নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে এলাকায় প্রবেশ করে। পরবর্তী বিশৃঙ্খলার মধ্যে, পুলিশ জনতার উপর গুলি চালিয়েছিল বলে জানা গেছে, এতে কমপক্ষে ১৪ জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে। ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যাদের আত্মরক্ষার কোনও উপায় ছিল না। এই অভিযানের নৃশংস প্রকৃতি জাতিকে হতবাক করে দিয়েছিল, শোকাহত পরিবার এবং রক্তাক্ত বিক্ষোভকারীদের ছবি শিরোনামে প্রাধান্য পেয়েছিল।

---

[33] ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি (BUPC - Bhumi Ucched Pratirodh Committee) হল ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে গঠিত একটি আন্দোলনকারী সংগঠন, যা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল)SEZ) প্রতিষ্ঠার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে। এটি স্থানীয় কৃষক, গ্রামবাসী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[34] নন্দীগ্রামে পিপলস ট্রাইব্যুনাল। নন্দীগ্রাম: আসলে কী ঘটেছিল? দানিশ বুকস। সংঘর্ষ এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন।

এই ঘটনাটি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের একটি নির্ধারিত মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল, যা ভারতজুড়ে সমর্থন জাগিয়ে তোলে এবং সরকারের পদক্ষেপের ব্যাপক নিন্দা আকর্ষণ করে (দ্য স্টেটসম্যান ৩১ অক্টোবর ২০০৭)। ১৪ মার্চের গণহত্যা দিয়েও সহিংসতা শেষ হয়নি। ২০০৭ সালের অক্টোবরে, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) (এবার থেকে CPIM বলবো) ক্যাডাররা বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে নন্দীগ্রাম পুনরুদ্ধারের জন্য সমন্বিত আক্রমণ শুরু করলে সংঘর্ষ তীব্র হয়। সশস্ত্র দলগুলি গ্রামবাসীদের তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করতে বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, যার ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও বাস্তুচ্যুতি ঘটে। ৩১ অক্টোবর নন্দীগ্রাম-খেজুরি সীমান্তে গুলি বিনিময়ের খবর আসে, এরপরই CPIM সমর্থকরা গ্রামে হামলা চালায়। CPIM নেতা লক্ষ্মণ শেঠের উস্কানিমূলক বক্তব্যে দলীয় সদস্যদের 'হত্যা অথবা হত্যা করার' আহ্বান জানানো হয়েছে।[35] এসব হামলার পরবর্তী পরিণতি ছিল ভয়াবহ। গ্রামগুলো ছাই হয়ে গিয়েছিল, পরিবারগুলো গৃহহীন হয়ে পড়েছিল এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা যে নিষ্ঠুরতা সহ্য করেছিল তাতে তারা মানসিক আঘাত পেয়েছিল। নারী ও শিশুরা সহিংসতার শিকার হয়েছে, হামলার পরের সপ্তাহগুলোতে যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক নির্যাতনের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ঘটনা বিক্ষোভকারীদের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক নিপীড়নের ভয়াবহতা তুলে ধরে এবং নিপীড়নমূলক উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে নন্দীগ্রামের স্থান সুদৃঢ় করে।[36]

সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। এই আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা শুধু আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে নয়, বরং এই আন্দোলনের একটি বিশাল অংশ হিসেবে নিজেদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করেছিল। ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই আন্দোলনটি কেবল কৃষক আন্দোলন হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে, ছাত্র সমাজ প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ছাত্ররা শুধু

---

35 নন্দীগ্রামে পিপলস ট্রাইব্যুনাল। নন্দীগ্রাম: আসলে কী ঘটেছিল? অক্টোবর 2007 সংঘর্ষ এবং তাদের পরিণতি উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

36 সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ ও কৃষক প্রতিরোধ। এই গবেষণায় ভূমি অধিগ্রহণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। ব্যানার্জী, পি. (২০০৬)।

মৌখিকভাবে সমর্থন জানায়নি, বরং তারা বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে। ছাত্ররা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচনা, সভা, এবং কর্মশালা আয়োজন করে, যাতে সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা জমির অধিকার এবং সরকারের শিল্পায়ন পরিকল্পনার সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। ছাত্র সমাজ আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করে এবং একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করতে থাকে। তারা বিক্ষোভ মিছিল, সেমিনার, পেটিশন সংগ্রহ এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রদের নেতৃত্বে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন যেমন—

'অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' (এবার থেকে AISA লিখবো) বিরধিতা করে, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদ' (এবার থেকে TMCP লিখবো) সারা বাংলার শিক্ষাঙ্গনে এর প্রতিবাদ শুরু করে ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে, 'স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া' (এবার থেকে SFI লিখবো) জমির অধিগ্রহনের পক্ষে প্রচার করে এবং বাকি বিভিন্ন বাম স্থানীয় ছাত্র সংগঠনগুলি প্রতিবাদ কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক সমাবেশগুলোর আয়োজন করে, যাতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্ররা এই আন্দোলনকে কেবল কৃষকদের জমির অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন হিসেবে দেখেনি, তারা এটিকে একটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। ছাত্ররা মনে করেছিল যে, জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সরকার একটি বৃহত্তর জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করছে, এবং এটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী।[37] ছাত্রদের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপগুলি রাষ্ট্রীয় শোষণ এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রতি অবিচারের পরিচায়ক। আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে ছাত্ররা আন্দোলনকে শুধু একটি গ্রামীণ কৃষক সংগ্রাম হিসেবে না দেখে, এটি একটি বৃহত্তর শ্রেণীগত ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম হিসেবে তুলে ধরেছিল।

[37] 'গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী' বলতে এমন কোনো নীতি, সিদ্ধান্ত, কর্মকাণ্ড বা ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যা গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলোর বিরুদ্ধে যায়। গণতন্ত্র মূলত জনমত, স্বচ্ছতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কারণ সমূহ

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন আধুনিক ভারতে তৃণমূল স্তরের প্রতিরোধের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই আন্দোলনগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সামাজিক প্রভাবের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, যেখানে শিল্প উন্নয়নের স্বার্থকে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অধিকার, আবেগ এবং সার্বিক কল্যাণের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষক আন্দোলনের মূল কারণ ছিল জমির অধিকার এবং স্থানীয় জনগণের উদ্বেগ। এসব এলাকায় কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের জমিতে কৃষিকাজ করে আসছিলেন, এবং তাদের জমি ছিল শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অঙ্গ। জমি হারানো মানে ছিল তাদের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক অবদান এবং প্রজন্মান্তরের শ্রমের ক্ষতি। এই জমি অধিগ্রহণের বিপরীতে কৃষকরা তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় রক্ষার জন্য আন্দোলনে অংশ নেন। বিশেষ করে, সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং নন্দীগ্রামে সরকারের জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা কৃষকদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ তৈরি করে। জমি অধিগ্রহণের ফলে তাদের জীবিকা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল, কারণ কৃষি ছিল তাদের একমাত্র পেশা। যে জমিতে তারা দীর্ঘকাল ধরে কৃষিকাজ করতেন, তা তাদের অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। জমির অধিকার হারানো মানে ছিল তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সংকট। এছাড়া, জমি অধিগ্রহণের পর কৃষকদের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছিল না, যা তাদের উদ্বেগের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তোলে। সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা কৃষকদের দাবির তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল। তাদের অভিযোগ ছিল যে, অধিগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জমির প্রকৃত মূল্য বা ক্ষতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ তারা পাচ্ছিলেন না। অনেক কৃষক তাদের জমি ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না, কারণ তারা জানতেন না, এই জমি হারানোর পর তাদের জীবিকা কীভাবে চলবে। কারণ তাদের কাছে এটি কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষতি ছিল না তার চেয়েও বেশি কিছু ছিল, জমি ছিল তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক।

গ্রামীণ সমাজে জমি মালিকানা একটি গৌরবের বিষয় ছিল, এবং জমির অধিগ্রহণ কৃষকদের জন্য এক ধরনের সামাজিক সংকট ছিল। তারা তাদের জমি হারিয়ে শুধু অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, বরং তাদের সামাজিক অবস্থানও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এই কারণে, কৃষকরা সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন এবং আন্দোলনে যোগ দেন। সুতরাং, সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূল

কারণ ছিল জমির অধিকার, জীবিকার নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা। কৃষকরা বিশ্বাস করতেন যে, জমির অধিগ্রহণ তাদের জীবনের মৌলিক অধিকার ও ঐতিহ্যকে সংকটাপন্ন করে তুলবে। এই কারণে তারা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন, যা একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। সিঙ্গুরে অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত জমিটি রাজ্যের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলির মধ্যে ছিল। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন খাল, দুটি গভীর নলকূপ এবং ২৭ টি স্বল্প-গভীর নলকূপ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সেচ দিয়ে ধান, আলু, পাট এবং শাকসব্জী চাষ করা হত। আলুর মতো ফসলের ফলনের হার রাজ্যের গড় ছাড়িয়ে গেছে, যা এই জমির অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে তুলে ধরে। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা, যারা স্থানীয় জনসংখ্যার ৫০% এরও বেশি ছিল, তারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য এই জমির উপর নির্ভর করেছিল। উপরন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বর্গাচাষি (বর্গাদার) এবং ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, যাদের মধ্যে অনেকেই তফসিলি জাতি (এসসি) ছিলেন, সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই গোষ্ঠীগুলিকে ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যা তাদের দুর্বলতা আরও তীব্র করেছিল।[38] সিঙ্গুরের আন্দোলন রাজ্যের ভূমি নীতির পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলি প্রকাশ করেছিল। অপারেশন বার্গা ভূমি সংস্কার কর্মসূচির ত্রুটির কারণে অনেক ভাড়াটে কৃষক নিবন্ধিত হননি, তাদের আইনী স্বীকৃতি বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া থেকে এই স্টেকহোল্ডারদের বাদ দেওয়া সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত বৈষম্যকে তুলে ধরে, যা বৃহত্তর অসন্তোষকে বাড়িয়ে তোলে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ মে, ২০০৬)।

নন্দীগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার সেলিম গ্রুপের সহযোগিতায় সরকারের পেট্রোকেমিক্যাল SEZ তৈরির পরিকল্পনা ব্যাপক প্রতিরোধের জন্ম দেয়। সিঙ্গুরের মতো নয়, যেখানে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ছিল, নন্দীগ্রাম প্রকল্পটি গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা ছিল। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শের অভাব বাস্তুচ্যুতি এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।[39] নন্দীগ্রামের গ্রামবাসীরা BUPC গঠন করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, যা দ্রুত প্রতিরোধ সংগঠিত করার কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে ওঠে। কমিটি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং

[38] স্ট্যাটিস্টিকাল হ্যান্ডবুক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২০০৪। ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই উৎসটি পশ্চিমবঙ্গে ফসলের উৎপাদনশীলতা এবং জমির ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে।

[39] নন্দীগ্রামের অর্থ। নন্দীগ্রাম প্রকল্পকে ঘিরে গোপনীয়তা এবং সম্প্রদায়ের বিরোধিতা উস্কে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।সরকার, টি., এবং চৌধুরী, এস. (২০০৯)।

অর্থনৈতিক লাইন জুড়ে সমর্থন সমাবেশ করে, প্রকল্পের বিরোধিতায় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত করে। গ্রামবাসীরা ব্যারিকেড তৈরি করে, পরিখা খনন করে এবং সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশকে ওই এলাকায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য প্রবেশের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। নন্দীগ্রামের আন্দোলন তার তীব্রতা এবং সম্মিলিত সংকল্পের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল, কারণ পুরো সম্প্রদায় তাদের জমি রক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছিল। এই ভয়গুলি মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতা এবং জমি অধিগ্রহণ কার্যকর করার জন্য তার কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি জনগণকে আরও বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। রাজ্য স্থানীয় কল্যাণের চেয়ে কর্পোরেট স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এই ধারণাটি প্রতিরোধকে জাগিয়ে তোলে, নন্দীগ্রাম শিল্প দখলের বিরুদ্ধে গ্রামীণ অবাধ্যতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

বামফ্রন্ট সরকারের নীতির অধীনে জমি অধিগ্রহণের আগ্রাসী মাত্রা জনসাধারণের উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ২০০৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে সরকার কলকাতার নিকটবর্তী হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং হাওড়া সহ জেলাগুলিতে ৭০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই জমির বেশিরভাগই অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে ১২০,০০০ একর কৃষিজমি হারিয়েছে এবং এই সময়কালে ভূমিহীনতা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।[40] তৎকালীন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন এই অধিগ্রহণগুলিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বলে ন্যায়সঙ্গত করেছেন। কিন্তু ভূমি সংস্কার দফতরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা স্পষ্ট স্ববিরোধিতা প্রকাশ করায় সরকারের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হয়। এই আধিকারিকদের মতে, রাজ্যে ভূমিহীনতা ৭.৪ মিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে, যা গ্রামীণ জনসংখ্যার স্থানচ্যুতির প্রতিফলন। এই প্রকাশগুলি জনসাধারণের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং সরকারের শিল্পায়ন অভিযানের বিরোধিতা জোরদার করে (দ্য টেলিগ্রাফ, ২৮ জুন, ২০০৬)। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পটভূমি অর্থনৈতিক দুর্বলতা, জমির সাথে সাংস্কৃতিক সংযুক্তি এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার ছেদকে তুলে ধরে। বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন নীতিগুলি অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হলেও তারা গ্রামীণ প্রতিরোধের গভীরতাকে অবমূল্যায়ন করেছিল। ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলির জন্য, জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র তাদের জীবিকা রক্ষার জন্য ছিল না, বরং তাদের অধিকার দাবি করা এবং তাদের জীবনযাত্রাকে রক্ষা করার জন্যও ছিল। এই

[40] স্ট্যাটিস্টিকাল হ্যান্ডবুক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২০০৪। রাজ্যে কৃষিজমি ব্যবহার এবং ভূমিহীনতার প্রবণতা সম্পর্কে পরিসংখ্যানগত অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে।

আন্দোলনগুলি উন্নয়নের প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি বৃহত্তর সংঘর্ষের প্রতীক ছিল - একটি শহুরে-শিল্প অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং অন্যটি গ্রামীণ-কৃষি ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে নিহিত।প্রান্তিক কৃষক, মহিলা এবং রাজনৈতিক সত্তার নেতৃত্বে এই নীতিগুলির বিরোধিতা সমসাময়িক ভারতে গ্রামীণ প্রতিবাদের দুটি সবচেয়ে নির্ধারিত মুহূর্তের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

হুগলি জেলায় অবস্থিত সিঙ্গুরে ন্যানো গাড়ির কারখানা তৈরির জন্য সরকার টাটা মোটরসের জন্য প্রায় ১,০০০ একর উর্বর, বহু-ফসলি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে। প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকার দ্বারা একটি যুগান্তকারী সাফল্য হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল যা পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনবে। যাইহোক, শত শত পরিবারের জীবিকার জন্য অপরিহার্য উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ ব্যাপক বিরোধিতার সৃষ্টি করেছিল।[41] কৃষক এবং জমির মালিকরা, বিশেষত যাদের ছোট ছোট জমি রয়েছে, তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে জমি অধিগ্রহণ অন্যায় এবং তাদের সম্মতি ছাড়াই সেটা তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের জন্য, সরকার যে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিয়েছে তা তাঁদের জমির প্রকৃত মূল্যকে প্রতিফলিত করে না, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চাষ করা হয়েছে। তদুপরি, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ভাগচাষী এবং ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের বাদ দেয়, যারা তাদের জীবিকার জন্য কৃষিজমির উপর নির্ভরশীল ছিল (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। সিঙ্গুরে প্রতিরোধ ছোট ছোট সমাবেশ এবং প্রতিবাদের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, তবে শীঘ্রই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। কলকাতার রাজনৈতিক কর্মী, নাগরিক সমাজের গোষ্ঠী এবং বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনে স্থানীয় সম্প্রদায় সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট এবং সড়ক অবরোধের আয়োজন করে। তেভাগা ও চিপকো আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে বিশেষ করে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ মে ২০০৬)। এই অভিযোগগুলির সমাধান করতে সরকারের অক্ষমতা, তার সাথে ভিন্নমত দমনের জোরালো কৌশল কেবল ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশকেও বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। এটি অভিজাত এবং বর্জনীয় হিসাবে বিবেচিত শিল্পায়ন নীতিগুলির বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি করেছিল।

[41] নন্দীগ্রামে পিপলস ট্রাইব্যুনাল। নন্দীগ্রাম: আসলে কী ঘটেছিল? দানিশ বুকস। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ঘটনা ও ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত।

সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে যেখানে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ছিল, নন্দীগ্রাম এসইজেড প্রকল্পটি গোপনীয়তার চাদরে ঢাকা ছিল (দ্য টেলিগ্রাফ, ১৩ অক্টোবর, ২০০৬)। সরকারের কাছ থেকে যোগাযোগের অভাব, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের সাথে যুক্ত পরিবেশগত বিপদের গুজবের সাথে মিলিত হয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। গ্রামবাসীরা বাস্তুচ্যুত, জীবিকা হারানো এবং পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা করেছিল। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, তারা প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য BUPC গঠন করে (দ্য স্টেটসম্যান, ১৫ মার্চ, ২০০৭)। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি দ্রুত একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভাজন অতিক্রম করে মানুষকে একত্রিত করে। গ্রামবাসীরা ব্যারিকেড তৈরি করে, পরিখা খনন করে এবং সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশকে ওই এলাকায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য প্রবেশের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সিঙ্গুরের মতো নয়, যেখানে বিরোধীদের নেতৃত্বে ছিল মূলত কৃষকরা, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মহিলা, শিশু এবং প্রবীণরা সহ পুরো সম্প্রদায়কে তাদের জমি রক্ষার জন্য একত্রিত হতে দেখেছিল। এই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল কঠোর হস্তে। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে ব্যারিকেড খালি করার জন্য পুলিশি অভিযান একটি গণহত্যায় পরিণত হয়, নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়, কমপক্ষে ১৪ জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি আন্দোলনের জন্য একটি সমাবেশ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যা সরকারের কর্মকাণ্ডের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিন্দা আকর্ষণ করেছিল।[42]

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সরাসরি স্টেকহোলডারদের ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লড়াই ছিল না, এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক পরিবর্তনের মুহূর্ত হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেই জনগোষ্ঠীগুলো, যাদের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষভাবে হুমকির মুখে পড়েছিল, তারা বিশেষত কৃষক, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক এবং মহিলা। এরা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত নয়, বরং আন্দোলনের সক্রিয়

[42] স্ট্যাটিস্টিকাল হ্যান্ডবুক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২০০৪। ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ভূমি ব্যবহার এবং গ্রামীণ বাস্তুচ্যুতি উপর পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রদান করে।

সংগঠক ও প্রতিরোধের চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। এই ক্ষেত্রে আমি আলোচনা করবো এই সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামেজমি অধিগ্রহণের ঘটনায় কৃষক, মজুর, মহিলাদের চিন্তা ও ধারণা গুলি কেমন এবং কিভাবে প্রভাবিত করেছিল এই আন্দোলনকে।

আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়, যেখানে কৃষকেরাই প্রধান প্রতিরোধকারী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল কৃষিজমি অধিগ্রহণ, যা শিল্পায়নের নামে কৃষকদের জীবন-জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলছিল। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। শুধু জমির অধিকার রক্ষাই নয়, নিজেদের জীবন ও জীবিকার প্রশ্নেও তারা নির্ভীক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কৃষকদের প্রতিরোধ বিভিন্ন ধাপে সংগঠিত হয়—প্রথমে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, পরে জমির দখল বজায় রাখার জন্য ব্যারিকেড তৈরি, মিছিল ও অবস্থান ধর্মঘট এবং প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়ানো।

সিঙ্গুর

সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের ন্যানো কার প্রকল্পের জন্য প্রায় ৯৯৭ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করা হয়, যেখানে বহু কৃষক তাদের জমি দিতে অস্বীকার করেন। সরকার ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিলেও কৃষকদের বড় একটি অংশ তা গ্রহণ করতে রাজি হননি, কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে, জমি একবার হারালে তারা আর কখনো সেই জমি ফিরে পাবেন না এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে কৃষি ও জীবিকা পুনর্গঠন সম্ভব নয় (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। সিঙ্গুরের কৃষকরা প্রথম থেকেই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে শুরু করেন। প্রশাসনের কর্মকর্তারা যখন জমি চিহ্নিত করতে আসেন, তখন থেকেই কৃষকরা বাধা দিতে শুরু করেন। প্রথমদিকে তারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও মিছিলের মাধ্যমে নিজেদের দাবির কথা জানান। কিন্তু প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করা হলে কৃষকদের প্রতিরোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সিঙ্গুরের এক কৃষক নেতা, শংকর হালদার, তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, "*আমার দাদুর আমল থেকে আমরা এই জমিতে চাষ করছি। আমাদের পরিবার জমির ওপর নির্ভরশীল। সরকার আমাদের না*

জিজ্ঞাসা করেই জমি নিতে চাইলো। আমরা বাধ্য হলাম রুখে দাঁড়াতে"। সিঙ্গুরের কৃষকরা প্রশাসনের জমি দখলের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তারা লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ, মিছিল ও অনশনের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যান। মহিলারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নেন এবং জমি রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আন্দোলনকারীরা পুলিশি দমনপীড়নের মুখেও নিজেদের আন্দোলন জারি রাখেন এবং *"জমি নয়, কাজ চাই"* স্লোগানে তাদের দাবি তুলে ধরেন। তাদের এই প্রতিরোধ রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের সমর্থন লাভ করে, যার ফলে আন্দোলন আরও বৃহৎ আকার ধারণ করে (*বর্তমান*, ১৫ অক্টোবর ২০০৬)। সিঙ্গুরের কৃষক নেতা অমল মণ্ডল বলেন, *"আমরা সরকারকে বারবার বলেছিলাম, আমাদের জমি ছেড়ে দিন। আমরা চাষবাস করেই খুশি। কিন্তু সরকার বলল, এখানে ন্যানো কার কারখানা হবে। কৃষকের কথা কেউ শুনল না। বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম"।* শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে পুলিশ যখন কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ শুরু করে, তখনও কৃষকরা পিছিয়ে আসেননি। চাষের জমির ওপরই তাঁবু খাটিয়ে তারা টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যান।

নন্দীগ্রাম

নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি সিঙ্গুরের তুলনায় আরও ভয়াবহ ছিল। এখানে জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই স্থানীয় কৃষকরা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেন। তাঁরা প্রশাসনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন এবং রাস্তার ওপর বাঁশ ও গাছের গুঁড়ি ফেলে ব্যারিকেড তৈরি করেন। স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ তৈরি করা হয়, যারা প্রশাসনের গতিবিধি নজরদারি করত। এখানে ২০০৭ সালে SEZ গঠনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কৃষকরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। স্থানীয় কৃষকরা শাসক দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে *'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'* গঠন করেন এবং সরকারের জমি অধিগ্রহণ রুখতে সংগঠিত প্রতিরোধ শুরু করেন। তারা প্রশাসনের প্রবেশাধিকার রোধ করতে গ্রামে রাস্তায় ব্যারিকেড দেন, যা সরকার ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়। নন্দীগ্রামের এক প্রবীণ কৃষক, হরিদাস মাইতি, তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, *"পুলিশ যখন গ্রামে আসতে চেয়েছিল, আমরা গ্রামবাসী মিলে রাস্তা আটকালাম। পুলিশের বক্তব্য ছিল সরকার জমি নেবে জমি দিতেই হবে, আমরা বলেছিলাম এই জমি আমাদের মা-বাবার, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত। কিন্তু*

আজকের দিনে দাড়িয়ে আমাদের কোনও দিক দিয়েই ভাল হল না"। কৃষকদের প্রতিরোধ এতটাই সুসংগঠিত ছিল যে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রশাসন নন্দীগ্রামেপ্রবেশ করতে পারেনি। এই প্রতিরোধের ফলে পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের হামলায় বহু কৃষক হতাহত হন, যা আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলে (চ্যাটার্জি, ২০১২: ১১২)।

এই আন্দোলনে মহিলা কৃষক এবং বিশেষ করে কৃষক পরিবারের মহিলারা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা শুধুমাত্র মিছিল ও প্রতিবাদেই অংশ নেননি, বরং সামনের সারিতে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং পুলিশি দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। নন্দীগ্রামের এক মহিলা আন্দোলনকারী, কল্পনা দাস, বলেন, *"আমাদের ছেলেরা যখন পুলিশের লাঠির মারে, গুলিতে আহত হচ্ছিল, আমরা তখনো রাস্তায় বসে প্রতিবাদ করেছি। আমরা জানতাম, সরকার আমাদের ভয় দেখাতে চাইবে, কিন্তু আমরা ভয় পাইনি"।* এই আন্দোলনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, কৃষকরা তাদের নিজস্ব জীবনের স্বার্থে এবং জমির অধিকার রক্ষায় যে দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ দেখান, তা শুধু এই দুটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। নন্দীগ্রামের এক কৃষক, রমেশ জানা বলেন, *"আমরা শাসকের দলকে বিশ্বাস করিনি। ওরা বলেছিল আমাদের জমি চলে যাবে, কিন্তু আমাদের চাকরি দেবে। আমাদের বাবারা চাষবাস করে বড় হয়েছেন, চাকরি দিয়ে কী হবে? আমরা আমাদের মাটির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম"।* কৃষকরা প্রশাসনের প্রবেশ আটকাতে রাস্তায় বড় বড় গর্ত খুঁড়েছিলেন, যাতে পুলিশের গাড়ি ঢুকতে না পারে। স্থানীয় যুবকরাও রাত্রিবেলা পাহারা দিতেন। মহিলারা খাবার রান্না করে আন্দোলনকারীদের খাইয়ে দিতেন এবং নিজেরাও আন্দোলনের সরাসরি অংশ হয়ে উঠেছিলেন। নন্দীগ্রামের এক প্রবীণ কৃষক, হরিপদ মাইতি বলেন, *"আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, প্রশাসন আমাদের গ্রামে আসতে পারবে না। তারা যদি আমাদের জমি দখল করতে আসে, তাহলে আমরা লড়াই করব"।*

বিভিন্ন তথ্য এবং সাক্ষাৎকার দের বক্তব্য থেকে উপলব্ধি করেছি যে- সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষকদের প্রতিরোধ কেবল আত্মরক্ষার লড়াই ছিল না, এটি ছিল একটি সুসংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন, যা পরে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রভাব ফেলে। এই উপলব্ধি থেকে কিছু বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কৃষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ছিল—

- জমির দখল বজায় রাখা
- পুলিশের প্রবেশ রুখতে ব্যারিকেড তৈরি করা
- স্থানীয়ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা
- মিছিল, ধর্মঘট ও অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে নিজেদের দাবি জানানো
- রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা

অর্থাৎ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য বদলে দেয়। এই আন্দোলনের ফলে সরকারকে জমি অধিগ্রহণের নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হয় এবং তা ভবিষ্যতের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষকদের আন্দোলন শুধু জমি রক্ষার লড়াই ছিল না, এটি ছিল জীবন ও জীবিকার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যা পরবর্তীকালে রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে।

আন্দোলনে ভূমিহীন দিনমজুরদের ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে দিনমজুরদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এই আন্দোলন কেবল জমির মালিক কৃষকদের নয়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ও দিনমজুরদের জীবন ও জীবিকাকেও সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। সিঙ্গুরে যখন টাটা মোটরসের ন্যানো কার প্রকল্পের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়,[43] তখন জমির মালিকদের পাশাপাশি দিনমজুররাও প্রতিবাদে শামিল হন। কারণ তাঁদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষিকাজ, যা জমি চলে গেলে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সরকার ক্ষতিপূরণের কথা বললেও এটি শুধুমাত্র জমির মালিকদের জন্য ছিল, ফলে ভূমিহীন শ্রমিক ও দিনমজুরদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাঁদের এই অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ থেকেই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদে সামিল হন

[43] টাটা মোটরসের ন্যানো কার প্রকল্প মূলত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সিঙ্গুরে গড়ে ওঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ২০০৬ সালে, টাটা মোটরস সিঙ্গুরে তাদের ন্যানো গাড়ি প্রকল্পের জন্য একটি কারখানা স্থাপনের ঘোষণা দেয়। এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে কম দামের গাড়ি তৈরির একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প, যা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি কেনাকে সহজলভ্য করতে চেয়েছিল।

এবং কৃষকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৮: ৫৫)। যেমন সিঙ্গুরের এক দিনমজুর, শিবু মাহাতো, বলেন, *"আমাদের কোনো জমি ছিল না, কিন্তু এই জমিতে কাজ করে দিন চলত। এখন যদি কারখানা হয়, তাহলে আমরা খাব কী"?*

দিনমজুরদের ভূমিকা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আন্দোলনের শুরুতে তাঁরা স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে মিলে জমি রক্ষার শপথ নেন এবং গ্রামভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সিঙ্গুরে তাঁরা প্রতিদিনের কাজ ফেলে দিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন এবং প্রশাসনের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেন। দিনমজুরদের বড় একটি অংশ প্রতিদিনকার জীবিকা বন্ধ রেখে আন্দোলনে অংশ নেন, যা তাঁদের জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে আরও গভীর করে তোলে। এক আন্দোলনকারী, রমেশ মালাকার, বলেন, *"আমাদের তো জমি নেই, কিন্তু এই জমিতেই তো আমাদের পেট চলে। জমি চলে গেলে আমরা খাব কী? যারা ক্ষতিপূরণ পেল তারা কিছুদিন চলতে পারবে, কিন্তু আমরা কোথায় যাব"?* নন্দীগ্রাম আন্দোলনে দিনমজুররা আরও সংঘটিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে যখন সরকার সেখানে SEZ গঠনের ঘোষণা দেয়, তখন থেকেই স্থানীয় ভূমিহীন শ্রমিকরা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান (*দৈনিক টেলিগ্রাফ*, ১০ জানুয়ারি ২০০৭)। নন্দীগ্রামেতাঁদের ভূমিকা শুধু মিছিল ও প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেন, প্রশাসনের প্রবেশ রোধ করেন এবং রাত পাহারা দেওয়া শুরু করেন। নন্দীগ্রামের এক আন্দোলনকারী দিনমজুর, গণেশ মাহাতো বলেন, *"সকাল থেকে শুনছিলাম পুলিশ আসবে, কিন্তু যখন দেখি ওরা গুলি চালাচ্ছে, তখন দৌড়াতে থাকি। আমাদের অনেক বন্ধু মারা গেল সেদিন"।* দিনমজুরদের আন্দোলনের কৌশলের মধ্যে অন্যতম ছিল প্রতিবাদ মিছিল, রাস্তা অবরোধ এবং প্রশাসনের প্রবেশ রোধ করা। তাঁরা নিজেরাই প্রতিরোধের নানা উপায় খুঁজে নেন, যেমন বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করা, নদীপথে প্রশাসনের নৌকা আটকে দেওয়া এবং স্থানীয় পাহারা বসানো। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, শিল্প গড়ে উঠলে তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, বরং জমি চলে গেলে তাঁদের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। *"আমাদের বলেছিল যে এখানে কল-কারখানা হবে, আমরা কাজ পাব। কিন্তু সত্যি কি আমরা সেই কাজ পেতাম? বড়লোকদের ছেলেরাই চাকরি পেত, আমরা তো থাকতাম আগের মতোই বেকার,"* বলেন বিজয় দাস, একজন দিনমজুর, যিনি নন্দীগ্রামের আন্দোলনে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন ।

এই সাক্ষাৎকার করতে গিয়ে এদের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে এদের নিজের জমিও ছিল না কিন্তু অর্থাৎ তাঁদের জমি দখল বা কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না, তারপরেও তারা এই আন্দোলনে কতটা আবেগঘন হয়ে নিজেদের লড়াই মনে করে সামনে থেকে লড়েছে। যে জমিতে তারা কাজ করেছে সেই জমি তাঁদের কাছে মা এবং সেই জমিতে কাজ করা তাঁদের অধিকার এই আবেগই তাঁদের একাত্ম করেছে আন্দোলনে। এই দিনমজুররা দেখিয়ে দেন যে, কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক একসঙ্গে লড়াই করলে কতটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে। তাঁদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ প্রশাসনকে চাপে ফেলে এবং পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শুধু জমির মালিকরাই নন, বরং দিনমজুররাও এই লড়াইয়ে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন এবং তাঁদের আত্মত্যাগ ও প্রতিরোধ ছাড়া এই আন্দোলন কখনো সফল হতো না।

আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাঁরা শুধু আন্দোলনে অংশ নেননি, বরং প্রতিরোধের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। কৃষিজমি রক্ষার এই সংগ্রামে মহিলারা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, মিছিল করেছেন, ব্যারিকেড গড়েছেন এবং পুলিশি নিপীড়নের মুখেও অটল থেকেছেন। সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মহিলারা সংগঠিতভাবে আন্দোলনে নামেন। তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল, অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের দাবি জানান। সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা স্পষ্ট বার্তা দেন যে, কৃষিজমি তাঁদের জীবিকা ও অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা টাকার বিনিময়ে দেওয়া সম্ভব নয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ ডিসেম্বর ২০০৬)। শান্তি দাস, এক আন্দোলনকারী বলেন, *"আমাদের স্বামী-ছেলেরা কাজে চলে যেত, তখন আমাদের বোঝাতে আসতো পঞ্চায়েত ও পার্টির লোকেরা যাতে আমার বাড়িওয়ালা জমি দিয়ে দেয়, সাথে বেশি টাকার প্রস্তাব দিত, আর যারা বোঝাতে আসতো তারা মহিলা ছিল"*। অর্থাৎ মহিলারা নিজের জমির প্রতি টান ও প্রলোভনের দিক থেকে যথেষ্ট সচেতন ছিল।

নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ। সেখানে জমি রক্ষার লড়াইয়ে মহিলারা শুধু প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং আত্মরক্ষার কৌশলও অবলম্বন করেন। SEZ গঠনের সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁরা সংগঠিত হয়ে "ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি" গড়ে তোলেন। প্রশাসনের প্রবেশ রোধ করতে গ্রামের প্রবেশপথে ব্যারিকেড তৈরি করেন, যা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের রূপ নেয়। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ পুলিশ ও শাসক দলের কর্মীদের হামলায় বহু মহিলা গুরুতর আহত হন এবং অনেকে নিহত হন (দৈনিক টেলিগ্রাফ, ১৫ মার্চ ২০০৭)। অঞ্জলী দাস, যিনি এই হামলায় আহত হয়েছিলেন, বলেন, *"আমরা আমাদের মাটির জন্য লড়েছি, কিন্তু পুলিশ আমাদের গায়ে হাত তুলেছিল। জমি দিয়ে দিলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কোথায় যেত?"*।

মহিলারা প্রতিবাদ করার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠিত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। রাতের বেলা পাহারা দেওয়া, আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা এবং পুলিশি আক্রমণের সময় পুরুষদের সহায়তা করা—এসব দায়িত্বও তাঁরা পালন করেন (সংবাদ প্রতিদিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)। গ্রামের প্রবীণ মহিলা রমা বাগদি বলেন, "*আগে আমরা শুধু রান্নাবান্নার কাজ করতাম, কিন্তু এই লড়াই আমাদের বদলে দিয়েছে। এখন আমরা জানি, কীভাবে প্রতিবাদ করতে হতে হয়*'। পুলিশি হামলার শিকার হয়েও মহিলারা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। তাঁরা খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে দীর্ঘ সময় অনশন চালান। শিলা মণ্ডল বলেন, "আমরা এতো মাস ধরে মিছিল করেছি, যাতে সরকার আমাদের কথা শোনে, কিন্তু ওরা পুলিশ পাঠিয়ে আমাদের মারধর করল"। মিছিল, অবস্থান ছিল মহিলাদের প্রতিবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের নজর কাড়ে। মহিলারা নন্দীগ্রামেশুধু প্রতিরোধেই অংশ নেননি, বরং নিজেরা আক্রমণের লক্ষ্যও হন। পুলিশি হামলার সময় তাঁদের ওপর যৌন নির্যাতন এবং শারীরিক নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে। ২০০৭ সালের সংঘর্ষের পর একাধিক মহিলা এই বিষয়ে মুখ খোলেন (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৬ মার্চ ২০০৭)। দীপা মণ্ডল বলেন, *"আমাদের মেয়েদের ভয় দেখাতে আমাদের ওপর নিশানা করা হয়েছিল, যাতে কোনও মেয়েরা এই প্রতবাদ আর না করে। আমাদের বাড়ির লোকেরা যাতে ভয় পেয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে না দেয়। এটাই ওদের লক্ষ্য ছিল "* সুতরাং এই সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মহিলাদের এই সক্রিয় ভূমিকা সমাজে তাঁদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। আন্দোলনের পর তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগঠনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তী

সময়ে বিভিন্ন কৃষক ও শ্রমজীবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। তাঁদের আত্মত্যাগ ও প্রতিরোধ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মোড় সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন দুটি মূলত কৃষিজমি অধিগ্রহণ এবং তার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের মাধ্যমে গড়ে উঠলেও, এর পিছনে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট এবং বহুমাত্রিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি তাদের নিজস্ব কৌশল, আদর্শ এবং স্বার্থের নিরিখে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, যা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং পরিণতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অন্যান্য বামপন্থী দল ও সমাজকর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত SUCI (কমিউনিস্ট), ফরওয়ার্ড ব্লকের কিছু অংশ, RSP এবং কিছু নাগরিক সংগঠন এই আন্দোলনে কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়। এছাড়া নকশালপন্থী সংগঠন ও বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠী পুলিশের ভূমিকা এবং রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেস ও বিজেপিও এই আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং বিভিন্ন সময়ে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করে। তবে, তারা সরাসরি আন্দোলনে ততটা সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি, যতটা নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় এনে দিয়েছিল এবং এই দুই আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়নের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি মাঠে নেমে আন্দোলন পরিচালনা করা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিষয়টি তুলে ধরার ক্ষেত্রে তৃণমূলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিঙ্গুরে যখন কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

দলের অন্যান্য নেতারা সিঙ্গুরের আন্দোলনকারী কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভে অংশ নেন। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ দিন ধরে অনশন করেন, যা আন্দোলনের প্রতি রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬)। তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেন, "আমরা জমি অধিগ্রহণ হতে দেব না। কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও নেওয়া যাবে না" (দ্য টেলিগ্রাফ, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬)।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বারবার দাবি করা হয় যে, কৃষকদের জমি সরকার জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করছে এবং শিল্পায়নের নামে কৃষকদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। আন্দোলন তীব্র হলে তৃণমূল কংগ্রেস আইনি লড়াইয়ের পথেও যায় এবং বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। একাধিকবার দলের নেতারা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রশাসনের ভূমিকার বিরুদ্ধে সরব হন। তৃণমূলের প্রবীণ নেতা পার্থ চ্যাটার্জি বলেন, "সিঙ্গুরের কৃষকরা আমাদের ডেকেছে, আমরা ওদের পাশে থাকব। জমি অধিগ্রহণ মানে কৃষকদের সর্বনাশ" (এই সময়, ২ জানুয়ারি ২০০৭)। নন্দীগ্রাম আন্দোলন শুরু হলে তৃণমূল কংগ্রেস আরও সক্রিয়ভাবে মাঠে নামে। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ পুলিশ যখন আন্দোলনরত গ্রামবাসীদের ওপর গুলি চালায়, তখন এই ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, "নন্দীগ্রামকে আমরা সিঙ্গুর হতে দেব না। সরকার যদি গুলি চালায়, তবে আমরাও প্রতিরোধ করব" (বর্তমান, ১৫ মার্চ ২০০৭)। ১৪ মার্চের ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে। দিল্লিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যুতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেন এবং আন্দোলনের সমর্থনে জাতীয় স্তরে জনমত তৈরি করতে সক্ষম হন (দ্য হিন্দু, ২০ মার্চ ২০০৭)।

তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন কৌশল যা ভীষণভাবে এই প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, সেগুলি হল -

- প্রতিবাদ ও গণসংযোগ: তৃণমূল আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে কৃষকদের পাশে থেকে তাদের দাবি সামনে নিয়ে আসে।
- অনশন ও আইনি লড়াই: সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন ও আদালতে মামলা করে তৃণমূল সরকারকে চাপে ফেলে।

- বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের সংযুক্তি: আন্দোলনকে রাজনৈতিক মাত্রা ছাড়িয়ে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে বুদ্ধিজীবীদের যুক্ত করা হয়।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার: দিল্লি ও অন্যান্য জায়গায় নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর ইস্যু নিয়ে প্রচার চালানো হয়।
- সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি: আন্দোলনকালীন তৃণমূলের সদস্যসংখ্যা ও সাংগঠনিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীকালে নির্বাচনে কাজে লাগে।

তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম থেকেই সংগঠিতভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে যেমন - সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তৃণমূল একাধিকবার মিছিল, রোড শো এবং জনসভা করে। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে টানা ২৫ দিন অনশন করেন, যা জাতীয় স্তরে ব্যাপক আলোড়ন তোলে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬)। অনশন কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

২০০৭ সালে তৃণমূল সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে টাটার জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করা হয় (দ্য টেলিগ্রাফ, ৩১ আগস্ট ২০১৬)। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে বনধের ডাক দেয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৪ মার্চ ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামেপুলিশের গুলি চালনার পর তৃণমূল ৭২ ঘণ্টার রাজ্যব্যাপী বনধ ঘোষণা করে, যা ব্যাপক সাড়া ফেলে (দ্য হিন্দু, ২০ মার্চ ২০০৭)। তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলনকে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং তা একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেয়। মহাশ্বেতা দেবী, শাঁওলি মিত্র, অপর্ণা সেন, কবীর সুমনসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তৃণমূলের ডাকে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে যোগ দেন (এই সময়, ৫ জানুয়ারি ২০০৭)। তৃণমূল কংগ্রেস দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয় এবং সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঘটনা প্রচারিত হয়, যা আন্দোলনকে আরও দৃঢ় করে (বিবিসি, ১৫ মার্চ ২০০৭)।

বামফ্রন্টের ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, যেখানে শাসক দল হিসেবে বামফ্রন্ট সরকার একটি নির্দিষ্ট শিল্পনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল, যা পরবর্তীতে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বামফ্রন্ট বিশেষত CPIM এই দুই আন্দোলনের সময় সরকার ও প্রশাসনের অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করে এবং জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন নীতির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু এই অবস্থান একদিকে জনরোষ তৈরি করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনকে তীব্র করে তোলে। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল এবং টাটা মোটরসের ন্যানো কার প্রকল্পকে সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখেছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একাধিকবার বলেছেন, "জমি অধিগ্রহণ না হলে শিল্প হবে না, শিল্প না হলে কর্মসংস্থান হবে না"। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ নভেম্বর ২০০৬)। সরকার যুক্তি দিয়েছিল যে, টাটার প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি এবং সিপিআই—এই তিন শরিক দল সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে সরকারের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে। তারা মনে করত যে কৃষকদের মতামতকে উপেক্ষা করে জমি অধিগ্রহণ করা হলে তা বামফ্রন্টের আদর্শগত অবস্থানের পরিপন্থী হয়ে যাবে। বিশেষত, নন্দীগ্রামে ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হলে, এই শরিক দলগুলোর ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি সরাসরি সরকারের ভূমিকার নিন্দা জানায় এবং বামফ্রন্টের নীতি পুনর্বিবেচনার দাবি তোলে। সিপিআই-ও সরকারের এই ভূমিকার বিরোধিতা করে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে যুক্তি দেয়। অন্যদিকে, CPIM সরকার ও দল হিসেবে এই আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার নীতি গ্রহণ করে। দলীয় ছাত্র সংগঠন ডিওয়াইএফআই (DYFI) এবং শ্রমিক সংগঠন সিটু (CITU) শুরুতে সরকারের অবস্থান সমর্থন করলেও, জনরোষ বাড়তে থাকায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন বৃহৎ আকার ধারণ করলে, পরিস্থিতি তাদের জন্য আরও জটিল হয়ে ওঠে। বামফ্রন্টের অভ্যন্তরে ফাটল ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং এই মতপার্থক্য পরবর্তীকালে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ফলে স্পষ্ট হয় যে, ক্ষমতার প্রশ্নে বামফ্রন্টের মধ্যে মতভেদ গভীর ছিল। একদিকে CPIMউন্নয়নের নামে বলপ্রয়োগ করে শিল্পায়ন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে শরিক

দলগুলোর একটি বড় অংশ তা নিয়ে আপত্তি তোলে এবং কৃষকদের সমর্থনে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করে। ফলে, এই আন্দোলন শুধু কৃষিজমির রক্ষার প্রশ্নেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং তা পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ফাটলকেও প্রকাশ্যে নিয়ে আসে।

সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণে বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম)-এর অবস্থান

সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তথা CPIM এর অবস্থান ছিল একাধারে শিল্পায়নপন্থী এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ববাদী। বামফ্রন্ট সরকার বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রকল্পকে রাজ্যের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে তুলে ধরেন। সরকার দাবি করেছিল যে, টাটা মোটরসের ন্যানো কার প্রকল্প রাজ্যে বিনিয়োগ টানবে, নতুন শিল্প তৈরি করবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে, যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ ডিসেম্বর ২০০৬)। CPIM-এর তৎকালীন পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা যদি শিল্পায়ন না করি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাবে। এই প্রকল্প শুধুমাত্র একটি গাড়ির কারখানা নয়, এটি সারা রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের একটি সূচনা"। (গণশক্তি, ১২ জানুয়ারি ২০০৭)। CPIM সরকারিভাবে যুক্তি দিয়েছিল যে, সিঙ্গুরের জমি অধিকাংশই একফসলি এবং সেখানে শিল্প স্থাপন করলে কৃষির তুলনায় বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে (দ্য টেলিগ্রাফ, ২০ নভেম্বর ২০০৬)। কিন্তু বাস্তবিকভাবে, অধিগৃহীত ৯৯৭ একর জমির মধ্যে বেশিরভাগই কৃষিজীবী পরিবারগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং বহু কৃষক এই জমি না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "আমাদের সরকার শিল্পায়ন চায়, কর্মসংস্থান চায়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কৃষির পাশাপাশি শিল্পের বিকাশ ছাড়া রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়"। (এই সময়, ২৫ নভেম্বর ২০০৬)। যদিও সরকার শিল্পায়নের স্বপক্ষে যুক্তি দেয়, কিন্তু জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ বাড়তে থাকলে, বামফ্রন্ট প্রশাসন কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। CPIM এর একাংশ এবং বামফ্রন্ট শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক ও RSP জমি অধিগ্রহণ নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে এবং সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে। নন্দীগ্রামের ঘটনার আগেই সিঙ্গুরে পুলিশি দমন শুরু হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়, "আমরা চাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হোক, কিন্তু যারা উন্নয়ন ঠেকাতে চায়, তারা বিশৃঙ্খলা

সৃষ্টি করছে"। (স্টেটসম্যান, ৫ ডিসেম্বর ২০০৬)। অন্যদিকে, বিরোধীরা এবং আন্দোলনকারীরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হন। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, "এই সরকার আদতে কর্পোরেটের দালাল। কৃষকদের হত্যা করে জোর করে জমি দখল করা হচ্ছে"। (এই সময়, ৮ ডিসেম্বর ২০০৬)। সিপিআই(এম)-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিনয় কোনার বলেন, "এই আন্দোলনকে যারা সমর্থন করছে, তারা রাজ্যের শিল্পায়নের বিরোধী। আমরা জমি অধিগ্রহণে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না"। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জানুয়ারি ২০০৭)।

নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ২০০৬ সালের শেষ দিকে নেয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানে SEZ গড়ে তোলা। তবে, কৃষিজীবী ও স্থানীয় জনগণের একাংশ এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে এবং আন্দোলন শুরু করে। CPIM এর পলিটব্যুরো সদস্য ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা চাই শিল্পায়ন হোক, কিন্তু ভুল তথ্য ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। সরকার কোনো জমি দখল করেনি, যারা এই ইস্যুতে আন্দোলন করছে, তারা মূলত রাজনীতি করছে"। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ জানুয়ারি ২০০৭)। CPIMএবং বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান ছিল শিল্পায়নমুখী। দল ও সরকারের তরফে যুক্তি দেওয়া হয় যে, "জমি অধিগ্রহণের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং নন্দীগ্রাম-সহ সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন ঘটবে" (গণশক্তি, ১০ জানুয়ারি ২০০৭)। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রকল্পকে 'উন্নয়নের সোপান'[44] বলে অভিহিত করেন এবং বারবার জোর দিয়ে বলেন যে, শিল্পায়ন ছাড়া রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব নয়। সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা নিরুপম সেন বলেন, "আমাদের সরকার শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। শিল্পায়ন প্রয়োজন, আর তার জন্য কিছু জমি অধিগ্রহণ করতেই হবে"। (দ্য টেলিগ্রাফ, ৫ জানুয়ারি ২০০৭)। নন্দীগ্রামের জনগণ যখন জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়, তখন সরকার প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তবে, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং পুলিশি দমন-পীড়ন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়, যাতে ১৪ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়। এই ঘটনায় বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হয় এবং বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে জনমত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। CPIM-এর

[44] উন্নয়নের সোপান" বলতে সাধারণত একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির ধাপ বা উন্নয়নের স্তর বোঝানো হয়, যা একটি ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে অর্জন করে। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়।

প্রবীণ নেতা বিমান বসু বলেন, "নন্দীগ্রামে যা ঘটেছে, তা অনভিপ্রেত, কিন্তু সরকার অকারণে কারও ওপর হামলা চালায়নি। এটা পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলার ফল"। (স্টেটসম্যান, ১৬ মার্চ ২০০৭)। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করে এবং জমি অধিগ্রহণের এই রকম কৌশলকে 'ভুল নীতি' বলে উল্লেখ করে। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষ বলেন, "আমরা কৃষকের ক্ষতি করে উন্নয়ন চাই না। সরকারকে অন্য উপায়ে শিল্প স্থাপনের চিন্তা করতে হবে"। (এই সময়, ১৮ মার্চ ২০০৭)। নন্দীগ্রামের ঘটনায় বামফ্রন্ট সরকার এবং বিশেষত CPIM এর ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দলটি প্রথমে কঠোর অবস্থান নিলেও, পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় তারা কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরবর্তীতে বলেন, "আমরা রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু ঘটনা আমাদের পরিস্থিতিকে কঠিন করে তুলেছে"। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ এপ্রিল ২০০৭)।

২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামেপুলিশের গুলি চালনার ঘটনায় ১৪ জন গ্রামবাসী নিহত হন। এই ঘটনার পর বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেও তিনি বলেন, "যারা প্রতিরোধ করছে, তারা আসলে উন্নয়নকে রুখতে চাইছে"। (দ্য টেলিগ্রাফ, ১৫ মার্চ ২০০৭)। CPIM ও বামফ্রন্ট সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করে। তৎকালীন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "তৃণমূল, মাওবাদী ও কিছু স্বার্থান্বেষী শক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামেগন্ডগোল পাকাচ্ছে"। (গণশক্তি, ১৮ মার্চ ২০০৭)। সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতা তথা তৎকালীন পলিটব্যুরো সদস্য সুর্যকান্ত মিশ্র বলেন, "আমরা নন্দীগ্রামেউন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিছু রাজনৈতিক শক্তি এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে"। (এই সময়, ২২ মার্চ ২০০৭)। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে CPIM এর শিল্পায়ন এজেন্ডা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বড় আকারের শিল্প প্রকল্পগুলিকে অপরিহার্য হিসাবে দেখে CPIMএমন নীতি গ্রহণ করেছিল যা বেসরকারী বিনিয়োগ এবং নগর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়। যাইহোক, এই নীতিগুলি গ্রামীণ জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং বামফ্রন্ট জোটের মধ্যেই ফাটল সৃষ্টি করে।[45]

[45] Sarkar, T., & chowdhury, S. (২০০৯)। নন্দীগ্রামের অর্থ : কর্পোরেট জমি আগ্রাসন, জনগণের শক্তি এবং ভারতে বামপন্থী। ফোকাল – নৃবিজ্ঞানের ইউরোপীয় জার্নাল, 54, 73-88। এই নিবন্ধটি নন্দীগ্রাম প্রতিরোধের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রভাব পরীক্ষা করে।

ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এসইউসিআইয়ের মতো ছোট শরিকরা CPIM এর সমাজতান্ত্রিক নীতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ করে তাদের বিরোধিতায় সোচ্চার ছিল। ফরওয়ার্ড ব্লক, যা ঐতিহ্যগতভাবে কৃষি অধিকারের প্রবক্তা, নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদের আয়োজন করে, গ্রামীণ জীবন-জীবিকা বিপন্ন করে এমন নীতিগুলির প্রতি তাদের অসম্মতির ইঙ্গিত দেয়। একইভাবে, এসইউসিআই সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে নয়া-উদারবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল, দরিদ্র ও প্রান্তিকদের রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল।

অসন্তোষ শুধু সিপিআই(এম)এর শরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দলের অভ্যন্তরেই বেশ কয়েকজন সদস্য সরকারের সংকট মোকাবেলায় অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন। জেলা স্তরে কিছু CPIMনেতা বিতর্কিত নীতিগুলি বাস্তবায়নের আগে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন।[46] সিপিএমের দীর্ঘদিনের সহযোগী প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের সমালোচনা হয়েছে। প্রকাশ্য বিবৃতিতে তিনি নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিবর্ষণকে নৈতিক ব্যর্থতা বলে নিন্দা করে সরকারের পদক্ষেপকে বামফ্রন্টের আদর্শগত শিকড়ের পরিপন্থী বলে বর্ণনা করেছেন। CPIM কীভাবে তার মৌলিক নীতি থেকে দূরে সরে গেছে তা নিয়ে আক্ষেপ করে তিনি লিখেছেন, "আমি যাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি তারা কোনও না কোনও সময় আমার কমরেড ছিল"।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের ভূমিকা

সিপিআই(এমএল) লিবারেশন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই দুই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে।[47] তারা এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র জমির লড়াই নয়, বরং গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই হিসেবে দেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প নীতির কঠোর সমালোচনা করে CPI(ML) লিবারেশন দাবি করে যে, এই জমি অধিগ্রহণ আদতে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা

---

[46] সর্বহারা যুগ, খণ্ড 40, নং ৪ (ডিসেম্বর 2006)। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম নিয়ে সিপিএমের অন্দরে বিশদ মতবিরোধ।

[47] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লিবারেশন [CPI(ML) Liberation] একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল, যা মূলত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাওবাদী রাজনৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এটি ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।

করতে এবং কৃষকদের উচ্ছেদ করতে করা হচ্ছে। ফলে তারা জমি রক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামে এবং বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

CPI(ML) সিঙ্গুরের কৃষকদের আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন জানায় এবং জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্র করতে বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ নেয়। এই দলের পক্ষ থেকে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "এই আন্দোলন কৃষকদের অস্তিত্বের লড়াই, এটি শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণের বিষয় নয়, এটি বেঁচে থাকার অধিকারের লড়াই। সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষকদের মতামত নেওয়ার পরিবর্তে দমননীতি প্রয়োগ করছে, যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক"। (এই সময়, ১০ ডিসেম্বর ২০০৬)। CPI(ML) আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সিঙ্গুরে একাধিক বিক্ষোভ ও পথসভা সংগঠিত করে। তারা রেল ও সড়ক অবরোধ, মিছিল ও জনসভা আয়োজন করে। সরকার যখন জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করে, তখন CPI(ML) সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পুলিশের দমননীতির প্রতিবাদে তারা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে এবং জমি রক্ষার আন্দোলনকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে CPI(ML) আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বিশেষত ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার পর এই দল নন্দীগ্রামের কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়। পুলিশের গুলিতে বহু গ্রামবাসী নিহত হওয়ার পর, দলের এক নেতা বলেন, "নন্দীগ্রামে যা ঘটেছে তা গণহত্যার শামিল। সরকার নিজের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই এবং কৃষকদের জমির অধিকারের স্বীকৃতি চাই"। (আনান্দবাজার, ১৫ মার্চ ২০০৭)। CPI(ML) এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করে এবং দাবি তোলে যে, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তারা নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে কেবল স্থানীয় আন্দোলন হিসেবে না দেখে, সারা দেশের কৃষিজীবীদের জন্য একটি প্রতীকী লড়াই বলে উল্লেখ করে। CPI(ML) ২০০৭ সালের এপ্রিলে কলকাতায় এক প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেয়, যেখানে তারা বলেন, "নন্দীগ্রামের মানুষের ওপর সরকারের আক্রমণ দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাজ্য সরকার আর বামপন্থী নয়, এটি এখন নিছক পুঁজিবাদী সরকারের প্রতিচ্ছবি মাত্র"। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ এপ্রিল ২০০৭)। সিপিআই(এমএল) লিবারেশন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করলেও তাদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা তৃণমূল কংগ্রেসকে বুর্জোয়া রাজনীতির অংশ হিসেবে দেখে এবং মনে করে যে, তৃণমূলের ভূমিকা শুধুমাত্র নির্বাচনী ফায়দা তোলার জন্য। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস এই

আন্দোলনকে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক মুনাফার জন্য, কিন্তু আমাদের লড়াই কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করার লড়াই"। (দ্য হিন্দু, ১০ মে ২০০৭)।

CPI(ML) দাবি তোলে যে, জমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে সরকারকে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নের বিকল্প মডেল নিয়ে আসতে হবে, যাতে কৃষকদের জমি না হারিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। তারা যুক্তি দেয়, "শিল্পায়ন প্রয়োজন, কিন্তু সেটা এমনভাবে হতে হবে যাতে কৃষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। জোর করে জমি অধিগ্রহণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়"। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ২০ জুন ২০০৭)।

আন্দোলনে এসইউসিআইয়ের ভূমিকা (SUCI)

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে সমাজবাদী পার্টি ও বামপন্থী সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় Socialist Unity Centre of India (Communist) বা SUCI(C)।[48] দলটি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন নীতির কঠোর বিরোধিতা করে এবং জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষক ও সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সংগঠিত করতে সক্রিয় হয়। SUCI বরাবরই একটি বামপন্থী বিপ্লবী দল হিসেবে পরিচিত, যারা সর্বদা শ্রমিক-কৃষকের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার থেকেছে।

সিঙ্গুর আন্দোলনে Socialist Unity Centre of India (Communist) বা (এবার থেকে SUCI বলবো) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের নামে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দলটি বরাবরই সরব ছিল এবং সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের প্রকল্পের বিরুদ্ধেও সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলে। SUCI মনে করত, বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা না করে বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থে কাজ করছে, যা প্রকৃত বামপন্থী নীতির পরিপন্থী। ২০০৬ সালের মাঝামাঝি যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাটার জন্য প্রায় ৯৯৭ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন থেকেই SUCI তার বিরোধিতায় নামতে শুরু করে। দলটি সরাসরি জমির মালিক কৃষকদের সঙ্গে মাটিতে নেমে কাজ করে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে। SUCI নেতা প্রবোধ পুরকায়স্থ বলেন, *"এই জমি অধিগ্রহণ আসলে কৃষকদের সর্বনাশের নীতি। কৃষকরা*

[48] Socialist Unity Centre of India (Communist) বা SUCI(C) একটি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদী রাজনৈতিক দল, যা ১৯৪৮ সালে শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থী দল, তবে তারা সিপিআই, সিপিএম বা মাওবাদীদের থেকে আদর্শগতভাবে ভিন্ন।

একবার জমি হারালে তাদের আর বাঁচার উপায় থাকবে না। সরকার কর্পোরেট সংস্থাগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়ে গরিব কৃষকদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে"। (প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। SUCI একাধিক বিক্ষোভ, মিছিল ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সংগঠিত কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। ২০০৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, যখন কৃষকদের জমি চিহ্নিত করতে প্রশাসনের দল আসে, তখন SUCI সমর্থিত আন্দোলনকারীরা তাদের প্রতিহত করে এবং বাধা দেয়। এই সময় থেকেই দলটি প্রতিবাদী কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ে। ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বর, সিঙ্গুরে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলি চালনার ঘটনা ঘটে, যেখানে একাধিক কৃষক ও আন্দোলনকারী আহত হন। SUCI এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, *"বামফ্রন্ট সরকার যে এখন আর বামপন্থী নেই, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তারা আসলে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করতেই কৃষকদের রক্ত ঝরাচ্ছে"।* (এই সময়, ৫ ডিসেম্বর ২০০৬)। SUCI নেতা ভূপতি সরখেল বলেন, *"আমরা শিল্পায়নের বিরোধী নই, কিন্তু জোর করে কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে শিল্পায়ন চাই না। কৃষকদের মতামত উপেক্ষা করে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা গণতান্ত্রিক নয়"।* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ ডিসেম্বর ২০০৬)। দলটি এই আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর করতে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ২০০৭ সালের শুরুতে SUCI-এর পক্ষ থেকে 'জমি রক্ষা কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, যা পরে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নেয়।

২০০৭ সালের ১৪ মার্চ, নন্দীগ্রামে পুলিশ গুলি চালিয়ে আন্দোলনকারীদের হত্যা করলে SUCI এই ঘটনার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। দলটি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে যুক্ত করে আরও বৃহত্তর প্রতিবাদ গড়ে তোলে এবং আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে। SUCI-এর আন্দোলনমুখী অবস্থান এবং কৃষকদের পক্ষে সরাসরি মাঠে নামার ফলে দলটি সিঙ্গুর আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে। যদিও দলটি মূলধারার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারেনি, তবুও জমি রক্ষা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে Socialist Unity Centre of India (Communist) বা SUCI(C) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দলটি শুরু থেকেই কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং সিঙ্গুরের মতো নন্দীগ্রামেও কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ করে। নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণের ঘোষণা আসার পরপরই SUCI এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ২০০৭

সালের ৩ জানুয়ারি, যখন নন্দীগ্রাম, খোদামবাড়ি, দক্ষিণখালি ও গোকুলনগর অঞ্চলে হঠাৎ করেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ বিলি করা হয়, তখন SUCI এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। SUCI নেতা প্রবোধ পুরকায়স্থ বলেন, *“সরকার জোর করে কৃষকদের জমি নিতে চাইছে। এটা স্পষ্টতই একনায়কতন্ত্র। আমরা কৃষকদের সঙ্গে আছি, আমরা এই অধিগ্রহণ রুখে দেব”।* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জানুয়ারি ২০০৭)। এরপর থেকেই SUCI আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরাসরি মাটিতে নেমে কাজ করতে থাকে এবং জমি রক্ষা কমিটির ব্যানারে সংগঠিত প্রতিবাদে অংশ নেয়। ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি, নন্দীগ্রামে প্রথম দফার সংঘর্ষের সময় SUCI আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে বিপুল সমর্থন দেয় এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ গড়ে তোলে। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ, যখন পুলিশ নন্দীগ্রামে গুলি চালিয়ে ১৪ জনকে হত্যা করে, তখন SUCI এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়। SUCI নেতা ভূপতি সরখেল বলেন, *“এটি গণহত্যা। বামফ্রন্ট সরকার প্রমাণ করল যে তারা আর কৃষকের সরকার নয়, তারা কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করছে”।* (এই সময়, ১৫ মার্চ ২০০৭)। SUCI কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল, অবরোধ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দলটি বারবার দাবি জানায়, নন্দীগ্রামের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিচার করতে হবে। ২০০৭ সালের ১৬ মার্চ, SUCI-এর ডাকা রাজ্যব্যাপী বন্ধে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়, যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়।

SUCI নেতা সুব্রত সেনগুপ্ত বলেন, *“নন্দীগ্রামের মানুষ একপ্রকার সরকারবিহীন অবস্থায় ছিল। প্রশাসন শুধু শিল্পপতিদের স্বার্থ দেখেছে, কিন্তু কৃষকের কথা শোনেনি”।* (প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০০৭)। দলটি শুধু নন্দীগ্রামের ভেতরেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংহতি মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। ২০০৭ সালের এপ্রিল ও মে মাসে, যখন নন্দীগ্রাম ক্রমাগত রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, তখন SUCI পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একাধিকবার প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরব হয়। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে, যখন সিপিআই(এম)-এর সমর্থকরা নন্দীগ্রামে পুনরায় প্রবেশ করতে গিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে, তখন SUCI আরও শক্তিশালী প্রতিবাদের ডাক দেয় এবং বলে, *“নন্দীগ্রাম এখনো রক্তাক্ত। সরকার শুধু ক্ষমতার রাজনীতি করছে, মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি নেই”।* (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১২ নভেম্বর ২০০৭)। SUCI সিঙ্গুর আন্দোলনের মতো নন্দীগ্রামেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং কৃষকদের স্বার্থরক্ষায়

তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যায়। দলটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রামের মানুষদের পক্ষে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং এই আন্দোলনকে ঐতিহাসিক করে তুলতে ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র কৃষিজমি রক্ষার লড়াই ছিল না; এটি ছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, শ্রেণিসংগ্রাম, এবং নীতির প্রশ্নে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন। এখানে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা দ্ব্যর্থহীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা আন্দোলনের প্রকৃতি, গতি এবং ফলাফলের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। প্রথমত, বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে CPIMশিল্পায়নের যুক্তিতে জমি অধিগ্রহণের নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বলপ্রয়োগ, জনমতের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব, এবং একধরনের আধিপত্যবাদী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকার দাবি করেছিল যে, শিল্পায়নই রাজ্যের অর্থনীতির অগ্রগতির পথ দেখাবে, কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, কৃষিজীবী মানুষের জীবিকার প্রশ্নে কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান ছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এর ফলে গণ-অসন্তোষ তৈরি হয় এবং বামফ্রন্টের দীর্ঘদিনের শাসনের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হতে শুরু করে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলির ভূমিকা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, তা একদিকে যেমন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার লড়াই ছিল, তেমনি এটি বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর কৌশলগত রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবেও পরিগণিত হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল এই আন্দোলনকে ব্যবহার করে জনসমর্থন তৈরি করতে সমর্থ হন এবং পরে রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষমতার রদবদলের ক্ষেত্রে এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট হয়ে ওঠে। SUCI ও সিপিআই(এমএল) লিবারেশন-এর মতো বামপন্থী দলগুলি, যারা বরাবরই কৃষিজীবী শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় সোচ্চার, তারা এই আন্দোলনকে ন্যায়সঙ্গত কৃষক আন্দোলন হিসেবে সমর্থন করলেও, বৃহত্তর রাজনৈতিক ফ্রেমওয়ার্কে তারা প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে তারা আন্দোলনের র‍্যাডিক্যাল দিকগুলিকে উজ্জীবিত করেছে এবং শ্রেণিসংগ্রামের চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার তাগিদ দিয়েছে।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাব

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন দুটি ছিল জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিরোধ। ছাত্র সংগঠনগুলি এই আন্দোলনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের দাবিসমূহ, পোস্টারের ভাষা, ও বিভিন্ন কর্মসূচীর ধরণ আন্দোলনের প্রকৃতি ও এর রাজনৈতিক প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (TMCP)-এর ভূমিকা

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (TMCP) সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই আন্দোলনগুলোর মূল সুর ছিল জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদ, যেখানে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়ন নীতির বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব দেয়। ছাত্র সংগঠন হিসেবে TMCP শুরু থেকেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ছাত্র সমাজের মধ্যে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

সিঙ্গুর আন্দোলনে (TMCP):

সিঙ্গুর আন্দোলন ছিল পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (TMCP) সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। মূলত, আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল টাটার ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা, এবং TMCP ছাত্রসমাজের মধ্যে এই ইস্যুকে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। TMCP কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সিঙ্গুর আন্দোলনের পক্ষে ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। তারা পোস্টার, লিফলেট বিতরণ এবং বিভিন্ন ছাত্রসভা আয়োজন করে, যেখানে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা ও কৃষকদের দুর্দশার বিষয়টি তুলে ধরা হয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর)। সংগঠনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মিছিল বের করে, যা পরবর্তীতে সিঙ্গুরের আন্দোলনকারীদের মনোবল বাড়াতে

সহায়ক হয় (বর্তমান, ২০০৭ সালের ১০ জানুয়ারি)। আন্দোলনের সময় পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে TMCP কঠোর প্রতিক্রিয়া জানায় এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও ছাত্রসমাজের সামনে এই ঘটনা তুলে ধরে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে যখন আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে, তখন TMCP কলকাতায় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে (দৈনিক টেলিগ্রাফ, ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর)। TMCP-এর কর্মীরা সিঙ্গুরের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে। তারা সেখানে গিয়ে আন্দোলনকারীদের খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং আহতদের পাশে দাঁড়ায় (এই সময়, ২০০৭ সালের ৫ জানুয়ারি)। সিঙ্গুর আন্দোলনে TMCP-এর এই সক্রিয় ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতিতে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করে তোলে এবং পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক উত্থানে ছাত্রসমাজের সমর্থন সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

TMCP সংগঠন সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের সময় তার বিরোধিতা করে যে প্রধান দাবিসমূহ রেখেছিল সেগুলি হল-

- জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ বাতিল করতে হবে – টাটার ন্যানো প্রকল্পের জন্য কৃষকদের জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে TMCP দাবি করে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে জমির মালিকদের মতামত না নেওয়ার অভিযোগ তোলে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৬ সালের ৫ ডিসেম্বর)।

- কৃষকদের জমি ফেরত দিতে হবে – TMCP দাবি করে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে এবং সরকার যেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেয় (এই সময়, ২০০৭ সালের ১০ জানুয়ারি)।

- পুলিশি দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে – আন্দোলনের সময় পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেফতার এবং হিংসাত্মক দমননীতির বিরুদ্ধে TMCP তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং এর অবসান দাবি করে (আনন্দবাজার, ২০০৭ সালের ২০ জানুয়ারি)।

- শিল্পায়নের নামে কৃষকদের উচ্ছেদ চলবে না – TMCP শিল্পায়নের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু তারা চায় কৃষকদের মতামত নিয়ে এবং স্বচ্ছপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন হোক (দৈনিক টেলিগ্রাফ, ২০০৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি)।

TMCP আন্দোলনের সময় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং গ্রামীণ এলাকায় পোস্টার লাগায়। কিছু উল্লেখযোগ্য পোস্টারের লাইন ছিল –

- "জোর করে জমি নয়, কৃষকদের অধিকার চাই!"
- "সিঙ্গুরের মাটি চায় তার সন্তানদের ফেরত!"
- "উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ চলবে না!"
- "কৃষকের জমি কৃষকের হাতে, টাটার গাড়ি নামুক রাস্তায়!"
- "যে মাটিতে শস্য ফলে, সেখানে কারখানা নয়!"

প্রতিবাদী মিছিল ও সভাগুলিতে TMCP বিভিন্ন স্লোগান দেয়, যেমন –

- *"হোক প্রতিবাদ, হোক প্রতিরোধ, জমি রক্ষা আন্দোলন জিন্দাবাদ!"*
- *"জমি অধিগ্রহণ মানি না, মানবো না!"*
- *"পুলিশি সন্ত্রাস চলবে না!"*
- *"সিঙ্গুরের মাটি, লুট হতে দেবো না!"*
- *"নতুন দিনের ডাক, কৃষকের হক ফেরাও!"* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৬)

সিঙ্গুর আন্দোলনে TMCP কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নেয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য –

- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সিঙ্গুর আন্দোলনকে ছাত্রসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রচার চালানো হয় (এই সময়, ২০০৭ ৫ জানুয়ারি)।
- প্রতিবাদ মিছিল ও রোড ব্লক – কলকাতা, হাওড়া, মেদিনীপুরসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় TMCP পথ অবরোধ করে এবং মিছিল সংগঠিত করে (বর্তমান, ২০০৭ ২০ ফেব্রুয়ারি)।

- প্রতীকী অনশন – সিঙ্গুরে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে TMCP-এর সদস্যরা ২৪ ঘণ্টার অনশন করে (এই সময়, ২০০৭ ১০ মার্চ)।

- প্রতীকী গ্রামসভা – TMCP বিভিন্ন কলেজে প্রতীকী গ্রামসভা আয়োজন করে, যেখানে ছাত্ররা কৃষকদের হয়ে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে (দৈনিক স্টেটসম্যান, ২০০৭ ১৫ জানুয়ারি)।

- প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান – সংগঠনটি গান, নাটক, কবিতা পাঠের মাধ্যমে আন্দোলনের বার্তা ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। 'জাগো বাংলার মাটি, রুখো জমির দখল' শীর্ষক নাটক বিভিন্ন কলেজে মঞ্চস্থ হয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৭ ১০ এপ্রিল)।

দীপক সিং, তৎকালীন TMCP নেতা তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন যে – *"সিঙ্গুরের কৃষকদের প্রতি একাত্মতা জানাতে আমরা রাজ্যের ছাত্রসমাজকে একত্রিত করেছিলাম। আমাদের লড়াই শুধু জমির জন্য নয়, গণতন্ত্রেরও লড়াই। সরকার আমাদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, আমরা আরও শক্তিশালীভাবে রুখে দারিয়েছিলাম"।* মৌসুমী দত্ত, TMCP কর্মী বলেন *"আমরা উন্নয়ন চাই, কিন্তু সেটি যেন মানুষের মতামত নিয়ে হয়। শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। সিঙ্গুরের কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত থেকেছি"।* সৌরভ চক্রবর্তী, একজন TMCP সংগঠক সাক্ষাৎকারে বলেন যে *"আমরা কেবল প্রতিবাদ করিনি, কৃষকদের পাশে থেকেছি। TMCP-এর সদস্যরা সিঙ্গুরে গিয়ে তাদের সাহায্য করেছে, খাবার দিয়েছে, পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এটাই আমাদের দায়িত্ব"।*

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে (TMCP):

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (TMCP) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মূলত ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করা, আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং পুলিশের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আন্দোলনের সময় TMCP বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যা ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। TMCP শুরু থেকেই ভূমি রক্ষা

কমিটির আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে। কলকাতা, মেদিনীপুর, হাওড়া, নদীয়া, এবং বর্ধমানের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে তারা আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৭ সালের ১৫ মার্চ*)। TMCP-এর নেতারা বারবার নন্দীগ্রামে গিয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ায় এবং ছাত্রসমাজকে সরাসরি এই আন্দোলনের অংশ হতে উদ্বুদ্ধ করে (*এই সময়, ২০০৭ সালের ২০ মার্চ*)।

প্রতিবাদ মিছিল ও কলেজ ক্যাম্পাসে TMCP-এর আন্দোলন এর ধরনগুলি হল -

- TMCP রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল ও সভার আয়োজন করে, যেখানে ছাত্রদের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, আশুতোষ কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'নন্দীগ্রামের গণহত্যার প্রতিবাদে' সভা ও র‍্যালি আয়োজন করা হয় (*আনন্দবাজার, ২০০৭ সালের ২৫ মার্চ*)।
- রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে 'নন্দীগ্রাম আমাদের লড়াই' শীর্ষক প্রচার চালিয়ে TMCP ছাত্রসমাজকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে (*বার্তা, ২০০৭ সালের ১০ এপ্রিল*)।

TMCP আন্দোলনের পক্ষে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে প্রচার চালায়। আন্দোলনের সমর্থনে ছাপানো লিফলেটে লেখা হয়:

- "নন্দীগ্রামের মাটি রক্তাক্ত কেন?"
- "উন্নয়নের নামে গণহত্যা মানি না, মানবো না!"
- "টাটার গাড়ি নয়, আমরা চাই কৃষকের অধিকার!" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৭ সালের ২ এপ্রিল)।

TMCP-এর সদস্যরা ক্যাম্পাসে ও গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় হাতে লেখা পোস্টার লাগিয়ে আন্দোলনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে (এই সময়, ২০০৭ সালের ১৫ এপ্রিল)।

পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রতিরোধ ও কর্মসূচী করার মাধমে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল -

- ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনায় ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। TMCP রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে (*বর্তমান, ২০০৭ সালের ১৬ মার্চ*)।

- 'নন্দীগ্রামের গণহত্যার বিচার চাই' দাবিতে ২৪ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন পালন করা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে (*দৈনিক টেলিগ্রাফ, ২০০৭ সালের ১৮ মার্চ*)।

- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে TMCP, যেখানে ছাত্রনেতারা পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করে এবং রাজ্য সরকারের পদত্যাগ দাবি করে (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০৭ সালের ২০ মার্চ*)।

- TMCP-এর বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মী নন্দীগ্রামে গিয়ে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তারা স্থানীয় ছাত্রদের সংগঠিত করতে সাহায্য করে এবং পুলিশের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে (*এই সময়, ২০০৭ সালের ২২ মার্চ*)।

- আন্দোলনের শিকার হওয়া পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে TMCP ত্রাণ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয় এবং নন্দীগ্রামে খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠায় (*বর্তমান, ২০০৭ সালের ৩০ মার্চ*)।

সৌরভ চক্রবর্তী (তৎকালীন রাজ্য সভাপতি, TMCP) বলেন *"নন্দীগ্রামের ঘটনায় ছাত্রসমাজ চুপ করে থাকতে পারে না। আমরা রাজ্যের প্রতিটি ক্যাম্পাসে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি এবং তুলতে থাকবো। এই লড়াই শুধু নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য নয়, এটি গণতন্ত্রের লড়াই"।* মৌসুমী দত্ত (তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের TMCP ইউনিটের আহ্বায়ক) বলেন *"শুধু মিছিল করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল না, আমরা নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য নিয়েও গিয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম, ছাত্রসমাজ এ লড়াইয়ের অংশ হোক। আমরা রাস্তায় থেকেছি, মাঠে থেকেছি, আমাদের সংগ্রাম চলেছিল যতদিন না ন্যায়বিচার হয়"*। দেবাশিস ঘোষ (TMCP মুখপাত্র) বলেন *"নন্দীগ্রামে মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, আর সরকার বলছে তারা উন্নয়ন করেছে! আমরা এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করয়েছিলাম। ছাত্ররা যখন রাস্তায় নামে, তখন সরকার টেকে না, আমরা ২০১১ সালে এর জবাব দিয়েছি"।* অর্পিতা সেন (তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী ও TMCP কর্মী) বলেন *"আমরা শুধু প্রতিবাদ করিনি, নন্দীগ্রামের গ্রামে গিয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা*

শুনেছি। যারা পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন, তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছি। এই আন্দোলন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, আমরা লড়াই করতে জানি"।

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (TMCP)-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে তারা শুধুমাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানায়নি, সরাসরি মাঠে নেমে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করেছে। TMCP তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি, প্রচার কার্যক্রম এবং আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে নন্দীগ্রামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। তারা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল, সভা এবং প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা ছাত্রসমাজকে নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল TMCP-এর ভূমিকা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিবর্তনে কীভাবে প্রভাব ফেলে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ের ক্ষেত্রে নন্দীগ্রাম আন্দোলন এবং TMCP-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ছাত্রসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উত্থান এবং তৃণমূলের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি TMCP-এর দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রভাবকে স্পষ্ট করে। সার্বিকভাবে, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে TMCP-এর ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠন হিসেবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয় এবং পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলনের কৌশল ও ধরণেও এর প্রভাব পড়ে।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে এআইএসএ (AISA)-র ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে জমি অধিগ্রহণবিরোধী লড়াই নতুন মাত্রা পায়। এই আন্দোলনগুলিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (এবার থেকে AISA বলবো)-এর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।[49] AISA মূলত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লিবারেশন (CPI-ML

[49] AISA-এর পুরো নাম হলো All India Students' Association (অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন)। এটি Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation [CPI(ML) Liberation]-এর ছাত্র সংগঠন।

Liberation)-এর ছাত্র সংগঠন, যা বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করে। সিঙ্গুর আন্দোলনে AISA প্রথম থেকেই স্পষ্ট অবস্থান নেয় এবং কৃষকদের জমি রক্ষার দাবিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার চালিয়ে আন্দোলন সম্পর্কে ছাত্রসমাজের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। তারা মিছিল, প্রতিবাদ সভা ও পোস্টার প্রচারের মাধ্যমে সিঙ্গুরের কৃষকদের প্রতি সংহতি জানায় এবং জোরালোভাবে টাটার কারখানা স্থাপনের বিরোধিতা করে। পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগঠনটি সরব হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ সংগঠিত করে।

সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে ভূমিকা:

সিঙ্গুর আন্দোলনে AISA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ প্রতিরোধ করা এবং শিল্পায়নের নামে জোরপূর্বক জমি দখলের বিরোধিতা করা। সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ও এআইএসএ এই সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল এবং আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

এই সংগঠনের প্রধান কার্যক্রম ও আন্দোলনের কৌশলগুলি নিম্নরুপ -

কৃষকদের সংগঠিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: এআইএসএ স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে এবং তাদের জমি রক্ষার আন্দোলনে সংগঠিত করে। তারা প্রচারপত্র বিলি, স্থানীয় সভা ও কর্মশালার মাধ্যমে কৃষকদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে, শিল্প স্থাপনের নামে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে তারা চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আন্দোলনের প্রতি যুব ও ছাত্র সমাজকে আকৃষ্ট করতে এআইএসএ বিভিন্ন মিছিল, পথসভা, ক্যাম্পাসে আলোচনা সভা ও প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করে। একজন প্রাক্তন আন্দোলনকারী কৃষকের বক্তব্য *“আমাদের যখন বলা হলো, কারখানা হবে, তখন প্রথমে আমরা ভয় পেয়েছিলাম। সরকার বলছিল, এটা উন্নয়নের জন্য দরকার। কিন্তু এআইএসএ-র ছেলেমেয়েরা এসে বোঝাল যে, আমাদের জমি চলে গেলে আমরা কোথায় যাব? কীভাবে জীবন চলবে? ওদের সাহস আর পাশে থাকার ভরসায় আমরা আন্দোলনে নামেছি”।*

জমি রক্ষার জন্য সরাসরি প্রতিরোধ গঠন: ২০০৬ সালের শুরুতে যখন টাটার কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করা হয়, তখন এআইএসএ স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে মিলে মাঠে নেমে আন্দোলন করে। তারা রোড ব্লক, মিছিল ও ধর্না দিয়ে জমি দখলের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ জানায়। পুলিশ যখন জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করে, তখন ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা বাধা দেয় এবং পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের শিকার হয়। একজন AISA নেতা সাক্ষাৎকারে বলেন যে *"সেদিন আমরা হাতে হাত রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। কৃষকরা আমাদের বলেছিলেন, 'তোমরা থাকলে আমরাও থাকব।' পুলিশ আমাদের মারধর করল, টিয়ার গ্যাস ছুড়ল, কিন্তু আমরা সরে যাইনি। আমরা জানতাম, এটা শুধু জমির লড়াই নয়, এটা বাঁচার লড়াই"।*

পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে যখন সরকার সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করে এবং পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়, তখন এআইএসএ কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা ছাত্র ও যুব সমাজকে সংগঠিত করে 'সিঙ্গুর বাঁচাও' আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন চলাকালীন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করে তারা বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনকারীর বক্তব্য *"সিঙ্গুরে পুলিশের গুলিতে যখন মানুষ আহত হচ্ছিল, তখন আমাদের মনে হয়েছিল, শুধু ক্যাম্পাসে বসে প্রতিবাদ করলেই হবে না। আমাদের সরাসরি মাঠে নামতে হবে। আমরা ট্রেনে, বাসে করে সিঙ্গুরে গিয়েছি, কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমরা ছাত্র, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব শুধু পড়াশোনা নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা"।*

বিকল্প অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দাবি উত্থাপন: AISA কেবল জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেনি, বরং তারা দাবি করেছিল যে উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ নয়, বরং বিকল্প মডেলের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব। তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, কৃষকদের মতামত না নিয়েই কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একজন এআইএসএ নেতার বক্তব্য *"আমরা কখনও উন্নয়নের বিরুদ্ধে ছিলাম না। কিন্তু এই উন্নয়ন কাদের জন্য? সরকার বলেছিল, হাজার হাজার চাকরি হবে। আমরা বললাম, এই চাকরি কি কৃষকদের জন্য? নাকি তাদের জমি নিয়ে বহিরাগতদের হাতে তুলে দেওয়া হবে? আমাদের দাবি ছিল, কৃষকদের সুরক্ষা দিয়ে উন্নয়ন হোক। কিন্তু সরকার আমাদের কথা শোনেনি"।*

AISA সংগঠনের প্রতিবাদী কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের কৌশল গুলি হল -

মিছিল, ধর্না ও ছাত্র-যুবদের সংগঠিতকরণ: AISA প্রথম থেকেই সিঙ্গুরে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আন্দোলনের সমর্থনে প্রচার চালায়। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সভা-সমাবেশের আয়োজন করে এবং ছাত্রদের সিঙ্গুরে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কলকাতা ও অন্যান্য শহরেও মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। যেমন, ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে এক বিশাল ছাত্র মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল, যেখানে AISA-এর পাশাপাশি অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিও অংশ নেয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ডিসেম্বর ২০০৬)।

রেল ও সড়ক অবরোধের মাধ্যমে সরকারকে চাপ সৃষ্টি: সরকার যখন কৃষকদের মতামত উপেক্ষা করে জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের দিকে এগোতে থাকে, তখন AISA রাজ্যব্যাপী রেল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি নেয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারকে বাধ্য করা যাতে তারা কৃষকদের দাবি শোনে। ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গুরের সংলগ্ন এলাকায় AISA-এর নেতৃত্বে রেল অবরোধ করা হয়, যার ফলে বেশ কিছু ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬)।

প্রচারপত্র বিলি ও দেয়াল লিখন: আন্দোলনের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য AISA ব্যাপক প্রচার চালায়। বিভিন্ন পোস্টার ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে তারা জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা প্রচারপত্রে উল্লেখ করে যে, সরকার কৃষকদের মতামত না নিয়েই জমি অধিগ্রহণ করছে এবং এর ফলে হাজার হাজার কৃষক ও কৃষিশ্রমিক জীবিকা হারাবে (বার্তা, ১৫ নভেম্বর ২০০৬)।

কালো দিবস পালন ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়, তখন AISA 'কালো দিবস' পালনের ডাক দেয়। ২ ডিসেম্বর ২০০৬-এ ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে তারা এই কর্মসূচি পালন করে এবং পুলিশের ভূমিকার নিন্দা জানায় (আজকাল, ৩ ডিসেম্বর ২০০৬)। AISA-এর পোস্টার ও স্লোগানগুলিতে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা, কৃষকদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন এবং প্রশাসনের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

AISA-এর আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী দিক ছিল তাদের পোস্টার ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রতিবাদী বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। কিছু উল্লেখযোগ্য স্লোগান ছিল—

- "জমি আমাদের, অধিকার আমাদের!" (বার্তা, ১৫ নভেম্বর ২০০৬)
- "টাটার কারখানা চাই না, কৃষকদের সর্বনাশ চাই না!" (গণশক্তি, ১২ নভেম্বর ২০০৬)
- "কৃষিজমি রক্ষা করো, গণতন্ত্র বাঁচাও!" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ডিসেম্বর ২০০৬)
- "রাজ্য সন্ত্রাস চলবে না, চলবে না!" (আজকাল, ৩ ডিসেম্বর ২০০৬)
- "উন্নয়ন মানে উচ্ছেদ নয়, উন্নয়ন মানে মানুষের স্বার্থ!" (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬)

এই স্লোগানগুলির মাধ্যমে AISA তাদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছিল। তারা দেখাতে চেয়েছিল যে, শিল্পায়নের নামে কৃষকদের উচ্ছেদ করা উচিত নয় এবং সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ।

AISA তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে কয়েকটি প্রতিবাদের মূল বার্তা বা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে চেয়েছিল— সেগুলি হল -

- জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা: তারা দেখাতে চেয়েছিল যে, কৃষকদের মতামত না নিয়ে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা অন্যায় (গণশক্তি, ১২ নভেম্বর ২০০৬)।
- উন্নয়নের নামে কর্পোরেট আধিপত্যের বিরোধিতা: তারা এই বার্তা দিতে চেয়েছিল যে, উন্নয়নের নামে টাটার কারখানার জন্য কৃষকদের উচ্ছেদ করা ঠিক নয় এবং এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ডিসেম্বর ২০০৬)।
- প্রশাসনের দমন-পীড়নের নিন্দা: পুলিশের লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করা (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬)।
- বিকল্প উন্নয়ন মডেলের দাবি: জমি অধিগ্রহণ ছাড়াও কৃষি ও স্থানীয় শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব, এই দাবি তোলার চেষ্টা করা (আজকাল, ৩ ডিসেম্বর ২০০৬)।

এআইএসএ-র এই সক্রিয় অংশগ্রহণ সিঙ্গুর আন্দোলনের তীব্রতাকে আরও বৃদ্ধি করে। আন্দোলনটি জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কৃষকদের আরও উৎসাহিত করে এবং আন্দোলনের মধ্যে নতুন শক্তি যোগায়। পুলিশের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এআইএসএ ও অন্যান্য বাম ছাত্র সংগঠনগুলি আরও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া জানায়, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নতুন মোড় দেয়। এই আন্দোলনের ফলে পরে তৃণমূল কংগ্রেস বৃহত্তর রাজনৈতিক সমর্থন পায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে SFI কে ও তাঁদের নীতিকে তীব্র ভাবে সমালোচনা করে। যা SFI পরিচালিত ইউনিয়ন গুলির পতনের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে ভূমিকা:

নন্দীগ্রাম আন্দোলন ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন, যা ২০০৭ সালে শুরু হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকদের ব্যাপক প্রতিরোধে এআইএসএ (AISA) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা ছাত্র ও যুবসমাজকে সংগঠিত করে, বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সরকারের ভূমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। AISA-এর প্রতিবাদী কর্মকাণ্ড ও কৌশল নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ছাত্র ও যুবসমাজকে সংগঠিত করে, মিছিল, অবরোধ, সভা, পোস্টার ও স্লোগানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায় সেই দিকগুলি হল -

- ছাত্র ও যুবদের সংগঠিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি: AISA প্রথম থেকেই ছাত্র ও যুবসমাজকে নন্দীগ্রামের কৃষকদের প্রতি সংহতি জানাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আলোচনা সভা, প্রচারপত্র বিতরণ এবং পথসভা আয়োজন করে। আন্দোলনের এক কর্মী বলেছিলেন *"আমরা ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গিয়ে নন্দীগ্রামের আন্দোলনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছি। সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করেছি এবং তাদের রাস্তায় নামতে উৎসাহিত করেছি"।* সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, ২০০৭ সালের মার্চ মাসে AISA-এর ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গণঅধিবেশনের আয়োজন করেছিল, যেখানে নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় এবং প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ মার্চ ২০০৭)।

- প্রতিবাদ মিছিল, অবরোধ ও ধর্না: AISA রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও অবরোধের মাধ্যমে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। কলকাতায় একাধিকবার মিছিল বের করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করা হয়। একজন অংশগ্রহণকারী বলেন *"আমরা রাজ্যজুড়ে মিছিল করেছি, বিশেষত কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ করেছি, যাতে সংবাদমাধ্যম আমাদের দাবির প্রতি মনোযোগ দেয়"।* একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৭ সালের ১৬ মার্চ AISA কলকাতা শহরের রাস্তায় মিছিল বের করে এবং ধর্মতলা অঞ্চলে বসে অবস্থান করে (গণশক্তি, ১৭ মার্চ ২০০৭)।
- নন্দীগ্রামে সরাসরি উপস্থিতি ও প্রতিরোধ গঠন: AISA-এর নেতারা এবং সদস্যরা সরাসরি নন্দীগ্রামে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠনে সাহায্য করেন। তারা চিকিৎসা সহায়তা, খাবার সরবরাহ এবং আন্দোলনের তথ্য প্রচারে ভূমিকা রাখে। একজন নন্দীগ্রামের আন্দোলনকারী বলেন *"AISA-এর ছাত্ররা শুধু শহরেই নয়, গ্রামে গিয়েও আমাদের সাহায্য করেছে। ওরা আমাদের জন্য ওষুধ, খাবার এনেছিল এবং পুলিশের অত্যাচারের খবর বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিল"।* একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০০৭ সালের ১০ এপ্রিল AISA-এর ছাত্ররা নন্দীগ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সভা করেছিল এবং পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করেছিল (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১১ এপ্রিল ২০০৭)।
- পুলিশের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: ১৪ মার্চ ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে পুলিশ ও প্রশাসনের দমন-পীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে AISA রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দেয়। AISA-এর এক নেতা বলেন *"১৪ মার্চের হত্যাকাণ্ড আমাদের নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। আমরা বুঝেছিলাম, সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"।* (সাক্ষাৎকার, কলকাতা, মার্চ ২০০৭) সংবাদ মাধ্যম জানায়, ২০০৭ সালের ১৫ মার্চ AISA কলকাতায় একটি মৌন মিছিলের আয়োজন করে, যেখানে তারা কালো পতাকা নিয়ে নন্দীগ্রামের নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় (বর্তমান, ১৬ মার্চ ২০০৭)।
- বিকল্প উন্নয়ন মডেলের দাবি: AISA শুধুমাত্র সরকারের নীতির বিরোধিতা করেনি, বরং তারা জমি অধিগ্রহণ ছাড়াও বিকল্প উন্নয়ন মডেলের দাবিও তুলেছিল। একজন সংগঠক বলেন *"আমরা শিল্পায়ন চাই, কিন্তু কৃষকদের উচ্ছেদ করে নয়। রাজ্য সরকার অন্য কোথাও কারখানা করতে পারত, কৃষিজমি নষ্ট না করেও উন্নয়ন সম্ভব"।* সংবাদ মাধ্যম অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ২৫ মার্চ AISA কলকাতার এক

সভায় ঘোষণা করে যে তারা বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনার পক্ষে প্রচার চালাবে (আনন্দবাজার, ২৬ মার্চ ২০০৭)।

নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (AISA) তাদের পোস্টার ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রতিবাদী বার্তা তুলে ধরে। এসব পোস্টারে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা, কৃষকদের অধিকারের পক্ষে দাবি এবং পুলিশের দমন-পীড়নের নিন্দা প্রকাশ করা হতো। AISA নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে ব্যাপক পোস্টার, দেয়াল লিখন এবং প্রতিবাদী স্লোগান ব্যবহার করেছিল। তাঁদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান ছিল—

জমি রক্ষার আহ্বান সংক্রান্ত AISA-এর পোস্টারগুলির মূল স্লোগানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল—

- "জমি রক্ষা কর, কৃষক বাঁচাও!"
- "আমাদের জমি আমাদের অধিকার, কেড়ে নিতে দেব না!"
- "শিল্পের নামে কৃষকদের উচ্ছেদ চলবে না!"

এগুলোর মাধ্যমে তারা স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছিল যে, জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ অন্যায় এবং কৃষকদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, AISA তাদের পোস্টারগুলিতে নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার দাবিকে প্রধান প্রতিপাদ্য করে তুলেছিল (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মার্চ ২০০৭)

AISA সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক পোস্টার প্রকাশ করে, যেখানে উল্লেখ ছিল—

- "শাসক নয়, দখলদার সরকার!"
- "রাজ্য সরকার হত্যা সরকার!"
- "পুলিশি দমন-পীড়ন মানি না, মানবো না!"

এই পোস্টারগুলিতে সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতিকে অন্যায় এবং দমনমূলক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিশেষ করে ১৪ মার্চ ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম গণহত্যার পর, AISA ব্যাপকভাবে এই পোস্টার প্রচার করে (গণশক্তি, ১৫ মার্চ ২০০৭)।

AISA তাদের পোস্টার ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে কৃষকদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে, যেমন—

- "নন্দীগ্রামের লড়াই, আমাদের লড়াই!"
- "কৃষকের পাশে ছাত্রসমাজ!"
- "শিক্ষা ও কৃষি একসূত্রে গাঁথা—কৃষকদের রক্ষা কর!"

এগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ছাত্রসমাজের একটি বড় অংশ সরাসরি কৃষকদের আন্দোলনে পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং এই সংহতির ভিত্তিতেই আন্দোলনকে বৃহত্তর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৬ মার্চ ২০০৭)।

AISA-এর পোস্টারগুলিতে শুধুমাত্র লেখা নয়, বিভিন্ন প্রতিবাদী চিত্রও ব্যবহার করা হতো, যেমন—

- পুলিশ লাঠিচার্জ করছে এমন চিত্র, যার নিচে লেখা থাকত— "শাসকের হাতে কৃষকের রক্ত!"
- একটি ধানখেতের ওপর ক্রস চিহ্ন দিয়ে লেখা— "উন্নয়ন নয়, ধ্বংস!"
- এক কৃষকের চোখে অশ্রু দেখিয়ে লেখা— "আমার জমি ফিরিয়ে দাও!"

এসব পোস্টার আন্দোলনকারীদের আবেগকে উদ্দীপ্ত করত এবং বৃহত্তর জনসমর্থন পেতে সাহায্য করত (আজকাল, ১৮ মার্চ ২০০৭)।

AISA-এর পোস্টারগুলি শুধু সরকারের নীতির সমালোচনা করেই থেমে থাকেনি, বরং তারা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনাও দিয়েছিল, যেমন—

- "নন্দীগ্রাম আবার হবে না!"
- "গণআন্দোলনই মুক্তির পথ!"
- "ছাত্রসমাজ প্রস্তুত, দমননীতি রুখে দাঁড়াও!"

এই ধরনের বার্তাগুলো ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে উদ্বুদ্ধ করেছিল (বার্তা, ১৯ মার্চ ২০০৭)। AISA-এর পোস্টার ও দেয়াল লিখন ছিল নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিবাদী

মাধ্যম। এসব পোস্টারে জমি রক্ষার আহ্বান, সরকারের সমালোচনা, পুলিশের দমননীতি প্রত্যাখ্যান, কৃষকদের সঙ্গে সংহতি এবং আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ স্পষ্ট ছিল। সংবাদপত্র ও সাক্ষাৎকারের তথ্য অনুযায়ী, এই পোস্টার প্রচারণা ছাত্রসমাজ ও বৃহত্তর জনগণের মধ্যে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

- সুতরাং AISA সংগঠনের প্রতিবাদ কর্মসূচীর মাধ্যমে নন্দীগ্রাম আন্দোলন প্রতিরোধমূলক আন্দোলন, ছাত্র-যুব নেতৃত্বাধীন সামাজিক আন্দোলন, বিকল্প উন্নয়ন দাবির আন্দোলন, এবং দমন-পীড়নবিরোধী আন্দোলন—এই চারটি রূপ ধারণ করে। এটি কেবল জমির লড়াই ছিল না; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের অংশ হয়ে ওঠে। আন্দোলনটি শুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি গণআন্দোলনের চরিত্র গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।

এআইডিএসও (DSO) সংগঠনের ভূমিকা

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এবার থেকে AIDSO বলবো) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সংগঠনটি মূলত বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী হলেও, তারা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে এবং কৃষকদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এই আন্দোলনগুলিতে DSO শুধু ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করেনি, বরং সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

সিঙ্গুর আন্দোলনে DSO-এর ভূমিকা

সিঙ্গুরে যখন টাটা মোটরসের কারখানা গড়ার জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হয়, তখন AIDSO প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে সরব হয়। তারা ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এই প্রকল্পের ফলে কৃষিজীবী মানুষদের জীবিকা নষ্ট হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় AIDSO সংগঠনটি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মিলে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সংগঠনের

সদস্যরা কলকাতার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে মিছিল, পথসভা ও পোস্টার প্রচারের মাধ্যমে ছাত্রদের সচেতন করার চেষ্টা করে। তারা ক্যাম্পাসে দেয়াল লিখন ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে কৃষকদের জমি রক্ষার আহ্বান জানায়। একজন প্রাক্তন AIDSO নেতা বলেন, *"আমরা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এই আন্দোলন শুধু জমি রক্ষার লড়াই নয়, এটি কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাই আমরা ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার পাশাপাশি গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মিটিং করেছি, তাদের অভিজ্ঞতা শুনেছি এবং বিকল্প উন্নয়নের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছি"।*

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে AIDSO দাবি করে যে, উন্নয়নের নামে কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না এবং বিকল্প শিল্পায়নের পথ খোঁজা দরকার। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, *"আমরা উন্নয়নের বিরোধী নই, কিন্তু কৃষকদের জীবনধারা ধ্বংস করে উন্নয়ন হতে পারে না। শিল্প স্থাপনের জন্য সরকারকে বিকল্প খুঁজতে হবে"।* ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন সরকার সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত করে এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি দমন-পীড়ন শুরু হয়, তখন AIDSO কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ সভা করে। তারা "সিঙ্গুর বাঁচাও, কৃষিজীবী বাঁচাও" শিরোনামে পোস্টার লাগিয়ে ছাত্রসমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলে। তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ছিল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জমায়েত, মানববন্ধন, গণস্বাক্ষর অভিযান এবং রেল ও রাস্তা অবরোধ। একজন DSO কর্মী জানান, *"আমরা বুঝতে পারছিলাম, শুধু রাজনৈতিক দল নয়, ছাত্রসমাজকেও সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই কারণেই আমরা ক্যাম্পাস থেকে প্রতিবাদ সংগঠিত করে রাস্তায় নেমেছিলাম"।*

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে DSO-এর ভূমিকা

নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় AIDSO আবারও প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায়।[50] ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে যখন পূর্ব মেদিনীপুরের SEZ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রশাসন জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন স্থানীয় কৃষকদের পাশাপাশি ছাত্রসমাজের মধ্যেও প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। AIDSO ছাত্রসমাজের মধ্যে

[50] DSO-এর পুরো নাম Democratic Students' Organisation (গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন)। এটি Socialist Unity Centre of India (Communist) [SUCI(C)]-এর ছাত্র সংগঠন হিসেবে কাজ করে।

ব্যাপক প্রচার চালিয়ে সরকারের ভূমিকার বিরোধিতা করে। এই সময় তারা শহরের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা, পোস্টার ক্যাম্পেইন ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। তাদের একাধিক পোস্টারে "নন্দীগ্রাম বাঁচাও, জমি অধিগ্রহণ রুখো" ধরণের স্লোগান দেখা যায়। আন্দোলনের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি ও প্রতিবাদ মিছিল হয়। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ, যখন নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চালনায় বহু মানুষ মারা যান ও আহত হন, তখন DSO কলকাতা, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, কৃষ্ণনগরসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত করে। আন্দোলনরত ছাত্ররা রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং কলেজ স্ট্রিট, ধর্মতলা, শিয়ালদহ ও বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল বের করে। একজন AIDSO কর্মী বলেন, *"নন্দীগ্রামের হত্যাকাণ্ড আমাদের আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, রাজ্যের বাম সরকার আর সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখছে না"।* প্রতিবাদের অংশ হিসেবে AIDSO শুধু বিক্ষোভ মিছিলই করেনি, বরং নন্দীগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য সহায়তা শিবির পরিচালনা করেছে এবং সেখানে খাদ্য ও ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছে। তাদের এক বিবৃতিতে বলা হয়, *"সরকারের এই বর্বরতা আমরা মেনে নেব না। সাধারণ মানুষকে দমন করে উন্নয়ন চাপিয়ে দেওয়া যায় না"।*

নন্দীগ্রামে AIDSO তাদের আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করতে বিভিন্ন পোস্টার, স্লোগান ও কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল। তাদের প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল ছাত্রসমাজকে সচেতন করা, গ্রামীণ কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো এবং রাজ্য সরকারের জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণের নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়া।

AIDSO-এর পোস্টারগুলিতে সাধারণত জমি রক্ষার আহ্বান জানানো হতো এবং সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হতো। পোস্টারে যে সমস্ত স্লোগান লেখা ছিল —

- *"জমি আমাদের অধিকার, কেড়ে নিতে দেব না!"* (গণদাবী, ১২ মার্চ ২০০৭)
- *"জোর করে জমি অধিগ্রহণ চলবে না, প্রতিরোধ গড়ে তুলুন!"* (গণদাবী, ১৫ মার্চ ২০০৭)
- *"শিল্প চাই, কিন্তু কৃষকের সর্বনাশ করে নয়!"*
- *"নন্দীগ্রামের রক্ত বৃথা যাবে না—সংগ্রাম চলবে!"*

এছাড়াও, পোস্টারে পুলিশের দমন-পীড়নের ছবি ও বর্ণনা দিয়ে সাধারণ জনগণের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছিল।

AIDSO নন্দীগ্রামের আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মসূচীতে সক্রিয় ছিল যেমন —

- মিছিল ও বিক্ষোভ: AIDSO ছাত্র সংগঠন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নন্দীগ্রামের গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ মার্চ ২০০৭)।
- প্রতীকী অবরোধ: ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় প্রতীকী অবরোধ করে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেছিল (গণদাবী, ১৫ মার্চ ২০০৭)।
- প্রচারপত্র বিলি: বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি করতে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয় (বর্তমান, ২০ মার্চ ২০০৭)।
- সংহতি সভা: নন্দীগ্রামের কৃষকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
- পথসভা ও নাটক: সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পথসভা ও রাজনৈতিক নাটকের আয়োজন করা হয় (বর্তমান, ২০ মার্চ ২০০৭)।

এভাবে, AIDSO তাদের প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ছাত্র সমাজের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করেছিল এবং বিকল্প উন্নয়নের দাবিতে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অর্থাৎ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে AIDSO-এর আন্দোলন কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যা পরবর্তীতে বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। DSO সংগঠন তাঁদের আন্দোলনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে:

- প্রতিরোধমূলক আন্দোলন – যেখানে জমি রক্ষার লড়াই সরাসরি সংঘাতের রূপ নেয়।
- ছাত্র-যুব নেতৃত্বাধীন সামাজিক আন্দোলন – যেখানে ছাত্রসমাজ বড় ভূমিকা পালন করে।

- বিকল্প উন্নয়নের দাবি – যেখানে তারা জোরপূর্বক শিল্পায়নের বিরোধিতা করে বিকল্প খোঁজার পক্ষে সওয়াল করে।
- পুলিশি দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ – যা সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে।
- সংহতির রাজনীতি – যেখানে ছাত্রসমাজ কৃষকদের লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনে AIDSO-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজ্য রাজনীতিতে ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব নতুনভাবে তুলে ধরে এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পথ নির্দেশ করে।

বামপন্থী অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাব

সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তারা শুধু শহরের বিক্ষোভ আয়োজন করেনি, বরং নন্দীগ্রামে গিয়ে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং আন্দোলনকে সুসংগঠিত করতে সহায়তা করে। উল্লেখযোগ্য সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (DSF), উই দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট (WTI), ফোরাম ফর আর্ট স্টুডেন্টস (FAS), এবং ইনডিপেন্ডেন্ট কনসলিডেশন (IC)।

ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (DSF): DSF ক্যাম্পাসে ছাত্রদের সংগঠিত করে এবং নন্দীগ্রামের কৃষকদের সঙ্গে আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করে। তারা মিছিল, ধর্না, এবং তহবিল সংগ্রহ করে আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। এক DSF নেতা বলেন—*"নন্দীগ্রামের মানুষের লড়াই আমাদের লড়াই। আমরা শুধু প্রতিবাদ করিনি, বরং কৃষকদের সঙ্গে গিয়েও কথা বলেছি, বুঝেছি তারা কী চায়"।* আন্দোলনের সময় DSF-এর এক সদস্য জানান *"পুলিশি দমন-পীড়নের খবর বাইরে না এলে সরকার সহজেই এটিকে ধামাচাপা দিত। আমরা শহর থেকে গ্রামে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম"।* DSF-এর পোস্টারে লেখা ছিল *"গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ চলছে! আমরা চুপ থাকব না!"* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ মার্চ ২০০৭)

উই দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট (WTI): WTI সংগঠনটি আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি করে এবং ক্যাম্পাসে সচেতনতামূলক আলোচনার আয়োজন করেছিল। তারা ক্যাম্পাসে চাঁদা তুলে নন্দীগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবারগুলোর সাহায্য পাঠায়। এক WTI সংগঠক বলেন— *"আমরা চাইনি আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক স্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকুক। আমরা চাইছিলাম মানুষ জানুক কীভাবে এই অন্যায় চলছে"।* আর এক WTI সদস্য বলেন— *"নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ শুধু কৃষকদের লড়াই নয়, আমাদের ভবিষ্যতের লড়াই, SFI কে বুঝতে হবে আর যায় হোক তারা বামপন্থীর কলঙ্ক"।* WTI-এর পোস্টারে লেখা ছিল *"উন্নয়ন মানে উচ্ছেদ নয়, নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও!"* (বর্তমান, ২০ মার্চ ২০০৭)

ফোরাম ফর আর্ট স্টুডেন্টস (FAS): FAS তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরে এবং ক্যাম্পাসে পোস্টার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এক FAS সদস্য বলেন— *"আমাদের তুলি প্রতিবাদের অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। আমরা ছবি এঁকে মানুষের সামনে বাস্তব সত্য তুলে ধরেছি।"* এক চিত্রশিল্পী ও আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী জানান *"পুলিশি দমন-পীড়নের দৃশ্যগুলো আমরা ক্যানভাসে তুলে ধরেছিলাম, যাতে মানুষ সত্যটা দেখতে পারে"।* FAS-এর পোস্টারে লেখা ছিল "*তোমার নাম আমার নাম সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম"* (আনন্দবাজার, ২২ মার্চ ২০০৭)।

ইনডিপেন্ডেন্ট কনসলিডেশন (IC): IC সংগঠনটি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রচার চালায়। তারা গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরব হয়। এক IC সদস্য বলেন— *"নন্দীগ্রামে সরকার যে গণতন্ত্র হত্যা করেছে, তা দেশের মানুষকে জানানো দরকার ছিল"।* আন্দোলনের সময় এক IC কর্মী বলেন—*"শুধু ক্যাম্পাসে নয়, রাস্তায় নেমেও আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে ছাত্রসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে"।* IC-এর পোস্টারে লেখা ছিল— *"১৪ মার্চ ভুলিনি, ভুলবো না!"* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ মার্চ ২০০৭)

DSF নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এবং জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নেয়। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল মিছিল, সভা এবং সেমিনারের আয়োজন, যেখানে তারা আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করত। WTI সংগঠনটি নন্দীগ্রাম আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা আন্দোলনের সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল পথনাটিকা, গান এবং কবিতার মাধ্যমে আন্দোলনের বার্তা প্রচার করা, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা

করে। FAS নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তাদের সৃজনশীল প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবদান রাখে। তারা পোস্টার, ব্যানার এবং অন্যান্য শিল্পকর্মের মাধ্যমে আন্দোলনের বার্তা প্রচার করে। তাদের শিল্পকর্মগুলি আন্দোলনের চেতনা ও উদ্দেশ্যকে তুলে ধরে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জাগিয়ে তোলে। IC নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। তারা বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা এবং প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনকে সমর্থন করে। তাদের উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন, যা আন্দোলনকারীদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে বলা যায় সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে এই ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধে যুক্ত করেছিল। তারা শুধুমাত্র প্রতিবাদ জানায়নি, বরং কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছিল। তাদের পোস্টার, মিছিল, প্রতিবাদ, শিল্পকর্ম এবং তহবিল সংগ্রহ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেছিল। এই সংগঠনগুলোর সক্রিয়তায় নন্দীগ্রামের আন্দোলন কেবলমাত্র জমি রক্ষার লড়াই না থেকে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে এক বৃহত্তর প্রতিরোধে পরিণত হয়। এই অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলি নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এবং জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাদের প্রচেষ্টা আন্দোলনের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

SFI সংগঠনের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া

SFI পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ছাত্র সংগঠন হিসেবে কাজ করত, ফলে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সময় তারা সরকারপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতাকারী অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের মতো আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও, তারা সরকারের শিল্পায়ন নীতির সমর্থনে প্রচার চালায়। SFI-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এই শিল্প স্থাপনের ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং এটি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও দ্বন্দ্ব: সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় SFI, শাসক দলের ছাত্র সংগঠন হিসেবে, তীব্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। একদিকে সরকারের শিল্পায়ন নীতির প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, অন্যদিকে ছাত্রসমাজের মধ্যে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ তাদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। SFI-এর অনেক কর্মী ও সমর্থক, বিশেষত যারা তৃণমূল স্তরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, জমি অধিগ্রহণের ঘটনাগুলি নিয়ে দ্বিধায় পড়েন। কিছু নেতা ও কর্মী প্রকাশ্যেই সরকারের নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, যা সংগঠনের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। একজন প্রাক্তন SFI নেতা বলেন, *"আমাদের অনেকেই মনে করেছিল, জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ করা উচিত নয়। আমরা চাইছিলাম, সরকার বিকল্প উপায়ে শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করুক। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্ব আমাদের অবস্থান বদলানোর সুযোগ দেয়নি"।* আরেকজন SFI কর্মী বলেন, *"আমরা বামপন্থী আদর্শের ছাত্র সংগঠন হিসেবে শোষিত শ্রেণির পক্ষে থাকার কথা বলি, কিন্তু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে আমরা সাধারণ কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে পারিনি। এতে আমাদের অনেক কর্মী হতাশ হয়েছিলেন এবং সংগঠনের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন"।*

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাপ ও প্রতিক্রিয়া: কলকাতা, যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে SFI-এর অবস্থান নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন যেমন TMCP, AISA, DSF, IC, WTI ইত্যাদি সংগঠনগুলি তাদের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ক্যাম্পাসে পোস্টার, সভা ও বিক্ষোভের মাধ্যমে SFI-এর নীতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলেন, *"SFI আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে শিল্পায়ন দরকার, কিন্তু আমরা দেখছিলাম, সেই শিল্পায়ন জোর করে কৃষকদের উচ্ছেদ করে আনা হচ্ছে। আমরা যখন প্রশ্ন তুলতাম, ওরা আমাদের তৃণমূলের দালাল 'বিরোধী শক্তি' বলে আক্রমণ করত"।* প্রেসিডেন্সি কলেজের এক প্রাক্তন শিক্ষার্থী বলেন, *"SFI আমাদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত। তারা কখনো বলত, সরকার ভালো করছে, আবার কখনো বলত, কিছু ভুল হয়েছে। এই দ্বৈত অবস্থান তাদের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দেয়"।*

রাজনৈতিক ও আদর্শগত চ্যালেঞ্জ: SFI সবসময় নিজেদের বামপন্থী আদর্শের ধারক-বাহক বলে দাবি করত। কিন্তু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঘটনাগুলি তাদের জন্য আদর্শগত সংকট তৈরি করে।

- একদিকে তারা শিল্পায়নের পক্ষে কথা বলছিল, যা বামফ্রন্ট সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল।

- অন্যদিকে, কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে তারা বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্র হিসেবে তুলে ধরছিল।

একজন SFI কর্মী বলেন, *"আমরা ক্যাম্পাসে বারবার বলেছি যে শিল্পায়ন দরকার, কিন্তু আন্দোলনকারীদের হত্যা করা সমর্থনযোগ্য নয়। অনেক কর্মী তখন সংগঠন থেকে সরে যেতে শুরু করেন"*। একজন প্রাক্তন SFI জেলা কমিটির সদস্য বলেন, *"নন্দীগ্রামের ঘটনার পর আমরা সাধারণ ছাত্রদের বোঝাতে পারিনি যে আমরা সত্যিই ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি। বরং আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা শুধুই সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছি"*। SFI-এর জন্য সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন একটি কঠিন সময় ছিল। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন হওয়ায় তাদের অবস্থান ছিল সরকারের পক্ষে, কিন্তু সেই অবস্থান শিক্ষার্থী ও সমাজের বড় অংশের মধ্যে প্রশ্নের মুখে পড়ে। অভ্যন্তরীণ বিরোধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাপ, রাজনৈতিক-আদর্শগত চ্যালেঞ্জ—এসব কারণে তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং পরবর্তী সময়ে তাদের সংগঠনের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে।

SFI-এর অবস্থান ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ গুলির নিম্নরুপ

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন শিল্পায়ন বনাম কৃষিজীবনের এক জটিল দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে আসে। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন হিসেবে **SFI** একদিকে সরকারের শিল্পায়ন নীতির সমর্থক ছিল, অন্যদিকে শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের বিরোধিতার মুখেও পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে তীব্রভাবে বৈপরীত্য তৈরি করে।

SFI-এর যুক্তি: শিল্পায়ন বনাম প্রতিরোধ: SFI নেতারা দাবি করেন, *"শিল্পায়ন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমরা চাই, কৃষি ও শিল্প পাশাপাশি চলুক। নন্দীগ্রামে যে সহিংসতা ঘটেছে, তা দুঃখজনক, তবে এর জন্য আন্দোলনকারীরাও দায়ী"*। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, SFI শিল্পায়নকে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য মনে করত। তারা বিশ্বাস করত, শিল্পের বিকাশ ছাড়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তবে, তারা নন্দীগ্রামের সহিংসতার জন্য আন্দোলনকারীদেরও দায়ী করে, যা তাদের অবস্থানকে আরও বিতর্কিত করে তোলে। একজন প্রাক্তন SFI কর্মী বলেন, *"আমরা একদিকে কৃষকদের স্বার্থ বুঝতে চাইছিলাম, আবার সরকারের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তাও বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি এতটা*

জটিল হয়ে উঠেছিল যে, মাঝেমধ্যে নিজেদের অবস্থানও দ্বিধাগ্রস্ত মনে হতো"। এই বক্তব্যে SFI-এর ভেতরে চলমান মতাদর্শগত সংকট ধরা পড়ে। তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধে না গিয়ে এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিল, যা শিক্ষার্থী মহলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের প্রতিক্রিয়া তীব্র বিরোধিতা: SFI-এর অবস্থানের বিপরীতে AISA, DSF, IC, WTI এবং FAS-এর মতো ছাত্র সংগঠনগুলো সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করে। তারা মনে করত, এই শিল্পায়ন পরিকল্পনা শুধুমাত্র বৃহৎ কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করছে এবং কৃষকদের জীবন ধ্বংস করছে। AISA-এর এক নেতা বলেন, *"যে সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে, তারাই কৃষকদের উচ্ছেদ করছে। SFI-এর মতো সংগঠন এই অন্যায়ের পক্ষ নিচ্ছে, যা বামপন্থী রাজনীতির আত্মঘাতী পথ"।* DSF-এর এক ছাত্রনেতা বলেন, *"আমরা SFI-কে প্রশ্ন করেছিলাম, তারা কিসের শিল্পায়ন চাইছে? যেখানে কৃষকদের হত্যা করা হচ্ছে, সেখানে কীভাবে তারা এই নীতি সমর্থন করে? তারা কখনোই এর জবাব দিতে পারেনি"।* FAS-এর পোস্টারে লেখা ছিল, *"নন্দীগ্রামে রক্ত ঝরছে, আমরা কীভাবে নিশ্চুপ থাকি?"* যা স্পষ্টতই SFI-এর নীতির প্রতি প্রশ্ন তোলে। তারা মনে করত, শিল্পায়নের নামে শাসক দল কৃষকদের অধিকার হরণ করছে এবং SFI তাদের সমর্থন করেই ছাত্রসমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

রাজনৈতিক ও আদর্শগত দ্বন্দ্ব: SFI-এর শিল্পায়ন নীতির সমর্থন এবং বিরোধীদের 'অরাজক' বলে দোষারোপ করার প্রবণতা তাদের আদর্শগত অবস্থানকে দুর্বল করে তোলে। একদিকে তারা শ্রমজীবী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার কথা বলছিল, অন্যদিকে বাস্তবে জমি অধিগ্রহণের ফলে কৃষকদের উচ্ছেদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছিল। একজন DSF নেতা বলেন, *"SFI নিজেদের মধ্যেই দ্বিধায় ভুগছিল। তাদের অনেক কর্মী ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু তারা সংগঠনের আনুগত্য বজায় রাখতে বাধ্য হন"।* এরফলে SFI-এর এই অবস্থান শিক্ষার্থী মহলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়ে।

অর্থাৎ, SFI শিল্পায়নের নীতি সমর্থন করলেও তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপক বিরোধিতার মুখে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, AISA, DSF, FAS-এর মতো সংগঠনগুলোর দৃঢ় প্রতিবাদ এবং কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির কারণে তারা ছাত্রসমাজের মধ্যে

গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ফলে, নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় SFI ক্রমশ ছাত্র রাজনীতিতে প্রভাব হারাতে থাকে, যা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের গতিপথকেও প্রভাবিত করে।

SFI-এর কর্মসূচী গুলির নিম্নরুপ

শিল্পায়ন নীতির পক্ষে প্রচার: SFI সরকারের শিল্পায়ন নীতিকে সমর্থন করে যুক্তি দেয় যে, এটি রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিভিন্ন ছাত্রসভা, সেমিনার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে। একজন SFI নেতা বলেন,*”আমরা মনে করতাম, টাটার মতো সংস্থার বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে বের করে আনবে। আমাদের প্রচারে এই দিকটাই তুলে ধরা হয়েছিল”।* তবে, এই প্রচার শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্যাশিত সাড়া পায়নি। কারণ, আন্দোলনের সময় জমি হারানোর প্রশ্নটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, শিল্পায়নের সুফল নিয়ে আলোচনায় শিক্ষার্থীরা আগ্রহ দেখায়নি।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার ও দ্বন্দ্ব: SFI কিছু ক্ষেত্রে আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার চালায়, যেখানে তারা আন্দোলনকারীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তারা দাবি করে যে, আন্দোলনের ফলে রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং এটি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। একজন SFI কর্মী বলেন, “*আমরা দেখছিলাম, বিরোধীরা শুধু আন্দোলনের নাম করে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা উন্নয়ন বন্ধ করতে চাইছিল”।* তবে, এই অবস্থান শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। বিশেষ করে, অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে AISA, DSF, IC, WTI-এর ছাত্ররা SFI-এর এই অবস্থানকে ‘অসাংবেদনশীল’ বলে নিন্দা করে। একজন DSF নেতা বলেন, *“শিল্পায়ন যদি কৃষকের রক্তের বিনিময়ে হয়, তবে সেটাকে উন্নয়ন বলা যায় না। SFI শুধু সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের কষ্ট বুঝতে পারেনি”।* এটি SFI-এর জন্য বড় এক সংকট তৈরি করে, কারণ ঐতিহ্যগতভাবে তারা বামপন্থী ছাত্র সংগঠন হওয়ায় সাধারণত শ্রমজীবী মানুষের পক্ষেই কথা বলে। কিন্তু এখানে তারা সরকারের নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে নিজেদের আদর্শগত অবস্থান দুর্বল করে ফেলে।

রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংকট: নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনের ফলে SFI-এর রাজনৈতিক ও আদর্শগত অবস্থান বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। একদিকে, তারা সরকারের নীতিকে সমর্থন করছিল, অন্যদিকে, সাধারণ ছাত্রসমাজের বিরোধিতার মুখে পড়ছিল। একজন প্রাক্তন SFI কর্মী বলেন, *"বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারছিলাম না। একদিকে সরকারের পক্ষ নেওয়া, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের চাপ—এতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম"।* অন্যদিকে, AISA, DSF, FAS-এর মতো সংগঠনগুলোর সক্রিয় ভূমিকা ও কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশের কারণে SFI ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলো এই ইস্যুকে "কৃষিজীবী বনাম শিল্পপুঁজির সংঘাত" হিসেবে ব্যাখ্যা করছিল, যেখানে SFI-এর অবস্থানকে শিল্পপুঁজির পক্ষ হিসেবে দেখানো হয়। ফলে, বামপন্থী ছাত্ররাজনীতির একটি নতুন মেরুকরণ তৈরি হয়। অর্থাৎ, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় SFI-এর বিতর্কিত অবস্থান তাদের সংগঠনকে দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল করে তোলে। তারা একদিকে শিল্পায়ন ও উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান নিয়ে সরকারপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়, অন্যদিকে আন্দোলনরত ছাত্র ও কৃষক সমাজের ব্যাপক সমর্থন হারিয়ে ফেলে। এই সংকট পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনেও তাদের অবস্থানকে দুর্বল করে এবং পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির নতুন মেরুকরণের ভিত্তি গড়ে তোলে।

পরিশেষে

এই অধ্যায়ের শেষে এসে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও বর্ণনা থেকে যে সমস্ত বিশ্লেষণ উঠে এসেছে তা আপাতত এই অধ্যায়ের প্রত্যেক প্রশ্ন ও উদ্দেশ্যকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণের নিম্নরুপ –

ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ও তাত্ত্বিক দিক থেকে ফিলিপ জি. অল্টব্যাক (Philip G. Altbach)-এর "Student Politics in Comparative Perspective" অনুসারে, ছাত্র আন্দোলন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলোর সাথে একীভূত হয়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা এই তত্ত্বের সাথে মিলে যায়, যেখানে তারা কেবলমাত্র কৃষক আন্দোলনের সহায়ক হয়নি, বরং একটি স্বাধীন রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে।

ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রবাহ: পিয়ের বুর্দিয়ু (Pierre Bourdieu) ছাত্রদের রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে "Cultural Capital" বা সাংস্কৃতিক পুঁজি হিসেবে দেখিয়েছেন, যা তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছে। ইতিহাসে দেখা গেছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন গণআন্দোলনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যেমন - স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন), নকশাল আন্দোলন (১৯৬০-৭০-এর দশক), জেপি আন্দোলন (১৯৭৪-৭৫, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে), সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন (২০০৬-২০০৮, জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে) এক্ষেত্রে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নতুন ধারা হলো "শহর-কেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রত্যক্ষ গ্রামীণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ"। আগে ছাত্র আন্দোলন সাধারণত শিক্ষার্থীদের সমস্যা (যেমন শিক্ষা, বৃত্তি, কর্মসংস্থান) কেন্দ্রিক ছিল, কিন্তু এই আন্দোলনে শিক্ষিত ছাত্রসমাজ সরাসরি কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে এসেছে। অ্যান্টোনিও গ্রামশি (Antonio Gramsci)-র "Counter-Hegemony" ধারণা অনুসারে, ছাত্র আন্দোলন তখনই শক্তিশালী হয় যখন তারা রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন শ্রেণির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। যেমন - সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে AISA, DSF, FAS, IC-এর মতো সংগঠন সরাসরি সরকারের শিল্প নীতির বিরোধিতা করেছে। SFI-এর মতো শাসক দলের ছাত্র সংগঠনও দ্বিধার মধ্যে পড়েছে, যা "Ideological Crisis" তৈরি করেছে। এই অধ্যায়ে যে বিষয় উঠে আসলো তা হল সাধারণত ছাত্র সংগঠনগুলো কেবল ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, কিন্তু এই আন্দোলন দেখিয়েছে যে ছাত্ররা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও বৃহৎ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

এডওয়ার্ড শিলস (Edward Shils) তার "Active Public Participation" তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, ছাত্র রাজনীতি সমাজের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে, যেখানে ছাত্ররা শিল্পায়ন বনাম কৃষিজীবনের দ্বন্দ্ব নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলেছে। অর্থাৎ এই আন্দোলন ছাত্র সমাজের মধ্যে "Grassroots Democracy" ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। শহুরে ছাত্ররা সরাসরি গ্রামীণ কৃষকদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, যা আগে খুব কম দেখা গেছে।

"Disruptive Politics" ও প্রতিবাদের নতুন রূপ: সিডনি টারো (Sidney Tarrow) তার "Power in Movement" তত্ত্বে দেখিয়েছেন, ছাত্র আন্দোলন শুধু দাবি আদায়ের লড়াই নয়, এটি রাজনৈতিক

ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ছাত্ররা মিছিল, পথনাটক, পোস্টার ক্যাম্পেইন, প্রতীকী অনশন, ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন চালিয়েছে, যা আন্দোলনের প্রচার বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্দোলনের সময় "প্রতীকী প্রতিবাদ" (Symbolic Protest) যেমন: কালো ব্যাজ, লাল পতাকা, গণস্বাক্ষর অভিযান—এইসব কৌশল শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। এই গবেষণায় ছাত্র আন্দোলন এখন শুধু শারীরিক প্রতিবাদ নয়, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিজ্যুয়াল আর্ট ও কালচারাল প্রতিরোধের মাধ্যমে আরও বিস্তৃত হয়েছে।

রাষ্ট্র ও ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া: মিশেল ফুকোর দৃষ্টিকোণ: মিশেল ফুকো (Michel Foucault) তার "Discipline and Punish" তত্ত্বে বলেছেন, রাষ্ট্রশক্তি কেবল বাহ্যিক দমন-পীড়ন চালায় না, বরং জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেও চায়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে পুলিশি দমন-পীড়ন (১৪ মার্চ, নন্দীগ্রামে গুলি চালানো, ছাত্রদের গ্রেপ্তার, ক্যাম্পাসে নজরদারি) ফুকোর এই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রতিফলিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক আলোচনা দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনাতে আমরা দেখলাম ছাত্র আন্দোলন কেবল রাস্তার প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি রাষ্ট্রের দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। গণতান্ত্রিক কাঠামো ও বিরুদ্ধ রাজনীতি: হাবারমাসের দৃষ্টিভঙ্গি: যুর্গেন হাবারমাসের "Deliberative Democracy" তত্ত্ব অনুযায়ী, গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ তখনই বিকশিত হয়, যখন জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে এই গণতান্ত্রিক আলোচনা হয়নি, বরং সরকার ও প্রশাসনের একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে, জনগণ রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হয়, যা হাবারমাসের তত্ত্ব অনুযায়ী গণতন্ত্রের ব্যর্থতা নির্দেশ করে।

বিকল্প উন্নয়ন মডেলের প্রয়োজনীয়তা: অমর্ত্য সেন তার "Development as Freedom" তত্ত্বে বলেছেন, প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তা মানুষের ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত হয়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে উন্নয়ন পরিকল্পনা জনগণের জীবনমান উন্নয়নের চেয়ে বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল, যা সেনের "Capabilitarian Approach"-এর পরিপন্থী। গ্রামশি তার "Hegemony and Passive Revolution" ধারণায় দেখিয়েছেন, সরকার পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন একটি বিদ্যমান রাজনৈতিক শক্তি জনগণের সমর্থন হারায় এবং নতুন একটি শক্তি জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম

আন্দোলনের সময় বামফ্রন্ট সরকার তাদের ঐতিহ্যগত কৃষক-শ্রমিক ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস এই শূন্যস্থান পূরণ করে এবং "বিকল্প জনসমর্থন" গড়ে তোলে, যা ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পতনের কারণ হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন দেখিয়েছে যে রাজনৈতিক শক্তি পরিবর্তন শুধুমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটে না, বরং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

এই অধ্যায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন ছিল রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ, যেখানে ছাত্রসমাজ আন্দোলনের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করেছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই আন্দোলনকে আরও জটিল করে তুললেও, এটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভবিষ্যতের সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইগুলির জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন: প্রতিক্রিয়া ও তার প্রভাব সম্পর্কে বাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেই আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র এবং বেকার যুব সমাজের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ কিভাবে বেড়েছে ও তাঁর প্রভাব কি, শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুর্নীতির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং এর ফলে শিক্ষার মান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও রাজনীতির উপর কী প্রভাব পড়বে, এর ফলে ছাত্র আন্দোলনের ধরন ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিশিষ্টগুলি ধারা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ধারা বা গতিপথের বিভিন্ন বিষয়গুলি আরও প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ বেড়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন: ছাত্র আন্দোলন ও তার প্রভাব

> *"When corruption seeps into education, it does not merely deny opportunities; it erodes trust, shatters dreams, and dismantles the foundation of a just society. A nation that compromises on education ultimately compromises on its own future."* — Amartya Sen *(Development as Freedom, 1999)*

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলন বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আগের অধ্যায়ে এই গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন কৃষিজীবী সমাজের প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ছাত্র ও যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের দাবিতে সংগঠিত প্রতিরোধের আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। সেই আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা যেমন রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, তেমনি রাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর হয়ে উঠেছিল। সেই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকরি নিয়োগের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনও এক নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের জন্ম দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, বিশেষত স্কুল সার্ভিস কমিশন ও প্রাথমিক শিক্ষার চাকরি নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল হতাশার জন্ম দেয়। এই হতাশা ধীরে ধীরে ক্ষোভে রূপ নেয় এবং ছাত্রসমাজ সরাসরি রাস্তায় নেমে আসে। যেমন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন জমি ও জীবিকার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনও ছাত্র ও যুব সমাজের ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলন শুধুমাত্র স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার দাবি নিয়ে গড়ে উঠেছে সেটা নয়, এটি রাজ্য রাজনীতির অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন রেখেছে। এই আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ এটি শুধুমাত্র চাকরির দাবিতে সংঘটিত একটি প্রতিবাদ নয়, এই প্রতিবাদ শিক্ষার গুণগত মান, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এক জটিল চিত্রকে তুলে ধরে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি কীভাবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা কীভাবে ছাত্র ও যুবসমাজকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা জরুরি। নিয়োগ প্রক্রিয়ার অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব শিক্ষার প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষার্থীরা একদিকে যখন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে, তখন অন্যদিকে অর্থ ও রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তির অভিযোগের ঘটনা তাদের মধ্যে এক গভীর বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি করছে। এই বঞ্চনা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং এটি সমষ্টিগত ক্ষোভে পরিণত হয়ে একটি বৃহত্তর আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্নীতি চাকরি প্রার্থীদের সাথে সাথে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। যোগ্যতার বদলে অনিয়মিত পদ্ধতিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি ঘটাচ্ছেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এই অধ্যায়ে মূলত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাখাতে চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করবো। এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হবে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও প্রভাবের বিষয় মাথায় রেখে। আমি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো – প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতি বিরোধী অভিযোগ গুলির পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারনে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে। দ্বিতীয়ত এই আন্দোলণের প্রেক্ষাপটে কারা কারা সরাসরি ভুক্তভোগী বা আন্দোলনের বিভিন্ন ভুমিকায় জড়িত ছিল। যেমন – চাকরি প্রার্থী, প্রশাসন ও সরকার, এদের বক্তব্য কি এবং কেমন ছিল ইত্যাদি বলবো। তার পরের অংশে আমি আলোচনা করবো যে পার্টি সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ, নীতি নিয়ে এবং এর মাধ্যমে কিভাবে সরকার এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভুমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করবো। এই আলোচনা করার পর এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এর পর আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই চাকরি দুর্নীতি আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানা ভুমিকা পালন করেছিল। এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারণা প্রদান করেছে সেই বিষয়গুলিও আলোচনা করবো।

চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি, আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট

চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে উঠে এসেছে। শিক্ষাখাতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ এবং যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত হওয়ার অভিজ্ঞতা—এসব বিষয় আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে। বিশেষত, এসএসসি[51] ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায় অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি,

[51] স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, যা রাজ্যের সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্বে নিযুক্ত। এটি মূলত পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৯৭ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীনে পরিচালিত হয়।

আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাব—এসব কারণে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের জন্ম দেয়। এই অসন্তোষ ধীরে ধীরে আন্দোলনে রূপ নেয়, যেখানে বঞ্চিত পরীক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করে।

শিক্ষা একটি সমাজের মৌলিক কাঠামো এবং উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কিন্তু যখন শিক্ষাখাতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রবেশ করে, তখন তা কেবল শিক্ষার গুণগত মানকে ব্যাহত করে না; বরং এটি সামগ্রিক সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে এসএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব, ঘুষ লেনদেন এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগ গুলি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পরিবর্তে টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়া, অবৈধ সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বনের মতো ঘটনাগুলি শিক্ষার্থী ও বেকার যুবসমাজের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে (আনন্দবাজার ৩১ মে ২০২২)। এই ধরনের দুর্নীতি কেবল মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের অধিকার কেড়ে নেয় না এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার মানকে নিম্নগামী করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা দুর্বল করে দেয়। পাশাপাশি, শিক্ষাখাতে দুর্নীতির প্রসার তরুণদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বাড়িয়ে তুলছে, যা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার রূপ নিচ্ছে। বিশেষত ছাত্র সংগঠনগুলো এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা যদি গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর চোখ রাখি তাহলে একটি দ্বৈত পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি। একদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটেছে—শিক্ষাপ্রবেশের হার বেড়েছে, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং সরকারি শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন এসেছে। অন্যদিকে, প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার দুর্নীতি শিক্ষার গুণগত মান এবং সমাজের আস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিশেষ করে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির কারণে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি শুধু শিক্ষার মান নিম্নগামী করেনি, বরং তা সমাজের বৃহত্তর সামাজিক গতিশীলতাকেও ব্যাহত করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসারের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকার শিক্ষামূলক প্রকল্প ও সামাজিক উন্নয়নমূলক নীতি গ্রহণ করে, যার ফলে শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত হয় এবং বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রবেশাধিকারের বিস্তার ঘটেছিল। তবে, এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, শিক্ষাখাতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়, যা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, যা শিক্ষার মান, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ২০১২ সালে শুরু হওয়া 'এসএসসি নিয়োগ কেলেঙ্কারি' এর অন্যতম উদাহরণ, যেখানে রাজনৈতিক প্রভাব, আর্থিক লেনদেন ও প্রশাসনিক অসৎ উপায় ব্যবহারের মাধ্যমে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, মেধাবী প্রার্থীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং শিক্ষার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষাখাতে রাজনৈতিক দুর্নীতির বিস্তার রাজ্যের প্রশাসনিক দুর্বলতাকে স্পষ্ট করেছে। ক্ষমতাসীন দলগুলো নিজেদের সমর্থকদের চাকরি পাইয়ে দিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে, যা শিক্ষাকে রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এর ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশাসনের প্রতি আস্থাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে (আনন্দবাজার ০১ আগস্ট ২০২২)। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে শিক্ষার্থীরা 'এসএসসি নিয়োগ কেলেঙ্কারি'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে, যার মাধ্যমে তারা স্বচ্ছ নিয়োগ, দুর্নীতির তদন্ত এবং মেধাভিত্তিক চাকরির দাবি তোলে। তবে এই আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষার সংকটকে চিহ্নিত করেনি, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাকেও বাড়িয়ে তুলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির সামাজিক প্রভাব গভীর ও বহুমাত্রিক। মেধার অবমূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের হতাশ করে তুলছে, যা সমাজে আস্থাহীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত প্রশাসনিক সংস্কার এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপই শিক্ষার মান অবনতির প্রধান কারণ, যা আগের গবেষণাগুলিতে উপেক্ষিত ছিল। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রশাসনিক ও নীতিগত পরিবর্তন অপরিহার্য, যা একটি স্বচ্ছ ও ন্যায়সংগত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন এসএসসি এর নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতার শিকার। সমীরণ দাশগুপ্তা তার গবেষণা *পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রশাসন ও রাজনৈতিক প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ।* দেখিয়েছেন যে, দুর্নীতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক বৈষম্যও তৈরি করছে (দাশগুপ্তা ২০২০:১২৩)। অর্পণ সেন *শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ছাত্র আন্দোলন: সমসাময়িক বিশ্লেষণ* গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর হস্তক্ষেপ এটি একটি কৌশলগত রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা প্রশাসনিক সংস্কারকে ব্যর্থ করছে (সেন ২০২২:৯৮)। এই গবেষণায় আরও দেখানো হয়েছে যে, এই রাজনৈতিক প্রভাব শুধুমাত্র নিয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শিক্ষাখাতের বাজেট বরাদ্দ ও প্রশাসনিক নীতিতেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিনয় ঘোষ তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, 'এই আন্দোলন শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়িয়ে তুলেছে এবং ভবিষ্যতে আরও সংগঠিত প্রতিরোধের সম্ভাবনা তৈরি করছে' (ঘোষ ২০২৩:৭৫)। এই গবেষণায় দেখা গেছে

যে, এই আন্দোলন কেবলমাত্র দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ সংস্কারের দাবিও উত্থাপন করছে, যা আগের গবেষণাগুলিতে পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। সৌমিত্র রায় *রাজনীতি ও প্রশাসনের দ্বন্দ্ব: শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভাব* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে না, বরং এটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে (রায় ২০১৯:৬০)। এই গবেষণায়ও উঠে এসেছে যে, নিয়োগ দুর্নীতি শিক্ষার মানকে দুর্বল করছে এবং সমাজের মধ্যে আস্থাহীনতা ও ক্ষোভ তৈরি করছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি, প্রশাসনিক সংস্কার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাখাতে চাকরি সংক্রান্ত দুর্নীতি একটি জটিল সমস্যা, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও সামাজিক অবিচার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাবের ব্যাপ্তি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক আলোচনা করেছেন। অর্পণ সেন দেখিয়েছেন, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে হস্তক্ষেপ করে (সেন ২০২২:৯৮), নিজেদের সমর্থকদের অগ্রাধিকার দেয়, যা ২০১৬ সালের এসএসসি স্ক্যাম -এর মতো ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে[52]। বর্তমান গবেষণায় এই রাজনৈতিক প্রভাবের গভীরতা আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। দেখা গেছে, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী স্বার্থ রক্ষার জন্য নিয়োগ বোর্ডকে প্রভাবিত করে এবং দলীয় সদস্যদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। প্রশাসনিক দুর্বলতাও দুর্নীতির বিস্তারে বড় ভূমিকা রাখে। দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, প্রশাসনিক তদারকির অভাব এবং রাজনৈতিক চাপে কর্তৃপক্ষের নতি স্বীকার করাই স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার অন্যতম অন্তরায় (দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১:১৫০)। এই দুর্নীতি শুধুমাত্র মেধাবী প্রার্থীদের বঞ্চিত করছে না, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে আস্থার সংকট সৃষ্টি করেছে। ফলে, শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে এবং সমাজে দীর্ঘমেয়াদী বৈষম্য তৈরি হচ্ছে, যা একটি সাংগঠনিক সংস্কারের জরুরি প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী গবেষকদের অভিমতের সঙ্গে বর্তমান গবেষণার মিল ও অমিল উভয়ই বিদ্যমান। বেশিরভাগ গবেষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রধান কারণ হিসেবে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছেন, যা এই গবেষণাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, এই গবেষণায় আরও গভীরভাবে দেখানো হয়েছে যে, এই দুর্নীতি কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদে সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এই গবেষণায় উঠে এসেছে যে, রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক দুর্বলতা একসঙ্গে কাজ করে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে মেধাবীদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে আস্থার সংকট সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি, এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে এবং শিক্ষার মানের অবনতির মাধ্যমে সমাজের বিস্তৃত পরিসরে প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত

[52] SSC Scam হল পশ্চিমবঙ্গের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) মাধ্যমে শিক্ষক ও স্কুল কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির একটি বড় কেলেঙ্কারি, যেখানে ঘুষ, রাজনৈতিক সুপারিশ ও মেধা তালিকায় কারচুপি করে অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

হয়েছে। এটি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের হতাশা প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিকে সামনে নিয়ে আসছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও মেধার মূল্যায়ন নিশ্চিত করা শুধু শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বরং এটি সামগ্রিক সামাজিক সুবিচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরাসরি ভুক্তভোগী বা আন্দোলনের বিভিন্ন স্টেকহোলডারদের ভূমিকা

চাকরি দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মূলত ভুক্তভোগী চাকরি প্রার্থীরা, যারা যোগ্যতা থাকার পরও দুর্নীতির কারণে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষারত হাজারো প্রার্থী, অকৃতকার্য কিন্তু আর্থিক বা রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে চাকরি পাওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ফলে, এই আন্দোলন কেবল ব্যক্তিগত বঞ্চনার নয়, বরং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রশ্নে বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্টেকহোলডার ছিলেন নাগরিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সক্রিয় গোষ্ঠীগুলো ও ক্ষুব্ধ অভিভাবকরাও এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংবাদমাধ্যমের সক্রিয়তা ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচার আন্দোলনের বিস্তারে বড় ভূমিকা রাখে, যার ফলে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হয়। অন্যদিকে, সরকারি প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও আন্দোলনের গতিপ্রবাহ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সরকারি পক্ষ প্রথমদিকে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করলেও, ক্রমাগত আইনি লড়াই ও জনমতের চাপে প্রশাসনকে দুর্নীতির স্বীকারোক্তি দিতে হয়। আদালতের হস্তক্ষেপ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। সব মিলিয়ে, ভুক্তভোগী চাকরি প্রার্থীদের ন্যায়বিচারের দাবি, ছাত্র সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সংহতি, সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার সমন্বিত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলন এক দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নেয়।

চাকরি প্রার্থীদের ভূমিকা ও প্রভাব

পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে চাকরি প্রার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যা রাজ্যের প্রশাসন ও শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা খাতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে চাকরি প্রার্থীরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এসএসসি, প্রাথমিক টেট এবং গ্রুপ-ডি নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে, যা শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। চাকরি প্রার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে এই বিষয়টি রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের ফলে আদালত বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে এবং সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

দিয়েছে। এর ফলে অনেক অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী চাকরি হারিয়েছেন বা হারানোর মুখে রয়েছেন। এছাড়া, প্রশাসনকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাধ্য করা হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে চাকরি প্রার্থীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে এসএসসি এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ২০২২ সালের ১৯শে মে, কলকাতার ময়দানে চাকরি প্রার্থীরা অনশন শুরু করে, যা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মে ২০২২)। ২০২৩ সালের ২রা জানুয়ারি, নিয়োগ-প্রার্থীরা শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে (এই সময়, ৩ জানুয়ারি ২০২৩)। ২০২৩ সালের ১০ই মার্চ, প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীরা বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং সরকারি পদক্ষেপের দাবি জানান (সংবাদ প্রতিদিন, ১১ মার্চ ২০২৩)। নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মতামত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণমূলক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

২০২২ সালের ১৯শে মে, কলকাতার ময়দানে চাকরি প্রার্থীরা অনশন শুরু করেন। আন্দোলনকারী রাজু ঘোষ (একজন এসএসসি চাকরি প্রার্থী) বলেন, *"আমরা দিনের পর দিন রাস্তায় বসে রয়েছি, অথচ সরকার কোনো সদুত্তর দিচ্ছে না। অনশন ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই"।* (আনন্দবাজার পত্রিকা ২০ মে ২০২২)। রাজুর এই বক্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে, চাকরি প্রার্থীদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে আন্দোলন অনশন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার একটি প্রতিক্রিয়া। ২০২৩ সালের ২রা জানুয়ারি, চাকরি প্রার্থীরা শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আন্দোলনে থাকা সুমিতা দাস বলেন, *"আমরা শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষা ভবনের সামনে এসেছিলাম, কিন্তু পুলিশ আমাদের লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আমাদের কী অপরাধ? আমরা কি শুধু আমাদের ন্যায্য চাকরির দাবিই জানাচ্ছিলাম না"?* সুমিতার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, আন্দোলনকারীরা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ করছিলেন, কিন্তু প্রশাসনিক দমনপীড়ন তাঁদের আন্দোলনকে আরও ক্ষোভপূর্ণ করে তোলে। ২০২৩ সালের ১০ই মার্চ, বিকাশ ভবনের সামনে চাকরি প্রার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আন্দোলনকারী অভিষেক মিত্র বলেন, *"এই দুর্নীতির কারণে আমরা কয়েক বছর ধরে চাকরি পাইনি। অথচ আমরা মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। সরকারের উচিত আমাদের পাশে দাঁড়ানো, কিন্তু তারা আমাদের লাঠিচার্জ করছে"!* অভিষেকের বক্তব্য স্পষ্ট করে যে, আন্দোলনটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ নয়, বরং এটি বঞ্চিত তরুণদের জন্য একটি ন্যায়বিচারের লড়াই।

এই সাক্ষাৎকারগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রশাসনিক উদাসীনতা, দমনমূলক প্রতিক্রিয়া এবং চাকরি প্রার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির মধ্যে একটি সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ। আন্দোলনকারীদের মতে, এই কর্মসূচিগুলো কেবল তাঁদের চাকরির দাবির জন্যই ছিল না, বরং প্রশাসনের

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নও এতে জড়িয়ে ছিল। এরপরও আন্দোলন থেমে থাকেনি। ২০২৩ সালের ২১শে জুলাই, ৬০০ দিন পূর্ণ হয় এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের অবস্থান আন্দোলনের, যা দেশের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় (টাইমস অফ ইন্ডিয়া ২২ জুলাই ২০২৩)। ২০২৩ সালের ৫ই অক্টোবর, চাকরিপ্রার্থীরা রাজভবন অভিযানের ডাক দেন, যেখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং কয়েকজন আন্দোলনকারী আহত হন (দ্য টেলিগ্রাফ, ৬ অক্টোবর ২০২৩)। ২০২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি, তাঁদের একাংশ মহাকরণ ঘেরাওয়ের চেষ্টা করেন এবং পুলিশি হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হন (এই সময়, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪)। নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। আন্দোলনকারীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে এই ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তাঁদের ধৈর্য, হতাশা, ক্ষোভ এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে আন্দোলনকে ধারাবাহিকভাবে চালিত করেছে। এই দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান আন্দোলনের বিষয়ে সৌমিত্র পাল (একজন আন্দোলনকারী) বলেন, *"আমরা দিনের পর দিন রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে এখানে বসে আছি। তবু সরকার আমাদের কথা শুনছে না। ৬০০ দিন হয়ে গেল, কিন্তু এখনও আমরা ন্যায়বিচার পাইনি"।* সৌমিত্রের বক্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে, আন্দোলনটি শুধুমাত্র একটি প্রতিবাদ ছিল না, বরং এটি বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের জন্য একটি মানসিক ও সামাজিক প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল।

রাজভবন অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের বিষয়ে প্রিয়াঙ্কা দত্ত (একজন চাকরি প্রার্থী) বলেন, *"আমরা শান্তিপূর্ণভাবে রাজভবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পুলিশ আমাদের থামিয়ে দিল। আমাদের কয়েকজনকে মারধর করা হলো। সরকার কি চায় আমরা চুপচাপ অন্যায়ের শিকার হই"?* প্রিয়াঙ্কার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, আন্দোলনকারীরা প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন হলেও তাঁদের প্রতিরোধের মনোভাব আরও দৃঢ় হয়েছে। ২০২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারির নবান্ন অভিযানের সময় চাকরি প্রার্থীরা পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। আন্দোলনকারী রাহুল সেন বলেন, *"যে সরকার বলেছিল চাকরি হবে, তারাই আজ আমাদের দমন করছে। আমরা চাইলেও পিছিয়ে যেতে পারব না, কারণ এ লড়াই আমাদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন"।* অন্যদিকে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সঞ্চিতা দাস বলেন, *"আমরা শুধু আমাদের প্রাপ্যটুকুর জন্য লড়াই করছি। যদি দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরি বিক্রি না হতো, তবে আজ আমাদের এই আন্দোলনের দরকার হতো না। সরকার কেন আমাদের কথা শুনবে না"?*

এই সাক্ষাৎকারগুলোর ভিত্তিতে বোঝা যায়, আন্দোলনকারীরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে নবান্ন অভিযানে অংশ নিলেও প্রশাসনের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, আন্দোলনটি কেবল চাকরি পাওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে পরিণত হয়েছে। চাকরি প্রার্থীদের হতাশা এবং তাঁদের প্রতিরোধের মনোভাবই আন্দোলনকে দীর্ঘমেয়াদি করে তুলেছে।

নাগরিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সক্রিয় গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নাগরিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সক্রিয় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত, মানবাধিকার সংস্থাগুলো, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, এবং ছাত্র-যুব সংগঠনগুলো চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে[53]। ২০২৩ সালের ২৫শে মার্চ, 'যুব আইনজীবী সংগঠন' চাকরি প্রার্থীদের আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে (দ্য টেলিগ্রাফ, ২৬ মার্চ ২০২৩)। ২০২৩ সালের ১০ই মে, 'নাগরিক অধিকার মঞ্চ' নামক সংগঠন এসএসসি আন্দোলনকারীদের দাবির পক্ষে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এবং সরকারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি তোলে (সংবাদ প্রতিদিন, ১১ মে ২০২৩)। ২০২৩ সালের ১৫ই আগস্ট, 'অ্যাক্টিভিস্ট ফর জাস্টিস' নামের একটি নাগরিক সংগঠন চাকরি প্রার্থীদের অনশন মঞ্চে এসে তাঁদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় (এই সময়, ১৬ আগস্ট ২০২৩)। এছাড়া, ২০২৪ সালের ৫ই জানুয়ারি, বিভিন্ন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা একজোট হয়ে 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি' গঠন করেন এবং আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের প্রতি ন্যায়বিচার দাবি করেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ জানুয়ারি ২০২৪)। ২০২৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি, দিল্লির একটি মানবাধিকার সংগঠন 'পিপলস ওয়াচ' এসএসসি আন্দোলনকারীদের বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে (NHRC) অভিযোগ দায়ের করে এবং পুলিশের লাঠিচার্জের তদন্ত চায় (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।[54]

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নাগরিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সক্রিয় বিভিন্ন গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা বিভিন্ন সময়ে মানববন্ধন, আইনি লড়াই, সংবাদ সম্মেলন, স্মারকলিপি প্রদান এবং মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এই সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা তাঁদের প্রতিবাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। ২০২৩ সালের ২০শে এপ্রিল, 'নাগরিক অধিকার মঞ্চ' কলকাতার একাডেমি অব ফাইন আর্টসের সামনে এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে (এই সময়, ২১ এপ্রিল ২০২৩)। এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরুণাভ চক্রবর্তী বলেন, *"শিক্ষা ও চাকরি মানুষের মৌলিক অধিকার। দুর্নীতির কারণে যদি যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা বঞ্চিত হন, তবে তা শুধু আইনের লঙ্ঘন নয়, বরং গণতন্ত্রের ওপর*

---

[53] মানবাধিকার সংস্থাগুলো মূলত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। সাধারণত, তারা রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয় এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে।

[54] 'পিপলস ওয়াচ' (People's Watch) হলো ভারতের একটি মানবাধিকার সংস্থা, যা ১৯৯৫ সালে তামিলনাড়ুর মাদুরাই শহরে 'সেন্টার ফর প্রোমোশন অফ সোশ্যাল কনসার্নস' (Centre for Promotion of Social Concerns - CPSC) এর একটি প্রোগ্রাম ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনুসন্ধান, সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষার প্রসার, আইনি সহায়তা প্রদান, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত।

আঘাত"। আন্দোলনকারীদের একজন দেবাশিস মজুমদার বলেন, *"আমাদের লড়াই শুধু চাকরির জন্য নয়, বরং একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার জন্য। নাগরিক সমাজের এই সমর্থন আমাদের এগিয়ে চলার শক্তি জোগায়"।* ২০২৩ সালের ৩০শে জুন, 'যুব আইনজীবী সংগঠন' চাকরি প্রার্থীদের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে (দ্য টেলিগ্রাফ, ১ জুলাই ২০২৩)। সংগঠনটির প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট সঞ্চিতা মুখার্জি বলেন, *"সরকারের দায়িত্ব চাকরি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই আইনি লড়াই শুধু চাকরি প্রার্থীদের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ"।* ২০২৩ সালের ১৫ই আগস্ট, 'অ্যাক্টিভিস্ট ফর জাস্টিস' আন্দোলনকারীদের সমর্থনে প্রেস ক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় (সংবাদ প্রতিদিন, ১৬ আগস্ট ২০২৩)। সংগঠনের সদস্য সুবর্ণা ঘোষ বলেন, *"আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেছি যাতে তিনি এই দুর্নীতির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। এই আন্দোলন যদি সফল না হয়, তবে ভবিষ্যতে চাকরির বাজারে যোগ্যতা নয়, টাকার গুরুত্ব বেশি হবে"।* (সংবাদ প্রতিদিন, ১৬ আগস্ট ২০২৩)। চাকরি প্রার্থী রক্তিম দত্ত বলেন, *"আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নাগরিক সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা চাই সরকার আমাদের দাবি দ্রুত মেনে নিক"।* ২০২৪ সালের ১০ই জানুয়ারি, দিল্লির মানবাধিকার সংগঠন 'পিপলস ওয়াচ' পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে (NHRC) অভিযোগ দায়ের করে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১ জানুয়ারি ২০২৪)। সংগঠনটির মুখপাত্র অভিজিৎ রায় বলেন, *"গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ করা নাগরিকদের অধিকার। পুলিশের লাঠিচার্জ এই অধিকারের লঙ্ঘন। আমরা চাই কমিশন দ্রুত তদন্ত করুক"।* ২০২৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি' ধর্মতলায় গণঅনশনের আয়োজন করে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষাবিদ সৌমিত্র বসু বলেন, *"নাগরিক সমাজের ভূমিকা হলো সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো। আমরা যে সমাজের স্বপ্ন দেখি, সেখানে যোগ্যতা ও পরিশ্রমের মূল্য থাকবে। এই দুর্নীতি তার বিরুদ্ধে এক বড় চ্যালেঞ্জ"।* আন্দোলনকারী মৌসুমী সেনগুপ্ত বলেন, *"আমরা ৬০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে লড়াই করছি। এই অনশন আমাদের হতাশার নয়, বরং আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতীক"।* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।

উপরোক্ত সাক্ষাৎকারগুলোর বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, নাগরিক অধিকার রক্ষার পক্ষে সক্রিয় গোষ্ঠীগুলো শুধুমাত্র সমর্থন দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্যেও স্পষ্ট, এই গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয়তা তাঁদের আন্দোলনকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে এবং প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের ভূমিকা

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে শুধু চাকরি প্রার্থীরাই নয়, তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। বিশেষত, ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বিভিন্ন কর্মসূচিতে যুক্ত হয়ে তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছেন। অভিভাবকদের বক্তব্য ও তাঁদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তাঁরা কেবল সমর্থন জোগাননি, বরং আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ও কর্মসূচীগুলি আন্দোলনের নতুন মাত্রা দিতে থাকে, এই অবিভাবক গোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন কর্মসূচীতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন সেগুলি হল -

প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন: ২০২৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি, কলকাতার ধর্মতলায় 'অভিভাবক মঞ্চ' নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়, যেখানে প্রায় ২০০ অভিভাবক অংশ নেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, "আমাদের ছেলেমেয়েরা কঠোর পরিশ্রম করে পরীক্ষায় বসেছে, অথচ দুর্নীতির কারণে যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা এ অন্যায় মানতে পারি না"। (অভিভাবক মিতা সেনগুপ্ত, এই সময়, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। অন্যদিকে, বিকাশ রায় নামে এক অভিভাবক বলেন, *"বছরের পর বছর ধরে আমাদের সন্তানেরা লড়াই করছে। আমরা দেখছি, যারা টাকা দিয়েছে, তারা চাকরি পাচ্ছে, আর যোগ্যরা রাস্তায় বসে আন্দোলন করছে। এটা লজ্জার"!* – (দ্য টেলিগ্রাফ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) ।

রাজভবন অভিযানে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ: ২০২৩ সালের ১০ই মে, চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে তাঁদের অভিভাবকরাও রাজভবন অভিযানে অংশ নেন। পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় কয়েকজন অভিভাবক আহত হন। অনিমেষ চৌধুরী, যাঁর মেয়ে ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি পাননি, বলেন, *"আমার মেয়েকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি একজন বাবা হিসেবে কখনোই চুপ থাকতে পারব না"।* – (সংবাদ প্রতিদিন, ১১ মে ২০২৩)।

নবান্ন অভিযানে অভিভাবকদের বিক্ষোভ: ২০২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি, নবান্ন অভিযানে বহু অভিভাবক অংশ নেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সুব্রত ভট্টাচার্য, যাঁর ছেলে ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেও চাকরি পাননি, তিনি বলেন, *"সরকার যদি আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে, তাহলে আমরা কি ঘরে বসে থাকব? আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করব"!* – (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪)। একই ঘটনায় সন্ধ্যা দত্ত, যিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা, বলেন, *"আমি নিজে শিক্ষক ছিলাম, কিন্তু আজ আমার ছেলে তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাচ্ছে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করাই এখন আমাদের একমাত্র পথ"।* – (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি ২০২৪)

প্রেস কনফারেন্স ও আইনি পদক্ষেপ: ২০২৪ সালের ২রা মার্চ, 'অভিভাবক ঐক্য মঞ্চ' একটি সংবাদ সম্মেলন করে এবং দুর্নীতির তদন্তের জন্য হাইকোর্টে মামলা দায়েরের ঘোষণা দেয়। সংগঠনের অন্যতম সদস্য

সৌমেন দাস বলেন, *"আমরা কেবল চাকরি প্রার্থীদের অভিভাবক নই, আমরা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিও। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কণ্ঠ তুলতেই হবে"।* – (দ্য হিন্দু, ৩ মার্চ ২০২৪)।

সাক্ষাৎকার ও ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অভিভাবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা শুধুমাত্র সমর্থন জানিয়ে থেমে থাকেননি, বরং সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, নবান্ন ও রাজভবন অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আইনি লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছেন। ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরি করতে পেরেছে।

নিয়োগ দুর্নীতি আন্দোলনে রাজনৈতিক দল গুলির ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত, শাসক দল তথা তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর হস্তক্ষেপের ফলে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক যোগসূত্রের ভিত্তিতে নিয়োগের প্রবণতা শুধুমাত্র প্রশাসনিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম, যা মেধার পরিবর্তে আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয়। এর ফলে, সরকারি চাকরির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ব্যাহত হয় এবং সাধারণ জনগণের আস্থা কমে যায়। ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে, যেখানে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনৈতিক সুবিধা দেওয়া হয়। (দ্য টেলিগ্রাফ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫) এবং (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫) তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যেখানে দেখা যায়, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় কিছু প্রার্থীর জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হয়েছিল। এর ফলে, প্রকৃত মেধাবীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং অযোগ্য প্রার্থীরা রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে চাকরি লাভ করে। এই ধরণের অনিয়মকে সাধারণত 'পলিটিক্যাল প্যাট্রনেজ' বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বলা হয়[55], যেখানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা নেতারা নিজেদের সমর্থকদের সরকারি চাকরিতে বসানোর জন্য অনৈতিক উপায় অবলম্বন করে। এর মাধ্যমে দলীয় আনুগত্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রশাসনের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে এই প্রবণতা শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালেই দেখা গেছে তা নয়; বামফ্রন্ট সরকারের সময়েও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই সমস্যা আরও গভীর হয়েছে, বিশেষত তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন আমলে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ছাত্র সমাজ ও নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

[55] পলিটিক্যাল প্যাট্রনেজ বলতে রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দল কর্তৃক আনুগত্যের বিনিময়ে সরকারি সুবিধা, চাকরি, পদোন্নতি, অর্থনৈতিক সুযোগ বা অন্যান্য সুবিধা প্রদানকে বোঝায়। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক নেতারা তাদের অনুগত সমর্থকদের পুরস্কৃত করেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার করেন।

রাষ্ট্র, প্রশাসন ও তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা

২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর 'দুর্নীতি-মুক্ত প্রশাসন' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হস্তক্ষেপ করেছেন এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতির ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গভীর অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে। সরকারি চাকরি নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতি বহুদিনের সমস্যা হলেও, ২০১১ সালের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। টেলিগ্রাফ এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, "বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষ নিয়েছেন" (টেলিগ্রাফ ২০ অগাস্ট ২০২১:৬) এই দুর্নীতি কেবল ব্যক্তিগত লাভের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দলীয় আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য একধরনের রাজনৈতিক বিনিময় নীতিতে পরিণত হয়েছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের প্রভাব বলয়ে থাকা ব্যক্তিদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন, যাতে রাজনৈতিক আনুগত্য দীর্ঘস্থায়ী থাকে। এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলি নিয়োগ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। স্থানীয় নেতারা চাকরির বিনিময়ে সমর্থন আদায় করেছেন এবং নির্বাচনীয় রাজনীতিতে এই চাকরির প্রতিশ্রুতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে মেধার মূল্যায়ন কমে গিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লেনদেনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠে আসছিল। তবে বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় আসে ২০২১ সালের পর, যখন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা এবং আমলাদের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এই কেলেঙ্কারির মূল দিক ছিল টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে চাকরি দেওয়া, যা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অসন্তোষের জন্ম দেয়। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি ছিল, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং রাজনৈতিক ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আদালতের নজরে এলে তদন্ত শুরু হয় এবং একপর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত চলাকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়, যা দুর্নীতির মাত্রাকে স্পষ্ট করে দেয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ জুলাই ২০২২)।

আন্দোলনের সূত্রপাত ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া: দুর্নীতির বিরুদ্ধে চাকরিপ্রার্থীরা ও ছাত্র সংগঠনগুলি আন্দোলনে নামে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা পথে নামে। বিরোধী দলগুলি, বিশেষ করে BJP ও বামফ্রন্ট, এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায় (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৫ আগস্ট ২০২২)। প্রাথমিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগকে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলে উড়িয়ে

দেয়।[56] তবে যখন আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং আদালতের নির্দেশে তদন্ত এগোতে থাকে, তখন দল কৌশল বদলায়। যার ফলস্বরুপ, ২৮ জুলাই ২০২২ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা হয় (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৮ জুলাই ২০২২)। ২৯ জুলাই ২০২২ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, "যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তারা দলে থাকবে না" (এই সময়, ২৯ জুলাই ২০২২)। আন্দোলন তীব্র হওয়ার পর, সরকার পুলিশি দমননীতি গ্রহণ করে। হাওড়া, কলেজ স্ট্রিট, ধর্মতলা ও বিধাননগরে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে (প্রতিদিন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)। মানবাধিকার সংস্থাগুলি অভিযোগ তোলে যে সরকার অত্যধিক বলপ্রয়োগ করেছে (দ্য হিন্দু, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২)। তৃণমূলের ভেতরেও এই দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, "যারা দোষী, তাদের বিচার হওয়া উচিত" (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৪ আগস্ট ২০২২)। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রকাশ্যে বলেন, "যদি প্রমাণ হয় যে কেউ দোষী, তবে সে দলের কেউ হলেও ছাড় পাবেন না" (দ্য টেলিগ্রাফ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২)।

একজন আন্দোলনকারী এসএফআই ছাত্র নেতা সাক্ষাৎকারে বলেন *"আমরা ৪ বছর ধরে চাকরির জন্য লড়াই করছি। কিন্তু সরকার আমাদের দমনের চেষ্টা করছে। এটা সরকারের ব্যর্থতা"।* সুবর্ণা সেনগুপ্ত, "এক চাকরিপ্রার্থী বলেন যে আমরা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি, অথচ টাকা না দিলে চাকরি হয় না! সরকার কি এই দুর্নীতি লুকাতে চায়"? বিরোধীদলের সিপিআই(এম) নেতা বিমান বসু বলেন *"তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা ও প্রশাসনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে"।* (এই সময়, ১৭ আগস্ট ২০২২)। BJP নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন "এটি শুধুমাত্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কেলেঙ্কারি নয়, এটি পুরো সরকারের দুর্নীতির প্রতিচ্ছবি"। (ইন্ডিয়া টুডে, ২০ আগস্ট ২০২২)। নিয়োগ দুর্নীতি কেলেঙ্কারিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত। প্রথমদিকে সরকার অভিযোগগুলোকে উড়িয়ে দিলেও পরিস্থিতি জটিল হলে কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও আন্দোলনকারীদের দমননীতি ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন এবং বিরোধীদের চাপ এই ইস্যুকে আরও বড় করে তোলে। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, ছাত্র আন্দোলন ও চাকরি প্রার্থীদের চাপ সরকারকে বাধ্য করতে পারে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুর্নীতির দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি বড় ধাক্কা হয়ে রইল। এক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বিশ্লেষণে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উঠে আসে সেটি হল- সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন থেকে উঠে আসা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান পরিস্থিতি দেখায় যে, রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার বাস্তবতা বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যারা একসময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তারাই শাসক হয়ে একই দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ। এই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দলগুলোর নৈতিকতা ও শাসনের মধ্যে দূরত্বকে স্পষ্ট করে এবং জনগণের জন্য একটি শিক্ষা দেয় - একটি আন্দোলনকে সমর্থন করা মানেই চিরস্থায়ী ন্যায়ের

[56] রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলতে বোঝায় গোপন চক্রান্ত বা পরিকল্পনা, যা সাধারণত ক্ষমতা দখল, বিরোধীদের দুর্বল করা বা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য করা হয়। এটি সরকার, বিরোধী দল, প্রশাসন বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে।

নিশ্চয়তা নয়। সময়ের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র বদলে যেতে পারে, এবং জনগণকেই তাদের শাসকদের জবাবদিহির আওতায় রাখতে হবে এটা এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়। নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক পরিস্থিতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়া এবং দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি প্রার্থীদের বঞ্চিত হওয়ার কারণে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে—কখনো উপেক্ষা, কখনো দমনমূলক ব্যবস্থা, আবার কখনো আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ। প্রশাসনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল আন্দোলনকে উপেক্ষা করা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পুলিশি হস্তক্ষেপ ও দমনমূলক নীতিতে রূপ নেয়। চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান-বিক্ষোভ, অনশন, রাজভবন ও নবান্ন অভিযানের মতো কর্মসূচিতে পুলিশের ভূমিকা এবং সরকারি অবস্থান আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। এরপর, আদালতের হস্তক্ষেপ এবং নাগরিক সমাজের চাপের ফলে সরকার নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়, যার মধ্যে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, অবৈধ নিয়োগ বাতিল, এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার ঘোষণা অন্যতম। এই প্রবন্ধে নিয়োগ দুর্নীতি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথমে আন্দোলন শুরুর পর প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল, তা পর্যালোচনা করা হবে। এরপর, আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হলে দমনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে প্রশাসনিক পরিবর্তন কীভাবে এসেছে, তা আলোচিত হবে।

প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন উপেক্ষা (২০২২-২০২৩) করে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে প্রথমদিকে সরকার ও প্রশাসন নীরব ভূমিকা গ্রহণ করে। ২০২২ সালের মে মাসে চাকরিপ্রার্থীরা যখন আন্দোলন শুরু করেন, তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বরং, শাসক দলের নেতারা এই আন্দোলনকে 'বিরোধীদের উসকানি' বলে অভিহিত করেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, *"এই আন্দোলন যারা করছেন, তাঁরা হয়তো বুঝতে পারছেন না যে সরকার যথাসম্ভব স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কাজ করছে"।* (এই সময়, ২১ মে ২০২২)। অন্যদিকে, তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় বলেন, *"দুর্নীতি নিয়ে যদি অভিযোগ থাকে, তবে তা নিরপেক্ষ তদন্তের আওতায় আসা উচিত"।* (দ্য টেলিগ্রাফ, ২৩ মে ২০২২)। দমনমূলক পদক্ষেপ ও পুলিশি হস্তক্ষেপ (২০২৩): চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হলে সরকার দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। ২০২৩ সালের ২রা জানুয়ারি, চাকরিপ্রার্থীদের শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেয় এবং লাঠিচার্জ চালানো হয়। এতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী আহত হন। এক আন্দোলনকারী সৌরভ মণ্ডল বলেন, *"আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি করছিলাম। পুলিশ আমাদের টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে গেল। সরকার আমাদের কণ্ঠরোধ করতে চায়"।* (সংবাদ প্রতিদিন, ৩ জানুয়ারি ২০২৩)। ২০২৩ সালের ১০ই মে, রাজভবন অভিযানের সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল জানান, *"আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসন বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে"।* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ মে ২০২৩)।

আদালতের নির্দেশ ও সরকারের প্রতিক্রিয়া (২০২৩-২০২৪): হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট একাধিকবার নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দেয় এবং সরকারকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। ২০২৩ সালের ২২শে মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, *"নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়ম হয়েছে এবং তা শুধরে নেওয়ার দায়িত্ব সরকারের"।* (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৩ মে ২০২৩)। এই রায়ের পর সরকার কিছু প্রতীকী পদক্ষেপ নেয়। প্রায় ৩,০০০ অবৈধভাবে চাকরি পাওয়া প্রার্থীর নিয়োগ বাতিল করা হয়। তবে আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুনভাবে নিয়োগ দেওয়া হোক। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তখন বলেন, *"আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে চলব, কিন্তু আন্দোলনকারীদের সব দাবি মানা সম্ভব নয়"।* (দ্য হিন্দু, ২৫ মে ২০২৩)। সরকারি তদন্ত কমিটি ও রাজনৈতিক চাপ (২০২৪): ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নবান্ন অভিযানে চাকরি প্রার্থীদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগের পর, ব্যাপক রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, *"যদি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে দুর্নীতি হয়েছে, তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে"।* (এই সময়, ১৮ জানুয়ারি ২০২৪)। অন্যদিকে, সিবিআই এবং ইডি-র তদন্তের ফলে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, যেমন প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি এবং এসএসসি-র কিছু কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। এক সরকারি কর্মকর্তা বলেন, *"সরকার চাপে রয়েছে, কিন্তু আমরা চাইছি এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হোক"।* (দ্য টেলিগ্রাফ, ২০ জানুয়ারি ২০২৪)।

সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা একাধিক পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়েছে - প্রথমে উপেক্ষা, পরে দমন, এবং শেষ পর্যন্ত আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ। তবে আন্দোলনকারীরা এখনও তাঁদের দাবিতে অনড়, এবং আদালতের হস্তক্ষেপ ও নাগরিক সমাজের চাপের ফলে সরকারকে প্রতিনিয়ত জবাবদিহির মুখে পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরি করা সম্ভব। যদিও সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে, আন্দোলনকারীরা এখনও সম্পূর্ণ সমাধান পাননি, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই আন্দোলন ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের কেন্দ্রে থাকবে।

সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্টের ভূমিকা

২০১১ সালে ক্ষমতা হারানোর পর বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে সিপিআইএম, নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করে, যেখানে শিক্ষাখাতের দুর্নীতি অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, তা বামপন্থী দলগুলির আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। দাশগুপ্তার গবেষণায় দেখা যায় যে, বামফ্রন্ট সরকারের শাসনামলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, তবে তা তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের সময়ের মতো সুসংগঠিত বা ব্যাপক ছিল না। বামফ্রন্টের শাসনকালে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা: বামফ্রন্ট সরকার তদের শাসনামলে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। স্কুল ও কলেজে নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালন

সমিতির মাধ্যমে নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব উপলব্ধি করে, তারা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করে বামফ্রন্ট সরকার। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, *"আমাদের সময়ে আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) এবং কলেজ সার্ভিস কমিশন (CSC) প্রতিষ্ঠা করেছি, "যাতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ নিশ্চিত হয়"।* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মে ২০১৯)

তবে, কিছু সমালোচক উল্লেখ করেছেন যে, বামফ্রন্ট শাসনামলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কিছু অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। একজন শিক্ষাবিদ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, *"যদিও সরকার স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেছিল, তবুও কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল"।* (দৈনিক টেলিগ্রাফ, ২০ জুন ২০২০) বর্তমান সরকার বামফ্রন্ট শাসনামলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, *"বাম জমানায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ আসছে এবং আমরা সেই সময়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া তদন্তের ইঙ্গিত দিয়েছি"।* (সংবাদ প্রতিদিন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২) বর্তমান তৃণমূল সরকারের অধীনে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস যৌথভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়। নিয়োগ দুর্নীতির দায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে তারা ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল করে। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "যাঁরা চুরি-জোচ্চুরিতে হাত পাকিয়েছেন, তাঁরাই এখন নবান্নে বসে আছেন"! তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান (আনন্দবাজার, ২৫ এপ্রিল ২০২৪)। সিপিআই(এম) নেতা অনাদি সাহু, আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, সিপিআই নেতা প্রবীর দেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তাদের দাবি ছিল, নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িতদের গ্রেফতার এবং যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি প্রদান করতে হবে (গণশক্তি, ২৫ এপ্রিল ২০২৪)। তবে, বামফ্রন্টের অন্তর্গত ফরওয়ার্ড ব্লক এই মিছিলে অংশগ্রহণ না করে আলাদা মিছিলের সিদ্ধান্ত নেয়, যা বাম শিবিরে অনৈক্যের ইঙ্গিত দেয় (ইটিভি ভারত, ২৯ এপ্রিল ২০২৪)। সার্বিকভাবে, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের যৌথ প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িতদের শাস্তির দাবি প্রধান্য পায়। তবে, বাম শিবিরের অভ্যন্তরীণ বিভাজন তাদের আন্দোলনের শক্তি ও সংহতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই রাজনৈতিক দলটির কর্মসূচীর নিম্নরুপ-

রাস্তায় আন্দোলন ও প্রতিবাদঃ সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই একাধিক বার বিক্ষোভ, অবস্থান এবং মিছিলের আয়োজন করে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে কলকাতার ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত এক মহামিছিলের সময় এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "চাকরি প্রার্থীদের প্রতি সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা একজোট হয়ে লড়াই করছি। দুর্নীতিবাজদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে"। (গণশক্তি, ২০২২, ১৫ জুলাই)।

আইনি সহায়তা ও পরামর্শ: বামফ্রন্টের আইনজীবীরা নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং প্রার্থীদের আইনি পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা

চলাকালীন, প্রার্থীদের পক্ষে লড়াই করা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "নির্বাচিত প্রার্থীদের বঞ্চিত করে দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। আমরা এই অনিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব"। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০২৩, ১০ ফেব্রুয়ারি)

সামাজিক ও রাজনৈতিক সমর্থন: সিপিআই(এম) নেতৃত্ব নিয়মিতভাবে এই আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই দুর্নীতির প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপন করা হয়েছে। বামফ্রন্টের বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী বিধানসভায় বলেন, "সরকারি চাকরির জন্য মেধার বদলে টাকা লাগবে— এই বার্তা দিলে শিক্ষা ও প্রশাসন দুই-ই ধ্বংস হবে"। (এবিপি আনন্দ, ২০২২, ২০ সেপ্টেম্বর)

প্রভাব ও ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ: এই আন্দোলনে বামফ্রন্টের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে সরকারের ওপর চাপ তৈরি হয়েছে। আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্ত ও রায়ে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী গ্রেফতার হওয়ার পর সিপিআই(এম)-এর নেতা মহম্মদ সেলিম বলেন, "এটি আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে"। *(টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২০২৩, ৫ মার্চ)।* সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্ট এই আন্দোলনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে জড়িত হয়েছে বলে আন্দোলনকারীরা মনে করেন। চাকরি প্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়া, আইনত সহযোগিতা করা এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চাপ সৃষ্টি করা—এই তিনটি দিক থেকেই তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ ও বামফ্রন্টের প্রতিক্রিয়া: নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বামফ্রন্টের সমালোচনার জবাবে, তৃণমূল কংগ্রেস বাম আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তোলে। তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ বলেন, "বামফ্রন্ট আমলে দলের কর্মীদের কোটায় চাকরি হত"। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী তথা তাঁর বাবা কমল গুহও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। (আনন্দবাজার, ২৬ মার্চ ২০২৩) । উদয়ন গুহ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "সুজনবাবু কোটায় চাকরি হত না? তবে এরা কী করে চাকরি পেয়েছিল? অঞ্জলি সেন, শুক্লা সরকার, বুদ্ধদেব রায়, বিশ্বনাথ রায়, মলয় রায়"! (আনন্দবাজার, ২৬ মার্চ ২০২৩)। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষও বাম আমলে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বলেন, "বাম আমলে চিরকুটে চাকরি হয়েছে"। (আনন্দবাজার, ২৭ মার্চ ২০২৩)। তবে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী উদয়ন গুহের অভিযোগকে গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, "উদয়ন গুহর অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত"। (গণশক্তি, ২৭ মার্চ ২০২৩)। সার্বিকভাবে, তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্টের শাসনামলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট নেতারা এই অভিযোগগুলোকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করছেন।

অর্থাৎ, সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্ট নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেও, তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ তাদের নিজস্ব শাসনকালের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বর্তমান গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাম দলগুলি তাদের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের কৌশল হিসেবে ছাত্র আন্দোলনকে

ব্যবহার করেছে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তারা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছাত্র সংগঠনগুলির ওপর নির্ভর করেছে, যেমন এসএফআই। নিয়োগ দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাবের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, বামপন্থী দলগুলি সেই অসন্তোষকে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। বামপন্থী নেতৃত্ব একদিকে শিক্ষার্থীদের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ হিসেবে তুলে ধরে, অন্যদিকে এটিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালায়। তবে, এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, বামপন্থী দলগুলির এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে কিছু সফলতা পেলেও, তাদের রাজনৈতিক পুনরুত্থান সীমিত ছিল। এর অন্যতম কারণ BJPর শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া।

BJPর ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে ভারতীয় জনতা পার্টি (এরপর থেকে BJP বলবো) শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে BJP একাধিক বার আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। দলটি দাবি করেছে, শিক্ষক নিয়োগসহ একাধিক সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সরাসরি জড়িত।

BJP র আন্দোলন ও দাবিসমূহ গুলি হল-

সিবিআই তদন্তের দাবি: BJP প্রথম থেকেই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত চেয়ে আদালতের দারস্থ হয়। তাদের দাবি, এই দুর্নীতিতে শাসক দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা যুক্ত এবং রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন সম্ভব নয়। রাস্তায় আন্দোলন ও ধরনা: BJP যুব মোর্চা এবং অন্যান্য শাখা সংগঠন একাধিকবার কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভ করেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নবান্ন অভিযান কর্মসূচিতে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়, যেখানে BJPর একাধিক নেতা গ্রেপ্তার হন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)। নেতাদের বক্তব্য: BJP নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এই দুর্নীতি তৃণমূল সরকারের পতনের কারণ হবে। যারা টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে, তাদের বিচার হতেই হবে" (দ্য টেলিগ্রাফ, ২০ অক্টোবর ২০২২)। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, "শিক্ষামন্ত্রী সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের এই কেলেঙ্কারির জন্য জেলে যেতে হবে" (সংবাদ প্রতিদিন, ২২ নভেম্বর ২০২২)। সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টে মামলা: BJPর তরফে আইনজীবীরা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাধিকবার আদালতে মামলা করেছেন। এর ফলে হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং নিয়োগ বাতিল করা হয় (বর্তমান পত্রিকা, ২৯ এপ্রিল ২০২৩)। যদিও BJP সরকারে না থাকলেও, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, দলটি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে, রাজ্যে নিজেদের সংগঠন মজবুত করতেই BJP এই ইস্যুকে বড় করে দেখাচ্ছে। তবে আদালতের হস্তক্ষেপ এবং

কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তের ফলে তৃণমূলের একাধিক নেতার নাম উঠে আসায় BJPর অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) আন্দোলন শুধুমাত্র দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না, বরং এর পেছনে বৃহত্তর রাজনৈতিক এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। একদিকে, BJP চাইছিল নিজেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইরত একটি স্বচ্ছ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে, অন্যদিকে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের সুযোগ খুঁজছিল। BJP এই আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবসমাজের মধ্যে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে চেয়েছিল। শিক্ষিত অথচ চাকরিবঞ্চিত যুবকদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তারা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একটি বড় আন্দোলন তৈরি করতে চেষ্টা করেছিল। তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অন্যতম দিক ছিল এই ক্ষুব্ধ যুবসমাজকে BJPর আন্দোলনের অংশীদার করা, যাতে ভবিষ্যতে তারা BJPর সমর্থক হয়ে ওঠে। নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের প্রতি অবিচার হয়েছে—এই বয়ান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে BJP নিজেদের পাশে তাদের টানার চেষ্টা করেছে। এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বজনপোষণের দায়ে অভিযুক্ত করা। BJP চেয়েছিল এই ইস্যুটিকে ব্যবহার করে তৃণমূলের ভাবমূর্তিকে আঘাত করতে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে শাসক দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলনকে সামনে রেখে তারা দাবি করতে চেয়েছে যে তৃণমূল সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ, বরং নিজেদের দলীয় কর্মী ও ঘনিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা করতেই বেশি আগ্রহী। BJPর এই আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা আরও সক্রিয় হয়, যা মূলত তৃণমূল সরকারের উপর একটি অতিরিক্ত রাজনৈতিক চাপ তৈরি করে। BJP চেয়েছিল এই চাপের মাধ্যমে তৃণমূলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উসকে দিতে এবং নেতাদের দুর্নীতির দায়ে দুর্বল করে ভবিষ্যতের রাজনীতিতে সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করতে। তাই, এই আন্দোলন শুধুমাত্র দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানের প্রকাশ নয়, বরং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে, BJPর এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেখা যেতে পারে। তারা রাজ্যের ক্ষমতার কাঠামোয় প্রবেশ করতে চায়, এবং নিয়োগ দুর্নীতির মতো ইস্যুকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। আন্দোলনের মাধ্যমে তারা বিরোধী দল হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে চেয়েছে এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে চেয়েছে। ফলে, এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র ন্যায়বিচারের প্রশ্ন হিসেবে দেখা যাবে না; এটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের একটি কৌশলগত প্রচেষ্টা।

পশ্চিমবঙ্গে চাকরি নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ

দুর্নীতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ চাকরিপ্রার্থীরা, যারা কোনো রাজনৈতিক সংযোগ ছাড়াই নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বহু মেধাবী ও পরিশ্রমী প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার কারণে বঞ্চিত হয়েছেন, যা তাদের হতাশা ও ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছে। তারা একাধিকবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং নিজেদের দাবির স্বপক্ষে সরব হয়েছেন। দুর্নীতির কারণে সমাজে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে প্রান্তিক ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে, যারা চাকরির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বপ্ন দেখত। ছাত্র সংগঠনগুলি, যেমন এসএফআই (CPI(M)-এর ছাত্র শাখা) এবং এবিভিপি (BJP-এর ছাত্র শাখা), এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ২০২২ সালে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির পর তারা বিক্ষোভ, অবস্থান, এবং রাজপথ অবরোধের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানায়। তবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনই নয়, এমন অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী, যারা অতীতে রাজনীতি থেকে দূরে ছিল, তারাও সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষার তাগিদে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালিয়েছে।

শিক্ষাখাতে দুর্নীতির অভিযোগ প্রথম সামনে আসে সরকারি চাকরি পরীক্ষায় অস্বচ্ছতার বিষয়টি উঠে আসার পর। বিশেষ করে, স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর ছাত্র এবং চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে ছাত্ররা মূলত স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নামে এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদের বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। এই সময় ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা দ্বিধাবিভক্ত ছিল। একদিকে এসএফআই (SFI) এবং এবিভিপি (ABVP) আন্দোলনে নিজেদের সক্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টা করছিল, অন্যদিকে সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্বে নতুন সংগঠন গঠনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সংগঠনগুলি নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন, "এই আন্দোলনের প্রথম দিকেই ছাত্রদের মধ্যে একটি নতুন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়, যেখানে তারা প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলির ওপর আস্থা রাখতে পারছিল না" (দাশগুপ্ত ২০২৩:৪৫)। যখন দুর্নীতির নতুন তথ্য সামনে আসতে শুরু করে এবং বিভিন্ন মহল থেকে সমর্থন পাওয়া যায়, তখন আন্দোলনটি শুধু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সাধারণ চাকরিপ্রার্থী, নাগরিক সমাজ, এমনকি কিছু বুদ্ধিজীবীও এতে যুক্ত হন। এই পর্যায়ে আন্দোলনের কাঠামো আরও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং নির্দিষ্ট কিছু দাবি সামনে আসে—

1. নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা
2. দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া
3. নতুন এবং স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা

এই সময় আন্দোলনের নেতৃত্ব নতুন সংগঠনগুলির হাতে চলে যায়, তারা প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করে এবং সরাসরি আদালতে মামলা দায়ের, সামাজিক মাধ্যমের প্রচার এবং বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন কাজে লাগানোর মতো নতুন কৌশল গ্রহণ করে। চ্যাটার্জি উল্লেখ করেছেন, "রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলি এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চাইলেও, ছাত্ররা তাদের নেতৃত্ব গ্রহণে আগ্রহী ছিল না" (চ্যাটার্জি ২০২৪: ১০১)।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন মূলত বিরোধী দলগুলোর নেতৃত্বে সংগঠিত হলেও, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তারা শাসক দলের ছাত্র সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে, এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে টিএমসিপির অবস্থান শুধুমাত্র একটি ছাত্র সংগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং শাসক দলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থানের প্রতিফলন হিসেবেও দেখা যেতে পারে। নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় যখন ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়, তখন সাধারণভাবে প্রত্যাশিত ছিল যে রাজ্যের অন্যতম প্রধান ছাত্র সংগঠন হিসেবে টিএমসিপি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান না নিয়ে বরং সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানকে রক্ষার দিকেই মনোযোগ দেয়। এটি বোঝা যায় তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন সময় দেওয়া বিবৃতির মধ্য দিয়ে। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা এই সংগঠনটি যখন আন্দোলনরত ছাত্রদের দাবির প্রতি সংহতি জানায়নি, বরং কখনও কখনও এই আন্দোলনকে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে অভিহিত করেছে, তখন তা কার্যত সরকারপক্ষের অবস্থানকেই প্রতিফলিত করেছে।

রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে টিএমসিপির ভূমিকা বোঝার জন্য রাষ্ট্রতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে যে, একটি ছাত্র সংগঠন কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটি সম্প্রসারিত হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। সাধারণত ছাত্র সংগঠনগুলোর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান ও মতামত গঠনের স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু যখন কোনো সংগঠন সরাসরি শাসক দলের অধীনস্থ হয়ে পড়ে, তখন তা অনেকাংশে সরকারি সিদ্ধান্তের রক্ষক হিসেবে কাজ করে। টিএমসিপির ক্ষেত্রে এটিই ঘটেছে—তারা সরকার তথা শাসক দলের দুর্নীতির দায় স্বীকার না করে বরং এটিকে বিরোধীদের চক্রান্ত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। তবে এখানে আরও একটি দিক লক্ষণীয়। ছাত্র সংগঠন হিসেবে টিএমসিপি মূলত তরুণ ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষার দাবি করে, কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তারা ছাত্রদের পক্ষ না নিয়ে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে। এর ফলে রাজ্যের ছাত্র সমাজের একটি বড় অংশ তাদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে সংগঠনটির জনভিত্তি দুর্বল করার সম্ভাবনা তৈরি করে। বিশেষ করে, যখন নিয়োগ দুর্নীতির কারণে রাজ্যের বহু শিক্ষিত যুবক চাকরি বঞ্চিত হয় এবং তারা রাজপথে আন্দোলনে নামে, তখন টিএমসিপির নীরবতা ও সরকারের

অবস্থানকে রক্ষা করার প্রবণতা তাদের সাংগঠনিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে টিএমসিপির ভূমিকা রাষ্ট্র ও শাসক দলের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে বলে ব্যাখ্যা করা যায়। ছাত্র রাজনীতি যেখানে সাধারণত স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে, সেখানে টিএমসিপি কার্যত সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাকারী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ যখন বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে, তখন টিএমসিপি তার বিরোধিতা না করলেও নিরপেক্ষ থাকেনি; বরং পরোক্ষভাবে সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেই চলেছে। ফলে, এই সংগঠনটি একটি ছাত্র সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারক ও বাহক হিসেবেই কাজ করেছে, যা ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্যগত চরিত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আন্দোলনের শুরুর দিকে TMCP সরকার ও শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতির প্রতি সমর্থন জানায়। সংগঠনটির এক নেতা বলেন, "*সরকার ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে এবং আমরা আদালতের রায় মেনে চলবো। বিরোধীরা অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে"।*

বেশিরভাগ TMCP সদস্যদের মতে, এই আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল এবং ছাত্রদের ব্যবহার করে সরকারকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এক TMCP নেতা বলেন, "*এই আন্দোলন পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে সরকারকে দুর্বল করার জন্য। ছাত্রদের প্রকৃত সমস্যা নয়, এটা বিরোধীদের রাজনৈতিক হাতিয়ার"।* অর্থাৎ সরকারপন্থী বা দলের পাশেই অবস্থান করেছে। TMCP-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার না করলেও, দলীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলে যে, সরকার ইতিমধ্যে তদন্ত করছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। TMCP-এর এক সিনিয়র সদস্য বলেন, *"আমরা স্বচ্ছতার পক্ষেই আছি। যারা দোষী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু এই আন্দোলনের নামে অরাজকতা বরদাস্ত করা হবে না"।* TMCP-এর তরুণ সদস্যদের মধ্যে কিছু বিভাজন লক্ষ্য করা গেছে। একদল মনে করে যে, সংগঠনটির উচিত ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া, অন্যদিকে, আরেক দল মনে করে যে, সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, TMCP-এর অভ্যন্তরে কিছু নীতিগত পরিবর্তন আনার প্রস্তাব উঠেছে, যাতে শিক্ষার্থী মহলে সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায়। TMCP-এর অভ্যন্তরে কিছু সদস্য আন্দোলনের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যদিও তারা প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেননি। এক TMCP কর্মী বলেন, *"আমরা দলীয় অবস্থানের বাইরে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে নিয়োগ দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত"।*

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) শিক্ষাখাতে চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি, যা একাধিক কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, টিএমসিপি শাসকদলের ছাত্র সংগঠন হিসেবে কাজ করে, এবং এই দুর্নীতির ঘটনাগুলি মূলত শাসকদলের প্রশাসনের সময়েই ঘটেছে। ফলে, দলীয় স্বার্থ এবং সরকারকে বিব্রত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সংগঠনটি আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কৌশল নিয়েছে। শাসকদলের নীতি ও ভাবমূর্তি রক্ষা করাই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে, যা তাদের

আন্দোলনে সক্রিয় হতে বাধা দেয়। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রথমদিকে অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করে এবং একজন টিএমসিপির সিনিয়র ছাত্রনেতা তার সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে "এই দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ আমাদের দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং এই আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার একটি কৌশল"। দ্বিতীয়ত, টিএমসিপি-এর নেতৃত্ব এবং সমর্থকরা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দলীয় প্রশাসনের সুবিধাভোগী হওয়ায় তারা আন্দোলনে যোগ দিলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। চাকরি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকার অভিযোগ থাকায়, এই আন্দোলনকে সমর্থন করা মানে দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার সমান হয়ে দাঁড়াত। তাই, তারা এই বিষয়ে নীরব থেকেছে। তৃতীয়ত, শিক্ষাখাতে দুর্নীতি ইস্যুতে যদি টিএমসিপি সরাসরি আন্দোলনে নামতো, তবে এটি কার্যত সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করার সমান হত। বিরোধী দলগুলির জন্য এটি একটি শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারত, যা তারা শাসকদলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করত। তাই দলীয় কৌশলের অংশ হিসেবে, টিএমসিপি এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং সরকারপন্থী অবস্থান বজায় রেখেছে। চতুর্থত, টিএমসিপি সাধারণত শাসকদলের সমর্থন ছাড়া স্বাধীনভাবে কোনো আন্দোলনে নামতে পারে না, কারণ তাদের কর্মকাণ্ড সরাসরি দলের উচ্চ নেতৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দলীয় অনুমোদন ছাড়া বড় কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা তাদের নেই, যা তাদের আন্দোলন থেকে দূরে রাখার আরেকটি কারণ।

এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে দেখা যায়, টিএমসিপি শুধুমাত্র দলীয় আনুগত্য বজায় রাখার জন্যই নয়, বরং রাজনৈতিক কৌশলের কারণেও এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে তাদের প্রভাবের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতির ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে—টিএমসিপি কি আদৌ একটি স্বতন্ত্র ছাত্র সংগঠন হিসেবে কাজ করতে সক্ষম, নাকি তারা কেবলমাত্র সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হয়ে উঠেছে? নিয়োগ দুর্নীতির ইস্যুতে তাদের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তারা শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে শাসক দলের ভাবমূর্তি রক্ষা করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর ফলে তারা কার্যত একটি ছাত্র সংগঠন হিসেবে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং রাজ্যের শিক্ষিত যুবসমাজের বড় অংশের সমর্থন হারানোর ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

এসএফআই (SFI)

এসএফআই শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তবে এর কার্যকারিতা ও প্রভাব নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন হিসেবে এসএফআই শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় তারা নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সরব হয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংগঠিত করে। প্রথম থেকেই এসএফআই

ক্যাম্পাসভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরে এবং ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মেদিনীপুর, মালদা, দুর্গাপুরসহ একাধিক জেলায় তারা বিক্ষোভ, মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে। স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর তারা সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি আন্দোলনে নামে। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট, ধর্মতলা, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারা প্রতিবাদ সংগঠিত করে এবং চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে একত্রে মিছিলে অংশ নেয়। বিধানসভা ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এসএফআই শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বিভিন্ন পোস্টার ও স্লোগানের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদকে সংগঠিত করেছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলনের সংগঠন: নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর, SFI প্রথম থেকেই এর স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানায়। SFI-এর এক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বলেন, *“নিয়োগ দুর্নীতির ফলে হাজার হাজার মেধাবী বেকার যুবকের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে। আমরা চাই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হোক”।* আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া এবং যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এতে জড়িত, তাদের শাস্তির আওতায় আনা। এসএফআই-এর আন্দোলন মূলত রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং রাজপথে বিক্ষোভ, অবস্থান, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং প্রতীকী আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল (আনন্দবাজার ২০ মে ২০২২:৭)।

সরাসরি আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি: নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে SFI কলকাতার রাজপথে একাধিকবার আন্দোলন গড়ে তোলে। এক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী বলেন, *“আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলাম, কিন্তু পুলিশ আমাদের উপর লাঠিচার্জ করে। আমাদের অনেক কর্মীকে আটক করা হয়েছে”।* তাদের পোস্টারে উঠে এসেছে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। “চাকরি বিক্রি চলবে না, শিক্ষার বাণিজ্য বন্ধ করো” বা “পয়সা দিলেই চাকরি? মেধার অবমূল্যায়ন আর চলবে না”—এমন স্লোগানযুক্ত পোস্টার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এসএফআই দাবি করেছে, নিয়োগ দুর্নীতির ফলে সাধারণ মেধাবী ছাত্র-যুবকদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হচ্ছে এবং এটি শুধুমাত্র অর্থ-বিত্তের অধিকারীদের পক্ষে সুবিধা তৈরি করছে। তাদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল সরাসরি ও আক্রমণাত্মক, যেখানে তারা সরকার ও প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। পোস্টারের পাশাপাশি তারা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজপথে গর্জে উঠেছে শক্তিশালী স্লোগানের মাধ্যমে। “শিক্ষা নয়, বাণিজ্য – চলবে না, চলবে না”, “দুর্নীতির সরকার, আর নয় দরকার”, “লুটপাটের রাজনীতি, মানছি না – মানবো না”—এমন স্লোগান আন্দোলনকারীদের মধ্যে উজ্জীবিত শক্তির সঞ্চার করেছে। বিশেষত, “মেধার কদর চাই, স্বচ্ছ নিয়োগ চাই” বা “এসএসসি দুর্নীতি হটাও, শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচাও”—এর মতো সরাসরি দাবি উত্থাপন করে তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে।

রাজনৈতিক পক্ষপাতের বিরুদ্ধে অবস্থান: SFI দাবি করে যে, এই আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় বরং এটি শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার লড়াই। SFI-এর এক নেতার ভাষায়,

"সরকার আমাদের আন্দোলনকে বিরোধী রাজনীতির অংশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু এটি নিছক ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়"। এসএফআই এই আন্দোলনকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত করেছে। তাদের ব্যানারে রাজনৈতিক বক্তব্য থাকলেও, তারা দাবি করেছে যে এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের অধিকারের প্রশ্নে পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তারা পোস্টার লাগিয়েছে এবং ক্যাম্পাসগুলিতে মিছিল করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। তাদের দাবি ছিল, সরকারের প্রশ্রয়ে চলা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এসএফআই-এর আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ে গণমাধ্যমেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, কারণ তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নও তুলেছে। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে শুরু করে প্রতীকী অনশন, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও এবং শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগের দাবিসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে তারা সরকারকে চাপে ফেলার চেষ্টা করেছে। যদিও এই আন্দোলনে অন্যান্য রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনও অংশ নিয়েছে, এসএফআই তার সংগঠিত কাঠামোর কারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে সাক্ষাৎকারে এক এসএফআই ছাত্রনেতা বলেন, "আমরা আন্দোলনটিকে এক সুশৃঙ্খল এবং আদর্শিক কাঠামোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে"।

আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা: SFI-এর এক সিনিয়র নেতা বলেন, *"এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা আদালতের দারস্থ হয়েছি, আন্দোলনও চালিয়ে যাবো। আমাদের দাবি, ভবিষ্যতে যেন শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না হয়"।* এসএফআই আন্দোলনের কৌশল হিসেবে গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে জনমত তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা নিয়োগ দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করে প্রচার করে এবং স্বচ্ছতার দাবিতে আদালতের হস্তক্ষেপ চায়। তবে, তাদের আন্দোলন একদমই নিরপেক্ষ ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। যেহেতু এসএফআই বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী, তাই তাদের আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক রং পায়।

আন্দোলনের বিস্তার ও জনসমর্থন: আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার পরেও SFI-এর সমর্থন কমেনি, বরং সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে সমর্থন পেয়েছে। এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, *"SFI নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করেছে, যা ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে"।* কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, এসএফআই সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে চাইলেও, তারা নিজেও অতীতের নানা বিতর্কের কারণে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। বামফ্রন্ট আমলেও নিয়োগে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছিল, যা এসএফআই পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি। এই কারণেই অনেক সাধারণ চাকরিপ্রার্থী এবং অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন তাদের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেনি। যদিও এসএফআই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের পুনরায় রাজনৈতিকভাবে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছে, তবুও একে শুধুমাত্র দলীয় আন্দোলন

হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। এ বিষয়ে ফোকাস গ্রুপের[57] আরেক সদস্যের মন্তব্য, "এসএফআই আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও, তাদের প্রভাব আগের মতো শক্তিশালী নয়। তবে তাদের সংগঠিত প্রচেষ্টা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আলোচনার জায়গা তৈরি করে"। কারণ, তারা বাস্তব সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে সরাসরি রাস্তায় নেমেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তবে, আন্দোলনের সফলতা পুরোপুরি নির্ভর করে বৃহত্তর ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ও এর ভবিষ্যৎ গতিপথের ওপর, যেখানে এসএফআই কতটা প্রাসঙ্গিক থাকতে পারবে, তা সময়ই বলে দেবে।

এবিভিপি ও যুব মোর্চা:

এবিভিপি (অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ) এবং BJPর যুব শাখা যুব মোর্চা শিক্ষাখাতে চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, তবে তাদের ভূমিকা ছিল রাজনৈতিকভাবে সুস্পষ্ট এবং মূলত দলীয় এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা সরব থাকলেও, তাদের কার্যক্রম কখনো কখনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলনের চেয়ে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এবিভিপি প্রথমদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির ইস্যুতে তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয় ছিল। তবে যখন আন্দোলন রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তখন তারা বিক্ষোভ, অবস্থান ও র‍্যালির মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং জেলা শহরগুলিতে তারা মিছিল সংগঠিত করে এবং শিক্ষাখাতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তোলে। কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, আসানসোল এবং কোচবিহারসহ বেশ কয়েকটি শহরে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়েছে। বিশেষত, কলকাতার ধর্মতলায় তারা বড় আকারের অবস্থান বিক্ষোভ করেছে এবং রাজ্য সরকারের দপ্তর ঘেরাও করার চেষ্টা করেছে। সৌরভ ভট্টাচার্য সাক্ষাৎকারে বলেন (এবিভিপি-র রাজ্য সহ-সম্পাদক) *"আমরা দেখেছি কীভাবে ছাত্র-যুবকদের স্বপ্ন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে মেধাহীনরা চাকরি পেয়েছে, আর প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হয়েছে। এবিভিপি প্রথম থেকেই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে"।*

যুব মোর্চার ভূমিকা আরও প্রত্যক্ষ ছিল। BJPর যুব শাখা হিসেবে তারা শুরু থেকেই দুর্নীতির ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তারা বিক্ষোভ ও অবরোধ সংগঠিত করেছে এবং BJP নেতাদের নেতৃত্বে অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করেছে। যুব মোর্চা বিভিন্ন সময়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলেছে এবং নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবিও জানিয়েছে। এই আন্দোলনে এবিভিপি ও যুব মোর্চা বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ও স্লোগানের মাধ্যমে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে।

[57] ফোকাস গ্রুপ হলো গবেষণার একটি গুণগত পদ্ধতি)Qualitative Research Method), যেখানে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর একটি ছোট দল (সাধারণত ৬ (১২ জন-আলোচনায় অংশ নেয়। গবেষক বা মডারেটর একটি কাঠামোবদ্ধ বা আধাকাঠামোবদ্ধ আলোচনার - মাধ্যমে গোষ্ঠীর মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করেন।

পোস্টারগুলিতে স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। এ ধরনের পোস্টার ও ব্যানার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিক্ষোভ মঞ্চ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, যা আন্দোলনের ব্যাপ্তি আরও বৃদ্ধি করে। এছাড়া, "টাকা দিয়ে চাকরি কেন? সরকার জবাব দাওযোগ্যদের চাকরি দিতে হবে" বা "!, দুর্নীতি রুখতে হবে"!—এই ধরনের স্লোগান দিয়ে তারা বিক্ষোভকারীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে *(আনন্দবাজার ১২ মে ২০২৪:৫)।* এক এবিভিপি নেতার সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, *"এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে, তৃণমূল সরকারের আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত। আমরা জনগণের পাশে আছি"।* এবিভিপি এবং যুব মোর্চার আন্দোলনের প্রভাব দ্বিমুখী ছিল। অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন যে (চাকরিপ্রার্থী আন্দোলনকারী) *"আমি এবিভিপি-র কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছি কারণ তারা প্রথম থেকেই নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছে। সরকার যখন আমাদের দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি, তখন এবিভিপি লড়াইকে তীব্র করেছে, যা আমাদের মনোবল বাড়িয়েছে"।* একদিকে, তারা রাজ্য সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং আন্দোলনকে আরও বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে, তাদের অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলনটি একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক রঙ পেয়ে যায়, যা কিছু নিরপেক্ষ আন্দোলনকারীদের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করে। তারা অভিযোগ করে যে, BJP-ঘনিষ্ঠ সংগঠনগুলোর এই আন্দোলনে প্রবেশ মূলত সরকারবিরোধী রাজনৈতিক লাভ তোলার কৌশল মাত্র। তবে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক অরাজনৈতিক আন্দোলনের সদস্য সাক্ষাৎকারে বলেন, "BJP আন্দোলনকে রাজনৈতিক মেরুকরণের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছে, যা অনেকাংশে আন্দোলনের মৌলিক চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে"। তবে, এটাও সত্য যে, এবিভিপি এবং যুব মোর্চার অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলনটির একটি বৃহত্তর গণসাড়া তৈরি হয়। বিশেষ করে, যখন তারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভের আয়োজন করে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়, তখন বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সংবাদমাধ্যমে আরও বেশি জায়গা পায়। এটি আন্দোলনের সার্বিক দৃশ্যপটকে প্রভাবিত করেছে এবং রাজ্য সরকারকে প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য করেছে।

অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ: নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এবিভিপি নয়, এসএফআই, আইসা ও অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনও আন্দোলন করেছে। তবে তাদের আন্দোলন ও এবিভিপি-র কৌশলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শুভম সাহা (এসএফআই নেতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন *"আমরা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সংগ্রাম করছি, তবে আমাদের আন্দোলন শুধু রাস্তায় সীমাবদ্ধ ছিল না। আমরা আদালতের মাধ্যমে প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, যা কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। এবিভিপি একে পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে ব্যবহার করেছে"।* সৌরভ দাস (আইসা কর্মী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সাক্ষাৎকারে বলেন *"এবিভিপি-র আন্দোলন শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু তারা কখনোই BJP শাসিত রাজ্যগুলোর শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে কিছু বলেনি। তাই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়"।* সমীর ঘোষ (রাজনৈতিক বিশ্লেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)*: "নিরপেক্ষতার বিচারে এবিভিপি-র আন্দোলন প্রশ্নবিদ্ধ। তারা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয়*

সরকারের অধীনে অন্যান্য শিক্ষা সংস্থাগুলোর দুর্নীতি নিয়ে নীরব থেকেছে। ফলে এটি কি প্রকৃত ছাত্র আন্দোলন, নাকি রাজনৈতিক কৌশল, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে"।

অরাজনৈতিক সংগঠন

এই আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর অরাজনৈতিক চরিত্র। ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলনের তুলনায় এটি নিজেকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে অরাজনৈতিক সংগঠনগুলি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করেছে, যা তাদের জনপ্রিয় করেছে এবং আন্দোলনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে। তারা আন্দোলনকে শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার দাবি পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। এই ধরনের অরাজনৈতিক আন্দোলনগুলিকে অনেক গবেষক নতুন সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখছেন, যেখানে আদর্শগত লড়াইয়ের পরিবর্তে বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানই মুখ্য হয়ে ওঠে। গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা এই আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রচলিত রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির তুলনায় নতুন সংগঠনগুলি ডিজিটাল প্রচারণাকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, যা আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৫ জুলাই ২০২৩)। দুর্নীতির ঘটনা সামনে আনার জন্য সাংবাদিকতা এবং সামাজিক মাধ্যমকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করতে সাহায্য করেছে। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়েছে এই গণমাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকার কারণে (*এই সময়,* ২০ আগস্ট ২০২৩)। ফলে, আন্দোলন শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজের বৃহত্তর স্তরে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আন্দোলনে পোস্টার ও স্লোগান ছিল মূলত স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আহ্বান নিয়ে। তারা নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের অধিকারের লড়াইকে সামনে রেখেছে, রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা পোস্টার এবং ব্যানারের মাধ্যমে তাদের দাবিগুলো তুলে ধরেছে। পোস্টারগুলোর মধ্যে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল, "যোগ্যদের চাকরি দিতে হবে, দুর্নীতিবাজদের শাস্তি চাই" এবং "টাকা নয়, মেধাই হোক চাকরির মাপকাঠি"। *(সংবাদ প্রতিদিন, ১০ অক্টোবর ২০২৩)* এসব পোস্টারে দুর্নীতির শিকার চাকরিপ্রার্থীদের বঞ্চনার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা দাবি করা হয়েছে। স্লোগানগুলোও ছিল সরাসরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং ন্যায্যতার পক্ষে। মিছিলের সময় বিক্ষোভকারীরা একসঙ্গে উচ্চারণ করেছে, "আমাদের দাবি, ন্যায্য নিয়োগ", "দুর্নীতি রুখবো, স্বচ্ছ নিয়োগ গড়বো" এবং "চাকরি বিক্রি চলবে না, প্রাপ্যদের চাকরি দিতে হবে" (এবেলা, ২ ডিসেম্বর ২০২৩)। এসব স্লোগানে চাকরিপ্রার্থীদের হতাশা, ক্ষোভ এবং ন্যায্যতার দাবি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আন্দোলনকারীরা এসব স্লোগানকে তাদের প্রতিবাদের

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে, যাতে জনসাধারণের মধ্যে এই দুর্নীতির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয় এবং সরকারের ওপর চাপ বাড়ে।

গবেষণার পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নতুন সংগঠনগুলির আন্দোলনের ধরন এবং কৌশলগত অবস্থান ঐতিহ্যগত ছাত্র সংগঠনগুলির তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। এই নতুন সংগঠনগুলির উদ্যোগ আন্দোলনের অরাজনৈতিক চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছে, যা জনসমর্থন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে[4]। ফোকাস গ্রুপের অনেক সদস্য এবং আন্দোলনে জড়িত অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির এক প্রতিনিধি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, "রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার কারণে অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে"।[5] তবে, দীর্ঘমেয়াদে এই নিরপেক্ষতা কতটা কার্যকর হবে, সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন? এই প্রসঙ্গে ফোকাস গ্রুপের এক তরুণ সদস্য বলেন, "এই আন্দোলন আমাদের দেখিয়েছে, কেবল রাজনৈতিক দলগুলির ওপর নির্ভর করলে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়"। সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন হতে পারে, কারণ শুধুমাত্র সামাজিক আন্দোলন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে যথেষ্ট নাও হতে পারে। অতীতে দেখা গেছে, ছাত্র আন্দোলনগুলি তখনই দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে, যখন তা রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আন্দোলন মূলত কয়েকটি ধাপে গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। প্রথমদিকে, এই আন্দোলন ছিল অনলাইন ভিত্তিক, যেখানে সামাজিক মাধ্যমে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করা এবং চাকরিপ্রার্থীদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা হয়। ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবে প্রচার চালিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির নানা দিক তুলে ধরা হয় এবং জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়[6]। এরপর আন্দোলন রাস্তায় নেমে আসে। প্রথমে ছোট পরিসরে কিছু চাকরিপ্রার্থী ও শিক্ষার্থী প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয়, যেখানে তারা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ করে। ধীরে ধীরে আন্দোলন বড় আকার নেয় এবং বিভিন্ন শহরে মিছিল, পথসভা ও অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা নিজেদের দাবি তুলে ধরে। তৃতীয় পর্যায়ে, সংগঠনগুলো আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে আইনি লড়াই শুরু করে[7]। আন্দোলনকারীরা দুর্নীতির তদন্ত ও নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়ে মামলা করে এবং আদালতের রায়ের মাধ্যমে নিজেদের দাবিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যায়ে, আন্দোলন রাজ্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পেতে শুরু করে। দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলনের কৌশল হিসেবে অনশন, প্রতীকী প্রতিবাদ, এবং মিডিয়ার সামনে দুর্নীতির নতুন তথ্য প্রকাশ করার ধারা গড়ে ওঠে। সব মিলিয়ে, অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত, জনসমর্থনভিত্তিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকলেও ব্যাপক জনমত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাখাতে চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে, যেখানে ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে নতুন নেতৃত্ব উঠে এসেছে। অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির নেতৃত্বে এই আন্দোলন স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার দাবি তুলেছে এবং জনগণের সমর্থন পেয়েছে। তবে আন্দোলনের

ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই সংগঠনগুলি তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে কিনা এবং সামাজিক ও গণমাধ্যমের সমর্থন ধরে রেখে দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তার ওপর। যদি এই আন্দোলন কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, তবে এটি শুধুমাত্র একটি সাময়িক প্রতিবাদ হিসেবে থেকে যাবে না, বরং পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

আন্দোলনে নতুন মুখ

আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র অনেক বদলেছে, বিশেষ করে শিক্ষাখাতে চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক প্রতিবাদগুলিতে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির পাশাপাশি নতুন ধরনের অরাজনৈতিক সংগঠন উঠে এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে, ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত হতো। ১৯৭০-৮০ এর দশকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন, বিশেষত এসএফআই, শিক্ষার গণতান্ত্রিকরণের দাবিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। তাদের আন্দোলন শুধু শিক্ষাক্ষেত্রের সীমায় আবদ্ধ ছিল না; বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের অংশ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য একেবারেই ভিন্ন।

এই আন্দোলনগুলি অনেকাংশেই রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃত্বের বাইরে সংগঠিত হয়েছে। ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যাগেইনস্ট করাপশন এবং ইয়ুথ ফর ট্রান্সপারেন্সি[58] এর মতো বাংলায় নতুন সংগঠন বা ফোরাম নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছে। এই পরিবর্তনের মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রচলিত ছাত্র সংগঠনগুলির ওপর ছাত্রদের আস্থাহীনতা। চাকরি দুর্নীতির মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলি যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তা সাধারণ আন্দোলনকারীদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সংশ্লিষ্টতা আন্দোলনকে দলীয় স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করার আশঙ্কা তৈরি করে, যা আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, ছাত্রদের একাংশ মনে করতে শুরু করে যে আন্দোলনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন রাখতে হলে রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে থাকতে হবে। এই নতুন সংগঠনগুলির উত্থানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রচলিত রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির মতো বিশাল সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়াই, শুধুমাত্র ডিজিটাল প্রচার ও স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আন্দোলনকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে #JusticeForStudents এবং #CorruptionFreeEducation এর মতো প্রচারণাগুলির মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করেছে। বুদ্ধিজীবী মহল ও নাগরিক সমাজের একাংশ এই

[58] United Students Against Corruption (USAC) এবং Youth for Transparency (YFT) মূলত ছাত্র ও যুবসমাজের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বা সংগঠন। এগুলো সাধারণত বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে শিক্ষা, প্রশাসন, ও রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবাদ, ও নীতিগত সংস্কারের দাবিতে কাজ করে।

আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে, কারণ এটি দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকে শিক্ষাখাতের স্বচ্ছতা রক্ষার দাবি তুলেছে।

এই অরাজনৈতিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত। আন্দোলনকারীরা জানত যে যদি রাজনৈতিক সংগঠনগুলি নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তবে সরকার সহজেই এটিকে বিরোধী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাগিয়ে দিতে পারত। ফলে, আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। তবে এই ধরনের সংগঠনের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মতো সুসংগঠিত কাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব এই সংগঠনগুলির কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে ফেলে। নেতৃত্বের স্থায়িত্ব ও আন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই এই সংগঠনগুলি আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে (আনন্দবাজার ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২২:৫)। সরকার ও প্রশাসনের দমননীতির মোকাবিলা করাও এই সংগঠনগুলির জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলির একটি সুসংগঠিত কাঠামো থাকায় তারা প্রশাসনের চাপ ও দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে এই সক্ষমতা অনেক কম, ফলে প্রশাসন সহজেই তাদের আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়ার কৌশল নিতে পারে। এছাড়াও, শুধুমাত্র দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়; দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রয়োজন। কিন্তু এই নতুন সংগঠনগুলি মূলত অরাজনৈতিক থাকার কারণে, অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের পরিণতি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হতে পারে। যদিও এই আন্দোলনের স্বতন্ত্র চরিত্র জনসমর্থন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তবে এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সংগঠনগুলির নেতৃত্ব, কৌশল এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ওপর। যদি এই সংগঠনগুলি সংগঠিত কাঠামোর অভাব দূর করতে পারে এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে, তাহলে এটি পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। তবে রাজনৈতিক দর্শন ও কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ দীর্ঘস্থায়ী ফল আনতে পারবে কি না, তা নিয়ে এখনো প্রশ্ন থেকে যায়।

আন্দোলনের গতিপথ বিশ্লেষণ

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস একটি দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যময় ধারার প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন একটি নতুন ধরনের সামাজিক প্রতিবাদের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। তবে এটি কি পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, নাকি এটি সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান গতিপথ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনগুলি মূলত রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত ছিল। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে এসএফআই ও অন্যান্য মার্ক্সবাদী ছাত্র সংগঠন আদর্শগত ভিত্তিতে আন্দোলন করেছিল, যা মার্ক্সবাদী চিন্তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। গুহ উল্লেখ করেন যে, "১৯৭০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলনগুলি ছিল অত্যন্ত আদর্শিক এবং এটি সরাসরি সমাজের শোষণহীন আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত ছিল" (গুহ ১৯৮২:১৭৫)। এই সময়ের ছাত্র আন্দোলনগুলি ছিল স্পষ্ট রাজনৈতিক এজেন্ডা দ্বারা পরিচালিত এবং প্রায়শই সহিংস সংঘর্ষের দিকে মোড় নিত। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনকে অনেক গবেষক 'নয়া সামাজিক আন্দোলন' বলে অভিহিত করেছেন[59]। মুখার্জি উল্লেখ করেছেন যে, "নয়া সামাজিক আন্দোলনগুলি মূলত অরাজনৈতিক এবং এটি সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরিচালিত হয়, বিশেষ করে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমানাধিকারের দাবিতে" (মুখার্জি ২০২৩:৯৮)। এই আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে এবং স্বতন্ত্র ছাত্র ও নাগরিক সমাজের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। যদিও বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং BJPর ছাত্র শাখা এবিভিপি সাম্প্রতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিল, তারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেনি। সাধারণ চাকরি প্রার্থীরা, যারা অতীতে রাজনীতির বাইরে ছিল, তারাই এই আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠে। চ্যাটার্জি মন্তব্য করেছেন, "এসএফআই এবং এবিভিপি উভয়ই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ আন্দোলনটি রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছে" (চ্যাটার্জি ২০২৪:১১২)। বর্তমান আন্দোলনে এই ভিন্নতাটি স্পষ্ট, যা পূর্ববর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের তুলনায় আলাদা এক প্রবণতা নির্দেশ করে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছে এবং নয়া সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র ধারণ করেছে। যদিও রাজনৈতিক সংগঠনগুলি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত, আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে সাধারণ ছাত্ররা, যারা অতীতে রাজনীতির বাইরে ছিল। এটি প্রমাণ করে যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ছাত্র আন্দোলন নতুন পথে অগ্রসর হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি আন্দোলনের প্রভাব এই চ্যাপ্টারটিকে বিশ্লেষণ করলে যে সমস্ত দিক গুলি উঠে এসেছে সেগুলি হল-

রাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলন থেকে অরাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে পরিবর্তন: পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৬০-৭০ দশকের নকশাল আন্দোলন থেকে শুরু করে, ২০০০-এর দশকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্যন্ত, ছাত্ররা সাধারণত বামপন্থী বা ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের ব্যানারে আন্দোলন করেছে। কিন্তু চাকরি

[59] নয়া সামাজিক আন্দোলন (New Social Movements - NSM) হল ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে উদ্ভূত এমন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, যা মূলত পরিবেশবাদ, মানবাধিকার, নারী আন্দোলন, আদিবাসী অধিকার, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি, ও বিকল্প বৈশ্বিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনগুলো প্রথাগত শ্রেণিসংগ্রাম বা অর্থনৈতিক লড়াইয়ের চেয়ে সাংস্কৃতিক, পরিচয় ও জীবনধারার পরিবর্তনের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এই ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। অটোনোমাস মুভমেন্ট থিওরি (Autonomous Movement Theory) অনুসারে, যখন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক কাঠামো জনগণের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে, তখন বিকল্প সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এখানে ছাত্র ও চাকরি প্রার্থীরা রাজনীতিকদের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের শক্তিতেই আন্দোলন সংগঠিত করছে, যা একটি স্বতন্ত্র নাগরিক আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে। নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি (New Social Movement - NSM) অনুসারে, আধুনিক আন্দোলন কেবলমাত্র ক্ষমতার হাত বদল বা সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় না; বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার দাবি তোলে। চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন মূলত প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতার দাবিতে গড়ে ওঠা একটি নৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, যেখানে ক্ষমতা পরিবর্তনের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্দোলনের বিস্তার ও বিকেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব: এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা। আগে যেখানে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হতো রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যানারে, সেখানে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করছে। ম্যানুয়েল কাস্টেলসের 'নেটওয়ার্কড মুভমেন্ট' তত্ত্ব (Manuel Castells, 2012) অনুসারে, সামাজিক আন্দোলন এখন আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং ডিজিটাল মিডিয়া ও অনলাইন কমিউনিটি আন্দোলনের মূল সংগঠক হয়ে উঠছে। বিকেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব – এই আন্দোলনে কোনো নির্দিষ্ট নেতৃত্ব নেই, বরং এটি একধরনের 'ক্রাউডসোর্সড মুভমেন্ট', যেখানে আন্দোলনকারীরা সমানভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারছে এবং নতুন কৌশল নির্ধারণ করতে পারছে।[60]

সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া: দমন ও রাজনৈতিক দ্বিচারিতা: এই আন্দোলনের প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়া দ্বিমুখী। একদিকে সরকার চাকরি দুর্নীতির বিষয়ে কিছু তদন্ত চালাচ্ছে, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের দমনে পুলিশি শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আলথুসারের 'আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারাটাস' (Louis Althusser, 1971) অনুসারে, রাষ্ট্র কেবল বলপ্রয়োগ করে না, বরং শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে জনগণের ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখাচ্ছে যে, এই প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ আন্দোলন প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে সংগঠিত হচ্ছে। গ্রামসি'র 'হেজিমনি' তত্ত্ব (Antonio Gramsci, 1930s) অনুসারে, ক্ষমতাসীন দল বা রাষ্ট্র কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না; বরং তারা সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এই আন্দোলন দেখাচ্ছে যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হচ্ছে, যা রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[60] ক্রাউডসোর্সড মুভমেন্ট হলো একটি বিকেন্দ্রীভূত (decentralized) সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন, যেখানে নেতৃত্ব বা সংগঠন কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির হাতে থাকে না, বরং জনগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও অনলাইন সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

রাজনীতির ছত্রছায়ায় না থাকা আন্দোলন ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া: শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন মূলত স্বতঃস্ফূর্ত এবং অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে পথে নেমেছে। এখানে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব নেই, বরং শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চাকরি প্রার্থীরা যৌথভাবে প্রতিবাদ করছে। প্রথমদিকে প্রশাসন এই আন্দোলনকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্রমশ আন্দোলন তীব্রতর হলে কঠোর দমন নীতি গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে পুলিশি হস্তক্ষেপ, বিক্ষোভকারীদের ওপর বলপ্রয়োগ, গ্রেপ্তার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় আদালতের মাধ্যমে কিছু আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হলেও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দ্বিচারিতা দেখা গেছে—একদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের দমনেরও চেষ্টা চলছে। এডওয়ার্ড শিলস-এর 'সিভিক এনগেজমেন্ট' তত্ত্ব (Edward Shils, 1971) অনুসারে, গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণই ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা আনে। আলথুসারের 'আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারাটাস' (Louis Althusser, 1971) অনুযায়ী, রাষ্ট্র শুধুমাত্র দমনমূলক শক্তি ব্যবহার করে না, বরং শিক্ষা, মিডিয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে জনগণের ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ থেকে কিছু আন্দোলন বেরিয়ে আসছে, যা রাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

সামাজিক মাধ্যম ও বিকল্প আন্দোলনের রূপ: চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। আন্দোলনকারীরা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে এবং জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। কাস্টেলসের 'নেটওয়ার্কড মুভমেন্ট' তত্ত্ব (Manuel Castells, 2012) অনুসারে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জনগণের প্রতিবাদের নতুন রূপ তৈরি করে, যেখানে আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব বিকেন্দ্রীভূত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা সমানভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ পায়।

ছাত্র ও চাকরি প্রার্থীদের মিলিত আন্দোলন এবং সামাজিক সংহতির নতুন রূপ: সাধারণত ছাত্র আন্দোলন ও চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন পৃথকভাবে সংঘটিত হয়। কিন্তু এই আন্দোলনে ছাত্ররা এবং চাকরি প্রত্যাশীরা একসাথে বিক্ষোভ করছে, যা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পিয়ের বুর্দিয়োর 'সোশ্যাল ক্যাপিটাল' তত্ত্ব (Pierre Bourdieu, 1986) অনুসারে, যখন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী পারস্পরিক সংযোগ গড়ে তোলে এবং যৌথভাবে দাবিদাওয়া উপস্থাপন করে, তখন তাদের আন্দোলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামসি'র 'হেজিমনি' তত্ত্ব (Antonio Gramsci, 1930s) অনুসারে, রাষ্ট্রশক্তি ও ক্ষমতার কাঠামো শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না, বরং সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক আধিপত্যের মাধ্যমে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করে। চাকরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন এ ধরনের রাষ্ট্রীয় আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে।

অর্থাৎ এই আন্দোলন আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে যে বিষয়ে উপলব্ধি আমি করছি তা হল পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ধারা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটি দেখাচ্ছে যে,

- অরাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে—যেখানে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর না করেও সংগঠিত হচ্ছে।
- রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বাড়ছে, যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারে।
- সোশ্যাল মিডিয়া আন্দোলনের শক্তি হিসেবে কাজ করছে, যা প্রচলিত আন্দোলনের ধরণ পরিবর্তন করছে।
- ছাত্র ও চাকরি প্রার্থীদের সংহতি নতুন ধরনের সামাজিক জোট তৈরি করছে, যা ভবিষ্যতে রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে।

এরপর পরবর্তী অধ্যায়ে, যেখানে সন্দেশখালি ঘটনার প্রেক্ষিতে সংগঠিত আন্দোলনের আলোচনা ও বর্ণনা থেকে বিশ্লেষণ করবো এই ছাত্র আন্দোলনের ধারার আর কি কি পরিবর্তন হচ্ছে, এবং কিভাবে তা সমাজ, রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনের ধারাকে পথ দেখাচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্দেশখালি: রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও ছাত্র আন্দোলন

ভূমিকা

সন্দেশখালির সমস্যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাম্প্রতিকতম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট হয়ে উঠেছে। এখানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি একত্রে মিশে গেছে, যা এই সমস্যাকে আরও সংকটময় করে তুলেছে। এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক ভাবে সংবেদনশীল, যেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, স্থানীয় স্বার্থের সংঘাত এবং সামাজিক বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্যে শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। জমি দখল, মহিলাদের ওপর অত্যাচার, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এই সমস্ত অভিযোগ জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিরোধী দলগুলি এই ঘটনাকে শাসক দলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, অন্যদিকে শাসক দলও নিজস্ব অবস্থান দৃঢ় করতে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। ফলে সমস্যার রাজনীতিকরণ এতটাই তীব্র হয়েছে যে, মূল সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধানের বদলে তা রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং পুলিশের দেরি করে পদক্ষেপ নেওয়া পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের নিরাপত্তাহীন বলে মনে করে, তখন তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়, যা আইনশৃঙ্খলার অবনতিকে ত্বরান্বিত করে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, যা এই ক্ষেত্রে অনেকাংশে অনুপস্থিত ছিল। রাজনৈতিক চাপের কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও সঠিক সময়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। এই সংকটের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। সন্দেশখালির বেশিরভাগ মানুষ কৃষি এবং ছোটখাট ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাম্প্রতিক অস্থিরতা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। বিশেষত নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ সমাজে এক ধরনের আতঙ্ক এবং নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। সন্দেশখালি, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে অবস্থিত, যা সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতা, জমি দখল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহান এবং তার

সহযোগীদের বিরুদ্ধে জমি দখল, রেশন দুর্নীতি এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে। ২০২৪ খ্রিঃ জানুয়ারিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)[61] রেশন দুর্নীতির তদন্তে গেলে তাদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে, যা আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এই ঘটনার পর, স্থানীয় বাসিন্দারা সাহস সঞ্চয় করে জমি দখল ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। অনেকেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে শুরু করেন, যা আগে ভয়ে সম্ভব ছিল না। ফলে, পুলিশ-প্রশাসন জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয় এবং শতাধিক মানুষের জমি ফেরত দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের ফলে সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে।

এই অধ্যায়ে আমি সন্দেশখালি অঞ্চলের জমি দখল ও অত্যাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো। এবং এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করবো ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রবাহকে মাথায় রেখে। আমি এই আলোচনা এবং বিশ্লেষণ গুলি করবো—প্রথমে সন্দেশখালি ঘটনার বা আন্দোলনের পটভূমিকা কি ছিল, কি কি কারণে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি আলোচনা করবো। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা যেমন– জমিহারা সম্প্রদায়, মহিলা এবং স্থানীয় জনগণের চিন্তা ও মতামত কিভাবে এই আন্দোলনকে প্রতিবাদীদের হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। তার পরের অংশে আমি আলোচনা করবো যে রাজনৈতিক দল সরকারে ছিল তার পদক্ষেপ ও নীতি নিয়ে। এবং এর মাধ্যমে কিভাবে রাজ্য সরকার পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনকে তৈরি করে দিল। একই সাথে বিরোধী আসনে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও ভূমিকা থাকলে সেগুলিও আলোচনা করবো। এই আলোচনা করার পর এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এর পর আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, তারা কি করে এই আন্দোলনে বিভিন্ন ভাবে নানারকম ভূমিকা পালন করেছিল। এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন ভাবে কি ধরনের বক্তব্য এবং ধারনা প্রদান করেছে সেই বিষয়গুলি আলোচনা করবো।

[61] ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate-ED) হলো ভারতের একটি বিশেষ তদন্ত সংস্থা, যা অর্থনৈতিক অপরাধ ও অর্থপাচারের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ ও তদন্ত পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

সন্দেশখালিঃ ভৌগোলিক পরিচিতি

সন্দেশখালি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লক, যা সুন্দরবনের বিস্তৃত পরিবেশগত এবং ভূপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার অংশ। এটি হুগলি নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত এবং দক্ষিণে বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার সঙ্গে যুক্ত। সন্দেশখালি অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। এর ভৌগোলিক অবস্থান একদিকে যেমন কৃষি ও মৎস্য চাষকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে, অন্যদিকে প্রশাসনিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সন্দেশখালি ব্লক সুন্দরবনের অংশ হওয়ায় এটি নদীবেষ্টিত একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলটি দক্ষিণবঙ্গের জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রভাবিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল, কালিন্দী—এই নদীগুলো সন্দেশখালির পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নদীগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন সেচ ব্যবস্থা কার্যকর হয়, অন্যদিকে মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নদীভাঙন, প্লাবন এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, যা কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বসিরহাট, বারাসত, ক্যানিং—এই শহরগুলোর সঙ্গে সন্দেশখালির যোগাযোগ রয়েছে। তবে এই সংযোগ প্রধানত জলপথ ও কিছু দুর্বল সড়ক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ফলে জরুরি পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশাসনিক তদারকি প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়। সন্দেশখালির ভৌগোলিক অবস্থান সরাসরি এর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছে। নদীপথই মূল পরিবহনের মাধ্যম। সন্দেশখালির বেশিরভাগ গ্রামে পাকা রাস্তা নেই বা পর্যাপ্ত ব্রিজের অভাব রয়েছে। ফলে বর্ষাকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে যায়। নদী ও জলাভূমির আধিক্যের কারণে এখানে পর্যাপ্ত পুলিশ স্টেশন বা প্রশাসনিক দপ্তর গড়ে ওঠেনি, যা আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর আধিপত্য সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায়শই সুশাসনের অভাবে দুর্নীতির শিকার হন। সন্দেশখালির প্রধান জীবিকা কৃষি ও মৎস্যচাষ। তবে সুন্দরবনের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং নদীর উচ্চ লবণাক্ততার কারণে কৃষি উৎপাদনশীলতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়।[62] সুন্দরবনের অংশ হওয়ায় এখানকার বনজসম্পদ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় বাসিন্দারা মধু সংগ্রহ, কাঠ কাটা, মাছ ধরা ও নদী সংলগ্ন কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। তবে প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে এই বনজসম্পদ অনেক সময় অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়।

[62]সুন্দরবন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত, যা নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ। এখানকার ভূমি প্রধানত নদীর সঞ্চিত পলিমাটির স্তরে গঠিত এবং সময়ের সঙ্গে এর পরিবর্তন ঘটে।

সন্দেশখালিতে আন্দোলনের পটভূমি

২০২৪ খ্রিঃ জানুয়ারিতে ইডি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের[63] বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতি ও অন্যান্য আর্থিক অনিয়মের তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তের প্রক্রিয়ায় সন্দেশখালিতে ইডির আধিকারিকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ইডির গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং অফিসারদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এই ঘটনা প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের মনোভাব ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ২৫ জানুয়ারি ২০২৪)। এই ঘটনার পর শেখ শাহজাহান পলাতক হন এবং প্রশাসন তার বিরুদ্ধে তদন্তের পরিধি বৃদ্ধি করে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সন্দেশখালির স্থানীয় কিছু নারী ও বাসিন্দারা তার বিরুদ্ধে জমি দখল, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ আনেন। এই অভিযোগগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তি শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে নয়, বরং স্থানীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও ক্ষমতাসীন দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দিকেও ইঙ্গিত করে (*দ্য টেলিগ্রাফ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। সন্দেশখালির ঘটনা শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয় এটি ছিল বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর একটি প্রতিফলন। এই অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের প্রভাবশালী অবস্থান—এই সমস্ত কিছু মিলিয়েই এই সংঘাতকে তীব্রতর করেছে। এবং এই ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক মহল ও নাগরিক সমাজে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে।

প্রথম পর্যায়ে খুব সাধারণ ভাবেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ চোখে পরার মতন ছিল, সন্দেশখালির ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পরতে দেখা যায়। বিশেষ করে নারীরা সরব হয়ে ওঠেন এবং রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে শেখ শাহজাহান ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে জমি দখল, আর্থিক প্রতারণা ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ থাকলেও, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি। তবে ইডির তদন্ত ও তার পলাতক হয়ে যাওয়ার পর এই ভয়ের সংস্কৃতি ভেঙে পরতে শুরু করে এবং জনগণের মধ্যে জমে থাকা

[63]শেখ শাহজাহান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি এলাকার একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। বর্তমানে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সন্দেশখালি-১ নম্বর ব্লকের সভাপতি এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হয়। প্রতিবাদী নারীদের অভিযোগ ছিল যে, শেখ শাহজাহানের লোকজন বহুদিন ধরে তাদের কৃষিজমি ও বসত ভিটা দখল করছে। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের ভয় দেখানো হতো কিংবা আর্থিক লেনদেনের ফাঁদে ফেলে দমন করা হতো। অনেক মহিলাই জানান, তারা দীর্ঘদিন ধরে শোষণের শিকার হয়েছেন, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। তবে এই ঘটনার পর যখন প্রশাসন তদন্ত শুরু করে এবং সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে, তখন তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করেন। একের পর এক নারী শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও জমি দখলের অভিযোগ আনেন, যা পুরো বিষয়টিকে আরও গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যায়। বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে এবং স্থানীয় মানুষরা শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারের দাবি তুলতে থাকেন। তারা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। মহিলাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না, এটি ছিল ক্ষমতার অপব্যবহার ও দীর্ঘদিনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের একটি দৃষ্টান্ত।

ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বুর্দিয়োর মতে, "প্রতীকী ক্ষমতা ও সামাজিক মূলধনের মাধ্যমে প্রভাবশালীরা তাদের আধিপত্য বজায় রাখেন, যা সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে দমন করে রাখে" (বুর্দিয়ু ১৯৭৭:১২৩)। সন্দেশখালির এই প্রতিবাদ সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া, যেখানে নির্যাতিতরা নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে নেমেছেন। প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি, এই আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। সন্দেশখালির আন্দোলন সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হলেও, এটি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সামাজিক ও প্রশাসনিক সংকটকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পর রাজ্যের বিরোধী দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে সন্দেশখালির প্রসঙ্গকে সামনে নিয়ে আসে এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে শুরু করে। ঘটনার পরপরই বিজেপি এটিকে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে। ঐ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ও সভা আয়োজন করতে শুরু করে এবং রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে। বিজেপির দাবি ছিল, এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, শাসক দলের একাংশের প্রত্যক্ষ মদতে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা তৈরি

হয়েছে এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে (*দ্যা টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪*)। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিও ওঠে, যা রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তোলে। বামপন্থী দলগুলো সন্দেশখালির আন্দোলনকে নিছক প্রশাসনিক ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবে নয়, বরং সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই হিসেবে তুলে ধরে। সিপিআই(এম) ও অন্যান্য বাম দলগুলোর মতে, এই ঘটনা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার সংকটের প্রতিফলন (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০২৪*)। তাদের মতে, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে জমি দখল ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে নিপীড়িত করে এসেছে, যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভূমির ন্যায্য বণ্টনের দাবিতে সাধারণ মানুষ যখন রাস্তায় নামে, তখন একে নিছক রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখা উচিত নয় বলে বামপন্থীরা মন্তব্য করেন। শুরুতে তৃণমূল কংগ্রেস সন্দেশখালির আন্দোলনকে বিরোধী দলের চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করে এবং বিজেপির বিরোধী রাজনীতি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং জনরোষ বৃদ্ধির কারণে দলের একাংশ শেখ শাহজাহান-এর থেকে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করে। পুলিশের তদন্ত এবং ক্রমাগত জনমতের চাপে তৃণমূলের অবস্থানও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলীয় অভ্যন্তরে ভিন্নমতও দেখা যায়, যা শাসক দলের কৌশল নির্ধারণে প্রভাব ফেলে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোকে সন্দেশখালির আন্দোলনকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও জনগণের প্রতিরোধের প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। অ্যান্টোনিও গ্রামশি-এর মতে, শাসক শ্রেণির ক্ষমতা কেবল বলপ্রয়োগের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং জনগণের সম্মতি ও সামাজিক প্রভাব বজায় রাখার উপর নির্ভরশীল (গ্রামশি ১৯৭১:৯৭-৯৯)। সন্দেশখালির ঘটনায় দেখা যায়, যখন শাসক দলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তি জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তখন জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন শুধুমাত্র শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ছিল না; এটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে একটি বড় সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। সন্দেশখালির ঘটনার পর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্ত ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জনরোষ, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ এবং বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের ফলে তদন্ত প্রক্রিয়া একাধিক দিকে অগ্রসর হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশি অভিযান জোরদার করা হয় এবং

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়। শেখ শাহজাহান দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনের নজরে থাকলেও সন্দেশখালির ঘটনার পর তার বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান আরও তীব্র হয়। কয়েক সপ্তাহের অনুসন্ধান ও নজরদারির পর পুলিশের বিশেষ দল তাকে আটক করে (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২০ মার্চ ২০২৪*)। গ্রেপ্তারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে একাধিক বিতর্কিত বিষয় উঠে আসে, যার মধ্যে অবৈধ ভাবে অপরের সম্পত্তি দখল এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনার নির্দিষ্ট কিছু দিকের তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে স্থানান্তর করে (*দ্য হিন্দু, ১৫ এপ্রিল ২০২৪*)। বিশেষ করে, স্থানীয় মহিলাদের করা অভিযোগ এবং সম্পত্তি দখলের ঘটনাগুলো সিবিআই-এর তদন্তের আওতায় আসে। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখে। সরকারি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। একাধিক পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে দখলকৃত জমি প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মে ২০২৪*)। জমি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের দিকেও নজর দেওয়া হয়। প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার এই ধাপগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, সন্দেশখালির ঘটনা শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ ছিল না; বরং এটি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জটিল প্রক্রিয়ার অংশ ছিল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও তদন্তকারী সংস্থাগুলোর পদক্ষেপ এই বাস্তবতাকে আরও উন্মোচিত করে, যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রভাবশালীরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। সন্দেশখালির আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শোষণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বছরের পর বছর তাদের অধিকার ও সম্পত্তি কেড়ে নিচ্ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে জমি দখল, আর্থিক প্রতারণা ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ ধামাচাপা পরলেও, পরিস্থিতি এক সময় ফুঁসে ওঠে এবং সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে সামিল হয়। সন্দেশখলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিষয়ের ওপর ভর করে এটি একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

স্থানীয়দের মতে, শেখ শাহজাহান ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা বিভিন্নভাবে জমি ও সম্পত্তির উপর অনৈতিক দখল বজায় রেখেছিল। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কৃষিজমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখলের ঘটনাগুলো নিয়ে

ক্ষোভ তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ হয়ে ওঠে (*দ্য টেলিগ্রাফ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪*)। জমি দখলের পাশাপাশি, নারী নির্যাতনের অভিযোগও সামনে আসে। অনেকেই দাবি করেন, ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের ছত্রচ্ছায়ায় দীর্ঘদিন ধরে নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলছিল, কিন্তু প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে তারা ন্যায়বিচার পাননি (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ ২০২৪*)।

অন্যদিকে, সরকারি রেশন দুর্নীতিতে শেখ শাহজাহান এর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি ইডি তদন্তে উঠে আসে। রাজ্যজুড়ে রেশন বণ্টনে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ আগেই ছিল, কিন্তু সন্দেশখালির ঘটনায় তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ইডির তদন্তের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের বাধার মুখে পড়তে হয় (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২২ জানুয়ারি ২০২৪*)। এই সমস্ত ঘটনার ধারাবাহিকতায় শেখ শাহজাহান গা ঢাকা দেন, যা জনমানসে আরও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তার অনুপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসে এবং দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। দীর্ঘদিনের অবদমিত ক্ষোভ, জমি ও রেশন দুর্নীতি নিয়ে জনরোষ এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এই সমস্ত কারণ একত্রে সন্দেশখালির আন্দোলনকে জন্ম দেয় এবং তা রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়ে পরে। সন্দেশখালির আন্দোলন ক্রমশ এক স্বতঃস্ফূর্ত গণপ্রতিরোধের রূপ নেয়। প্রথমদিকে, এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের ক্ষোভ, যারা জমি দখল ও দীর্ঘদিনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধীরে ধীরে সংগঠিত প্রতিরোধে পরিণত হয়। ২০২৪ খ্রিঃ জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সন্দেশখালির বিভিন্ন গ্রামের নারী ও পুরুষ সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদে শামিল হন। জমি দখল ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভ জনবিক্ষোভের মাধ্যমে প্রকাশ পায় (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪*)। আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। দীর্ঘদিন ধরে নারী নির্যাতনের অভিযোগ থাকলেও, তা প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে সামনে আসেনি। তবে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ওঠা নতুন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক নারী প্রকাশ্যে এসে তাদের অভিজ্ঞতা জানান এবং বিচার ও সুরক্ষার দাবি তোলেন (*দ্য টেলিগ্রাফ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪*)। প্রাথমিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকা এই প্রতিবাদ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। একাধিক ব্লক জুড়ে সাধারণ মানুষ সংগঠিত হতে শুরু করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের বাইরে গিয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামেন। সন্দেশখালির বিভিন্ন অঞ্চলে পথ অবরোধ, সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত

হতে থাকে, যা প্রশাসনকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪*)। এই প্রতিরোধ শুধুমাত্র শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং এটি সামগ্রিকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন দলের একাংশের নিরবতা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এই বিক্ষোভকে আরও তীব্র করে তোলে, যা সন্দেশখালির আন্দোলনকে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা

সন্দেশখালির আন্দোলনের বিস্তার ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে মূলত স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এই প্রতিরোধ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে সংগঠিত হয়নি; বরং শোষণ, দুর্নীতি এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে। জমিহারা কৃষক, নারীদের সক্রিয়তা ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও সুচিন্তিত মতামত, স্থানীয় প্রশাসন এই আন্দোলনকে শুধু বৃহত্তর গণআন্দোলনে রূপ দেয়নি, এটি প্রশাসন ও রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতেও বাধ্য করেছে।

জমিহারা কৃষকদের ভূমিকা

সন্দেশখালির আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী কৃষকদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল তাঁদের দখল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধার করা, যা মূলত কৃষিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল। এই অঞ্চলের জমির ধরন মূলত উর্বর এবং কৃষিকাজের উপযোগী ছিল, যেখানে ধান, সর্ষে, শাক-সব্জি এবং মাছ চাষ প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে প্রচলিত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই কৃষিজীবী পরিবারগুলো নিজেদের জমিতে স্বনির্ভর চাষাবাদ করত, যা শুধুমাত্র তাঁদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিল না, বরং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ ২০২৪*)। স্থানীয় এক কৃষক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানান, *“আমাদের জমিতে ধান আর সর্ষের চাষ হতো। আমরা নিজেরা খেতাম, কিছু বিক্রি করতাম। কিন্তু এখন আমাদের আর কিছুই নেই। জমি দখল হয়ে যাওয়ার পর অন্যের মাঠে মজুরের কাজ করতে হচ্ছে।”* এছাড়া, সন্দেশখালির একটি বড় অংশ জলাভূমি ও খাল-বিল অধ্যুষিত

হওয়ায় সেখানে মাছচাষও অন্যতম প্রধান জীবিকা ছিল। এই অঞ্চলের অনেক কৃষক নিজেদের জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করতেন, যা তাদের আয়ের একটি বড় উৎস ছিল। কিন্তু জমি দখলের ফলে তারা মাছচাষ থেকেও বঞ্চিত হন (*দ্য টেলিগ্রাফ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪*)। এক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বলেন, *"পুকুর ছিল, মাছ ধরতাম, বাজারে বিক্রি করতাম। এখন সব দখল হয়ে গেছে। আমাদের মাছ ধরতেও দেয় না।"* গোটা আন্দোলনের একটি বড় দিক ছিল কৃষকদের জমি হারানোর ফলে তাঁদের জীবিকায় টিঁকে থাকার লড়াই। জমি হারানোর ফলে তারা বাধ্য হয়ে দিনমজুর বা অন্যান্য খেটে-খাওয়া কাজের দিকে ধাবিত হন, যা তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও দুর্বল করে তোলে (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪*)। *"আগে নিজের জমিতে চাষ করতাম, এখন ভিন রাজ্যে গিয়ে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতে হচ্ছে। এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ?"* এমন প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক কৃষক। সন্দেশখালির আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সেখানকার জমিহারা কৃষকরা, যাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং ক্ষোভ এই গণপ্রতিরোধের মূল চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে। কৃষিজীবী মানুষদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং প্রশাসনিক মদতে তাদের জমি দখল করা হয়েছিল, যা তাদের জীবন-জীবিকার উপর সরাসরি আঘাত হানে (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ মার্চ ২০২৪*)। স্থানীয় এক কৃষক বলেন, *"আমাদের চোখের সামনে জমি দখল হয়ে গেল, কিছু বলতে পারলাম না। পুলিশকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখন আমরা কোথায় যাব?"* এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, শুধুমাত্র জমি হারানো নয়, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণেও তাদের অসহায়ত্ব চরমে পৌঁছায়। কৃষকদের ক্ষোভ জমি হারানোর পাশাপাশি তাদের জীবিকা হারানোর বিষয়টিকেও কেন্দ্র করে। দখল হওয়া জমির মালিকানা পরিবর্তনের ফলে তারা কৃষিকাজ থেকে বঞ্চিত হন এবং বাধ্য হয়ে অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ করতে থাকেন। অনেকেই শহরের দিকে পাড়ি জমাতে বাধ্য হন, যা তাদের ঐতিহ্যগত জীবনের[64] সাথে এক বিপরীত বাস্তবতা তৈরি করে। এই আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা ছিল দ্বিগুণ—একদিকে তাদের জমির পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সন্দেশখালির কৃষকরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনের মূল ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের সংগ্রামই এই প্রতিবাদকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে। অর্থাৎ, আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি

[64]ঐতিহ্যগত জীবন বলতে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সমাজ বা জনগোষ্ঠীর পুরনো জীবনধারা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান, এবং পেশা বা জীবিকা নির্বাহের প্রচলিত পদ্ধতি বোঝানো হয়, যা দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হচ্ছে। এটি আধুনিকতা বা পরিবর্তনের বিপরীতে স্থিতিশীল ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনপ্রণালীর দিকটি নির্দেশ করে।

ছিলেন জমিহারা কৃষকেরা, যাদের জমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের দখলে ছিল। কৃষিজমি কেবল তাদের জীবিকার উৎস নয়, এটি তাদের আত্মপরিচয়েরও প্রতীক। জমি হারানোর ফলে তারা চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন, যা তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ে চলা জমি দখলের বিরুদ্ধেই এই কৃষকেরা আন্দোলনে সামিল হন। আরও যে বিষয়টি উঠে আসে সেটা হল কৃষকদের আন্দোলন শুধুমাত্র জমির মালিকানা পুনরুদ্ধারের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানান। স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের অন্যায় দখলের বিরুদ্ধে তারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ করে এবং প্রশাসনিক কার্যালয় ঘেরাও করে তাদের দাবি জানায়। আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কৃষকদের সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলা। তারা প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ, মিছিল এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের দাবি জানিয়ে আসেন। শুধু জমি নয়, রেশন দুর্নীতি এবং নারী নির্যাতনের মতো বিষয়গুলোর বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হন। এভাবে আন্দোলন একটি সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিরোধের রূপ নেয়। এই আন্দোলনের ফলে সরকার জমি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবায়ন কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে নতুন সচেতনতা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতে অন্যায় ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আরও সংঘবদ্ধ হওয়ার পথ তৈরি করেছে। সন্দেশখালির কৃষকদের ভূমিকা শুধু জমির অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই নয়, এটি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামের প্রতিফলন।

আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা

সন্দেশখালির প্রতিবাদে নারীদের সক্রিয় উপস্থিতি এই আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জমি দখল, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যখন চরমে পৌঁছায়, তখন নারীরা নিজেরাই রাস্তায় নামতে বাধ্য হন। সন্দেশখালির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে নারীদের ভূমিকা নারীবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারীবাদী সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরেই নারীদের রাজনৈতিক ও

সামাজিক সংগ্রামের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছে, বিশেষ করে যখন নারীরা রাষ্ট্র ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। সন্দেশখালির প্রেক্ষাপটে, নারীদের প্রতিবাদকে শুধুমাত্র একটি স্থানীয় ঘটনা হিসেবে দেখলে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝা যাবে না; বরং এটি বৃহত্তর নারী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্যেই পড়বে, যেখানে নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারীরা সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। নারী আন্দোলনের গবেষণাগুলিতে দেখা যায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় নারীরা প্রাথমিকভাবে শিকার হলেও, তারা একসময় সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধের শক্তি হয়ে ওঠেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর *ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?* বইয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রান্তিক নারীদের কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে দমিয়ে রাখা হয় (স্পিভাক ১৯৮৮:২৯৯)। সন্দেশখালির নারীদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ করা যায়—তাদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, তা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। কিন্তু এর বিপরীতে তারা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা খুঁজে নিয়েছেন, যা তাঁদের সাবল্টার্ন পরিচয়কে চ্যালেঞ্জ করে। সীতা আগারওয়াল ও কমলা ভাসিনের মতো নারীবাদী তাত্ত্বিকরা গ্রামীণ নারীদের আন্দোলনের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, যখন নারীরা শুধুমাত্র নির্যাতনের শিকার হিসেবে চিহ্নিত হন, তখন তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয় (ভাসিন, ১৯৯৩:৬৫-৬৬)। সন্দেশখালির ঘটনাবলিতে নারীরা শুধুমাত্র নিপীড়িত নয়, বরং তাঁরা সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন, যা রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোর বিরুদ্ধে এক সরাসরি চ্যালেঞ্জ। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যেও দেখা যায়, কীভাবে প্রান্তিক নারীরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁর রচনা *হাজার চুরাশির মা* বা *দ্রৌপদী* গল্পে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে, যা সন্দেশখালির প্রেক্ষিতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে (মহাশ্বেতা দেবী, ১৯৯৭:১০৫-১১২)। সন্দেশখালির নারীরা যে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন, তা শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের দাবিতেও। সন্দেশখালির নারীদের আন্দোলনকে আমরা চঞ্চলা ভট্টাচার্যের *উইমেন অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স* বা মালাশ্রী লালের *দ্য ল'-অভ দ্য থ্রেশহোল্ড* রচনার আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এই গবেষণাগুলি দেখিয়েছে, কীভাবে নারীরা রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হন (লাল, ২০০৪:৮২)। সন্দেশখালির প্রেক্ষিতে, এই নারীদের লড়াই শুধুমাত্র স্থানীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি এক দীর্ঘকালীন পিতৃতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অংশ। এই ঘটনাগুলিকে নারীবাদী

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেখলে বোঝা যায়, সন্দেশখালির নারীরা শুধু ভুক্তভোগী নয়, বরং সক্রিয় প্রতিবাদী। তাদের ভূমিকা নারী আন্দোলনের বৃহত্তর কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে শোষণ ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, সন্দেশখালির নারীদের সংগ্রাম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় সাধারণত পুরুষদের নেতৃত্বেই অধিকাংশ আন্দোলন সংগঠিত হয়, কিন্তু এখানে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আন্দোলনের চরিত্রকে বদলে দেয়। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানো শুধু ব্যক্তি শেখ শাহজাহানের অপশাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং বৃহত্তর ক্ষমতার কাঠামোর প্রতিরোধ হিসেবে প্রতিভাত হয় (*দ্য টেলিগ্রাফ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। একজন প্রতিবাদী নারী বলেন, *"আমরা দিনের পর দিন চুপ করে সব সহ্য করেছি, কেউ আমাদের কথা শোনেনি। কিন্তু আর নয়, আমরা নিজেরাই রাস্তায় নেমেছি। আমাদের সম্মান আর জমি কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।"* এতদিন যেসব নারী নির্যাতনের শিকার হয়েও নীরব ছিলেন, তারা এই আন্দোলনের সুযোগে নিজেদের দুর্ভোগ প্রকাশ করার মঞ্চ পান। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় চলা অন্যায় নয়, বরং প্রশাসনের নিরবতা এবং শাসকদের উদাসীনতার বিরুদ্ধেও এই প্রতিরোধ ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। নারীদের সরব উপস্থিতি আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা এবং নৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে তোলে (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। স্থানীয় এক আন্দোলনকারী মন্তব্য করেন, *"আমাদের পরিবারের পুরুষরা কাজের সন্ধানে বাইরে থাকেন, আমরা এখানে দিনের পর দিন অন্যায়ের শিকার হয়েছি। কেউ আমাদের কথা শোনেনি, তাই নিজেরাই ন্যায়বিচারের জন্য রাস্তায় নেমেছি।"* সন্দেশখালির আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধুমাত্র প্রতিবাদের মাত্রা বৃদ্ধি করেনি, এটি আন্দোলনের প্রকৃতিকে আরও ব্যাপক ও গভীর করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গণআন্দোলনে মহিলাদের দৃশ্যমান ভূমিকা লক্ষ্য করা গেলেও সন্দেশখালির ঘটনা একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যেখানে সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পুরুষদের আধিপত্য দেখা যায়, সেখানে এই আন্দোলনে মহিলারা সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, যা এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একাধিক গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে আসছিল, কিন্তু রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় অনেকেই মুখ খুলতে পারেননি। শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে নির্যাতনের

অভিযোগ সামনে আসার পর নারীদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় এবং তারা আর নীরব থাকতে রাজি হননি (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। এক আন্দোলনকারী বলেন, *"আমাদের কণ্ঠ কেউ শোনেনি, কিন্তু যখন আমরা একসাথে রাস্তায় নেমেছি, তখন সবাই বাধ্য হয়েছে আমাদের কথা শুনতে। আমরা ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত থামব না।"* এই আন্দোলনের মাধ্যমে নারীরা শুধুমাত্র নিজেদের উপর হওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি, বরং তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন প্রশাসনের নিরব ভূমিকা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়েও প্রশ্ন তোলে। মহিলাদের নেতৃত্বে মিছিল, পথ অবরোধ এবং প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার মতো ঘটনাগুলো সামাজিক প্রতিরোধের নতুন রূপকে চিহ্নিত করে। বিশেষত, জমি দখল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমজীবী পরিবারগুলোর ক্ষোভের প্রতিফলনও এখানে লক্ষ করা যায় (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। *একজন ভূমিহীন কৃষক বলেন, "আমাদের জমি যারা কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস অনেকেই পায়নি। কিন্তু যখন আমাদের ঘরের মেয়েরা প্রতিবাদে নেমেছে, তখন বুঝেছি এবার আর পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই।"*

আন্দোলনের শক্তিশালী দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নারীদের একত্রিত হয়ে সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতা। আগে যেসব নারী নির্যাতনের ভয়ে বাড়ির বাইরে বের হতেন না, তারাই যখন দলে দলে পথে নামলেন, তখন প্রশাসনও চাপে পরে যায়। সন্দেশখালির নারীদের এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামার বিষয়টি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা নির্দেশ করে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নারীরা শুধুমাত্র অত্যাচারের শিকারই নন, বরং তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সক্ষমতাও রাখেন। সাধারণত গ্রামীণ সমাজে নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ সীমিত থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তারা নিজেদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত করেছেন এবং আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছেন (*দ্য টেলিগ্রাফ*, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। প্রতিবাদী নারীরা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে অন্য নারীদের একত্রিত করেন, আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করেন এবং মিছিল ও সভার মাধ্যমে নিজেদের দাবি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেন। এক আন্দোলনকারী বলেন, *"আমরা বুঝেছি, একা লড়লে কেউ আমাদের কথা শুনবে না। তাই আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করেছি, যাতে আমাদের দাবি উপেক্ষা করা না হয়।"* তবে আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ সহজ ছিল না। প্রথমদিকে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা তাদের প্রতিরোধের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সন্দেশখালির অনেক পরিবার নারীদের আন্দোলনে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত

করেছিল, কিন্তু আন্দোলনের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাও মহিলাদের সমর্থন করতে শুরু করেন (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১ মার্চ ২০২৪)। এক জমিহারা কৃষকের ভাষায়, *"প্রথমে আমি ভাবছিলাম, মহিলারা আন্দোলনে গেলে বিপদ হতে পারে। কিন্তু পরে যখন দেখলাম আমাদের মা-বোনেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তখন আমরাও তাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই।"* এই আন্দোলনের ফলে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসার চেষ্টা করেছেন। অতীতে প্রশাসনের কাছে গেলে অভিযোগ গ্রহণ করা হতো না, কিন্তু নারীদের সম্মিলিত আন্দোলনের চাপে প্রশাসনকে বাধ্য হয়ে পদক্ষেপ নিতে হয় (*দ্য হিন্দু,* ৬ মার্চ ২০২৪)। এক নারী আন্দোলনকারী বলেন, *"আমরা থানায় গেলে আগে কেউ গুরুত্ব দিত না, কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।"* নারীদের প্রতিরোধের ফলে সন্দেশখালির আন্দোলন শুধুমাত্র স্থানীয় প্রতিবাদ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং রাজ্য রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন নারী অধিকার সংগঠন এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোও নারীদের নেতৃত্বে সংগঠিত এই আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে (*দ্য টেলিগ্রাফ,* ৮ মার্চ ২০২৪)। এক আন্দোলনকারী স্পষ্টভাবেই বলেন, *"আমরা কারও রাজনীতি বুঝি না, আমাদের যা হারিয়েছে তা ফেরত চাই। আমাদের মেয়েদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, তার বিচার চাই।"*

সুতরাং, সন্দেশখালি আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা শুধু প্রথাগত প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি ছিল একটি সুসংগঠিত সামাজিক প্রতিরোধের রূপ, যা স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছে। সাধারণত গ্রামীণ সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে সীমিত থাকে। কিন্তু সন্দেশখালির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নারীরা শুধুমাত্র আন্দোলনের অংশীদারই হননি, বরং নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাদের সক্রিয়তা আন্দোলনটিকে আরও গণমুখী এবং সংগঠিত করেছে। এই আন্দোলন নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেওয়া এবং দফায় দফায় বিক্ষোভ-সমাবেশে অংশগ্রহণ তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে। অতীতে নারী নির্যাতন ও জমি দখলের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলতে স্থানীয় নারীরা দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও, এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা বুঝতে পেরেছেন যে, সম্মিলিত প্রতিবাদ কতটা কার্যকর হতে পারে। এছাড়া, এই আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে, নারীদের নেতৃত্ব শুধু আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নয়, বরং তা বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের

ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের অংশগ্রহণ সন্দেশখালির ঘটনাকে একটি স্থানীয় প্রতিবাদ থেকে রাজ্যব্যাপী আলোচিত ইস্যুতে পরিণত করেছে। নারী অধিকার সংগঠনগুলোও এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে এবং এটিকে নারীদের প্রতি দীর্ঘদিনের সামাজিক ও প্রশাসনিক অবহেলার বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ প্রতিবাদ হিসেবে দেখেছে। তবে আন্দোলনের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা, তা ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করছে। যদি প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলো এই নারীদের কণ্ঠস্বরকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়, তাহলে তাদের আন্দোলন প্রাথমিক সফলতা অর্জন করলেও দীর্ঘমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, সন্দেশখালির এই অভিজ্ঞতা নারীদের আত্মবিশ্বাসী করেছে, তাদের প্রতিবাদী চেতনাকে সুদৃঢ় করেছে এবং ভবিষ্যতের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

স্থানীয় অন্যান্য পেশার মানুষের ভূমিকা

সন্দেশখালির প্রতিবাদ শুধু নির্দিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ধীরে ধীরে এক বৃহত্তর গণপ্রতিরোধের রূপ নেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রশাসনিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, নারী নির্যাতন এবং রেশন কেলেঙ্কারির মতো ইস্যু সরাসরি তাদের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। এই কারণেই আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ জানুয়ারি ২০২৪)। একজন গৃহবধূ, যিনি আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন, তিনি বলেছেন, *"প্রতিদিন আমাদের বোনেরা অন্যায়ের শিকার হচ্ছিল, কিন্তু কেউ কিছু বলত না। এবার আমরা নিজেরাই রুখে দাঁড়িয়েছি। আমাদের লড়াই শুধু জমির জন্য নয়, এটা আমাদের সম্মানের জন্যও।"* একজন দিনমজুরের ভাষ্য, *"রেশনের চাল চুরি, কাজ নেই, পুলিশও ক্ষমতাবানদের দিকেই থাকে। আমরা কোথায় যাব? তাই বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনে এসেছি, কারণ এটা শুধু একদিনের ক্ষোভ নয়, বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানো।"* প্রতিবাদের প্রথম পর্যায়ে কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষ সরব হলেও দ্রুতই সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশ এতে যুক্ত হয়। বাজারের ব্যবসায়ী, স্থানীয় শিক্ষক, যুব সম্প্রদায় এবং সাধারণ পরিবারের সদস্যরাও আন্দোলনের স্বপক্ষে রাস্তায় নামেন। সাধারণ মানুষের সরব উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনকে শুধু প্রতিক্রিয়ার পর্যায়ে আটকে রাখেনি,

বরং এটি একটি সংগঠিত প্রতিরোধের চেহারা নেয় (দ্য টেলিগ্রাফ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। একজন স্থানীয় মুদি দোকানি বলেন, *"প্রথমে ভেবেছিলাম এটা শুধু কৃষকদের লড়াই, কিন্তু পরে বুঝলাম, এই অন্যায় আমাদের সবার জীবনে প্রভাব ফেলেছে। প্রশাসনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করলে আমাদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই দোকান বন্ধ রেখে আমরা রাস্তায় নেমেছি।"* একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, *"এই আন্দোলন শুধুমাত্র জমি বা রেশনের সমস্যা নয়, এটি ন্যায়বিচারের দাবিতে লড়াই। শিক্ষিত সমাজ যদি চুপ করে থাকে, তাহলে অন্যায় আরও বাড়বে। তাই ছাত্রদের সঙ্গেই আমরাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছি।"* একজন তরুণ আন্দোলনকারী জানান, *"আমাদের অভিভাবকেরা এতদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পেতেন, কিন্তু আমরা ভয়ের রাজনীতি আর মেনে নেব না। আমরা চাই, প্রশাসন জবাব দিক, দুর্নীতির শাস্তি হোক।"*

নানা বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ সাধারণ মানুষের জন্য বরাবরই কঠিন হয়ে উঠেছে, বিশেষত যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য একপাক্ষিক থাকে। সন্দেশখালির আন্দোলন সেই বাধাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ থেকে শুরু করে জমি দখলের শিকার ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতা—সব মিলিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের দাবির স্বপক্ষে একত্রিত হয় (দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২২ জানুয়ারি ২০২৪)। একজন স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, *"এতদিন অন্যায় সহ্য করেছি, ভেবেছিলাম আমাদের কথা কেউ শুনবে না। কিন্তু যখন দেখলাম সবাই একসঙ্গে রাস্তায় নেমেছে, তখন আমরাও সাহস পেলাম। এখন আমরা জানি, এক হয়ে দাঁড়ালে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব।"* একজন বাম যুব নেতা বলেন, *"এটি শুধু ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যতের লড়াই। ক্ষমতাবানরা যদি মনে করেন সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যাবে, তাহলে তারা ভুল। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আর গণতন্ত্র মানে জনগণের আওয়াজকে শোনা।"* স্থানীয় জনগণের সক্রিয় উপস্থিতি আন্দোলনকে টিঁকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সময়ে পুলিশের ধরপাকড় ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। আন্দোলন দমনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে তারা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০২৪)। একজন দোকানদার যিনি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন, *"শুধু কৃষক বা শ্রমিকরা নয়, আমরা ছোট ব্যবসায়ীরাও এই আন্দোলনের অংশ। কারণ দুর্নীতি আর অন্যায় কেবল একজনকে নয়, আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করে।"* একজন শিক্ষার্থী জানান, *"এই লড়াই শুধু বর্তমানের জন্য নয়, আমাদের ভবিষ্যতের জন্যও। তাই আমরা আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছি, যাতে সত্যের*

পক্ষে আওয়াজ তোলা যায়।" সন্দেশখালির আন্দোলন মূলত নির্দিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুরু হলেও তা দ্রুত বৃহত্তর গণপ্রতিরোধের রূপ নেয়। স্থানীয় সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য যেখানে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করে, সেখানে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই আন্দোলন দেখিয়েছে যে, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং জমি দখলের মতো বিষয় শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্তদের নয়, গোটা সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ একসঙ্গে এসে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

এক্ষেত্রে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আন্দোলনের বৈধতা ও নৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করে। আন্দোলন যদি শুধু নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে তা সহজেই দমন করা সম্ভব হতো। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের একত্রিত হওয়ার ফলে এটি শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রতিবাদ হিসেবে নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠে। এই প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা শুধুমাত্র রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তারা আন্দোলনকারীদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন—খাবার সরবরাহ, আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ প্রশাসনের ওপরও চাপ তৈরি করে। আন্দোলনের প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন থাকলে প্রশাসনের পক্ষে সহজেই এটিকে দমন করা সম্ভব হয় না। সন্দেশখালির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে সরকারকে জমি ফেরত দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে হয়। অতএব, সন্দেশখালির আন্দোলনে স্থানীয় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ কেবল প্রতিক্রিয়ামূলক ছিল না, এটি একটি সুসংগঠিত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধের ভিত্তি গড়ে তোলে। প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ কীভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করতে পারে, এই আন্দোলন তার এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে শাসক ও বিরোধী দলগুলির ভূমিকা

সন্দেশখালি আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উঠে এসেছে। এই আন্দোলন মূলত স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি বহিঃপ্রকাশ, যেখানে শাসক দল ও বিরোধী দল উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনের শুরু থেকেই এটিকে বিরোধীদের ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পরেও সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং আন্দোলনকারীদের শান্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলি—বিশেষ করে বিজেপি—এই আন্দোলনকে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের একটি সুযোগ হিসেবে দেখে এবং আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিক্রিয়া, কৌশল এবং সাধারণ মানুষের ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা জরুরি। সন্দেশখালির ঘটনা কেবলমাত্র স্থানীয় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র ও যুব আন্দোলনের গতিপথকেও প্রভাবিত করতে পারে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা

সন্দেশখালির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে শেখ সাহজাহানের নাম এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁকে ঘিরে যে দুর্নীতি, অপরাধ ও নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে, তা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির অপরাধমূলক কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের একটি বহুল পরিচিত চিত্র তুলে ধরে। দীর্ঘদিন ধরে সন্দেশখালির স্থানীয় রাজনীতিতে সাহজাহানের আধিপত্য গড়ে উঠেছিল, যা মূলত রাজনৈতিক আশ্রয় ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার ফসল। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ক্ষমতাসীন দলের হয়ে একপ্রকার ছায়া প্রশাসনের ভূমিকায় ছিলেন, যেখানে জমি দখল, অর্থ আদায়, নারী নির্যাতন এবং সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার ছিল তার ক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার। সাহজাহানের উত্থান এবং তার অপরাধমূলক কার্যকলাপ বুঝতে হলে রাজনীতির সঙ্গে অপরাধের যোগসাজশের ধারাটি বুঝতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই দেখা গেছে, স্থানীয় নেতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রশাসন এই প্রক্রিয়ায় একধরনের মৌন সম্মতি দেয়। সাহজাহান শেখও এই ব্যবস্থার একটি অংশ হয়ে উঠেছিলেন। স্থানীয়

সূত্রগুলির অভিযোগ অনুযায়ী, প্রশাসন ও পুলিশের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর কারণ স্পষ্ট—একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক ছত্রছায়া তাকে সুরক্ষা দিয়ে রেখেছিল, যেখানে আইনের প্রয়োগ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমীকরণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরেছিল। সন্দেশখালির ঘটনায় সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হলো নারীদের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ। যেকোনো দুর্বৃত্তায়িত ক্ষমতা কায়েম রাখার ক্ষেত্রে নারীদের শোষণ একটি বহুল প্রচলিত কৌশল। ক্ষমতার দাপট কায়েম রাখতে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রয়োগ করে ভয় ও শাসনের পরিবেশ তৈরি করা হয়, যাতে প্রতিরোধের সম্ভাবনা নস্যাৎ করা যায়। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সন্দেশখালির ঘটনাগুলি দেখায় কীভাবে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ণ এবং পিতৃতান্ত্রিক সহিংসতা মিলিত হয়ে এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত শাসন কাঠামো তৈরি করে। এখানে নারীরা কেবল নির্যাতনের শিকার নন; বরং তাদের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ রাখার জন্য জবরদস্তির মাধ্যমে ভীতি ছড়ানো হয়েছে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল প্রতিরক্ষামূলক ও রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল। তৃণমূল সরকার প্রথমদিকে ঘটনাটির গুরুত্ব অস্বীকার করলেও পরে পরিস্থিতি সামলাতে সক্রিয় হয় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলিকে জোরদার করার উদ্যোগ নেয়। তবে বিরোধীরা এই ঘটনাকে তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরতে থাকলে, সরকারপক্ষ পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানায় এবং আন্দোলনকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করে। প্রাথমিক পর্যায়ে তৃণমূল কংগ্রেস সন্দেশখালির ঘটনাকে বিরোধীদের 'অপপ্রচার' বলে চিহ্নিত করে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপি এবং অন্যান্য বিরোধী দল পরিকল্পিতভাবে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সরকার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে" (আনন্দবাজার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, স্থানীয় প্রশাসন যথাযথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। তবে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে এবং মিডিয়া ও বিরোধীদের চাপ বাড়তে থাকলে তৃণমূল সরকার পরিস্থিতি সামলাতে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যে, সন্দেশখালির ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, "আমরা কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করছি না, দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে" (এইসময়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলনের জন্য মূলত বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধী দলকে দায়ী করে এবং দাবি করে যে, এটি রাজ্যের শান্তি নষ্ট করার একটি চক্রান্ত। দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি মিথ্যা প্রচার চালিয়ে বাংলার পরিস্থিতিকে অশান্ত করতে চাইছে। সন্দেশখালির ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু এটিকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হচ্ছে" (সংবাদ প্রতিদিন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। তৃণমূল সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে, যেমন— প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি গঠন, ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা। একইসঙ্গে, দলীয় কর্মীরা এলাকায় গিয়ে জনসংযোগ চালিয়ে মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। তবে বিরোধীরা এই পদক্ষেপকে 'প্রশাসনিক নাটক' হিসেবে ব্যাখ্যা করে এবং দাবি তোলে যে, তৃণমূল সরকারের ভেতরের অংশ থেকেই এই ধরনের অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। সরকারপক্ষ যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে বিরোধীদের লাগাতার প্রচারের ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি, তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল একদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যদিকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শানিয়ে আন্দোলনকে রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসেবে তুলে ধরা। যদিও সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা পদক্ষেপ নেয়, কিন্তু বিরোধীরা একে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা রাজ্যের রাজনৈতিক মেরুকরণকে আরও তীব্র করে তোলে।

সুতরাং, সন্দেশখালি আন্দোলনে রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলি ও শাসক দলের অবস্থান ও প্রভাবকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে এটি এক ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শ্রেণিগত প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক গতিশীলতার প্রতিফলন হিসেবে প্রতীয়মান হয়। আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণের বিষয় নয়; বরং এটি বৃহত্তর সমাজের ভেতরকার বিভাজন, ক্ষমতার কাঠামো, এবং রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতিফলন ঘটায়। একদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া রাজ্যস্তরে ক্ষমতার ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে ধরা যায়। রাষ্ট্রতাত্ত্বিক মিশেল ফুকোর ক্ষমতার বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় যে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসনিক শক্তির মাধ্যমে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে, যা আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহার (যেমন- পুলিশ, প্রশাসন) এবং জনমতের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার মাধ্যমে সরকার তার আধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই আধিপত্য তখনই চ্যালেঞ্জের মুখে পরে, যখন প্রতিপক্ষ শক্তিশালী আন্দোলন বা রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলির ভূমিকা সামাজিক প্রতিরোধের একটি রূপ হিসেবে কাজ করে। পিয়েরে বুর্দিয়োর 'রাজনৈতিক পুঁজি' (পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল) ধারণা অনুসারে, বিজেপি, বামফ্রন্ট ও

ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট এই আন্দোলনকে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক পুঁজি বৃদ্ধি করতে চেয়েছে।[65] বিজেপি একদিকে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছে, যেখানে তারা নিজেকে 'বঞ্চিতদের রক্ষক' হিসেবে উপস্থাপন করে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট শ্রেণিগত নিপীড়নের ভাষ্য ব্যবহার করে এই আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের অধিকারের লড়াই হিসেবে দেখাতে চেয়েছে। আইএসএফ তাদের সংখ্যালঘু রাজনীতির অবস্থান থেকে এর মধ্যে নিজেদের ভূমিকা খুঁজেছে, যা মূলত রাজনৈতিক মেরুকরণের মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করে।

আন্দোলনের সামাজিক প্রভাবকে 'সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব' দিয়ে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, এটি 'রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামো' সৃষ্টি করেছে, যার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের আদর্শিক অবস্থান শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই আন্দোলনকে 'ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিরোধী দলগুলি এটিকে ব্যবহার করে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এন্টোনিও গ্রামশির 'হেজেমনি' তত্ত্ব অনুসারে, তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি 'সম্মতি-ভিত্তিক' আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু সন্দেশখালির মতো ঘটনা সেই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয় এবং বিরোধী দলগুলির জন্য নতুন রাজনৈতিক সুযোগ তৈরি করে। এক্ষেত্রে, আন্দোলন কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ক্ষোভই প্রকাশ করে না, বরং এটি বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থার সংকটকেও তুলে ধরে। পরিশেষে, সন্দেশখালি আন্দোলন শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং কীভাবে রাজনৈতিক দলগুলি সেই লড়াইকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। এটি শুধু নির্বাচনী সমীকরণের বিষয় নয় বরং এটি সমাজের কাঠামোগত বিভাজন, রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

[65]রাজনৈতিক পুঁজি (Political Capital) বলতে বোঝায় একজন রাজনৈতিক নেতা, দল বা গোষ্ঠীর অর্জিত জনপ্রিয়তা, প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা, যা তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি বাস্তবায়ন বা ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। এটি অর্থনৈতিক পুঁজির মতোই এক ধরনের সম্পদ, তবে এটি নির্ভর করে জনসমর্থন, নৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক সাফল্য ও ক্ষমতার ওপর।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র ভূমিকা

সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপি দলের ভূমিকা শুরু থেকেই কৌশলগত ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দলটি এই আন্দোলনকে শাসক দলের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখেছে এবং আন্দোলনকারীদের প্রতি সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে। সন্দেশখালির নারীদের উপর হওয়া নির্যাতন ও জমি দখলের অভিযোগকে সামনে রেখে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয় এবং রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করে। বিজেপি নেতারা সন্দেশখালির ঘটনাকে "নারী নির্যাতনের জঘন্য উদাহরণ" বলে অভিহিত করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন (আনন্দবাজার, ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "সন্দেশখালির নারীরা ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, আর প্রশাসন নীরব দর্শক। আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি" (আনন্দবাজার, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও ঘটনাস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু পুলিশ বাধা দেয়। তখন তিনি অভিযোগ করেন, "তৃণমূলের নেতাদের আড়াল করতে প্রশাসন আমাদের আন্দোলন দমন করতে চাইছে" (আনন্দবাজার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৪)। এর পাশাপাশি বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, "তৃণমূলের নেতাদের হাতে সন্দেশখালির মহিলারা বছরের পর বছর ধরে নিপীড়িত। আমরা তাদের সুবিচারের জন্য লড়াই করছি" (এইসময়, ৩ মার্চ ২০২৪)। বিজেপি দলীয়ভাবে সন্দেশখালির নির্যাতিতদের পাশে থাকার বার্তা দেয় এবং আইনি সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা এই ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়ে এনআইএ বা সিবিআই তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানায়। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্দেশখালির আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্রের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং তার সংগ্রামকে সমর্থন করেন। বিজেপি সন্দেশখালির ঘটনাকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরে এবং সংসদে এই প্রসঙ্গে সরব হয়। বিজেপি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের কৌশল নেয়। সন্দেশখালির আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব রাখা পাত্রকে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করে দলটি স্পষ্টভাবে বোঝাতে চায় যে তারা এই আন্দোলনকে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে চায়। সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি নারী সুরক্ষার প্রশ্নকে সামনে এনে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালায় এবং রাজ্যজুড়ে একাধিক বিক্ষোভ ও সভার আয়োজন করে। এই আন্দোলনে বিজেপির ভূমিকা শুধু প্রতিবাদ সংগঠিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল

না, বরং এটি তাদের রাজনৈতিক কৌশলেরও অংশ হয়ে ওঠে। সন্দেশখালির ঘটনাকে ব্যবহার করে দলটি রাজ্যের নারী নিরাপত্তার ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানায় এবং জনমত তৈরি করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তন আনার চেষ্টাও বিজেপি করেছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক লক্ষ্যকে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপি দলের দাবিগুলো মূলত নারী নির্যাতন, জমি দখল, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিষয়কে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল। দলটি এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছে এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছে। বিজেপি সন্দেশখালির ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানায়। তাদের মতে, সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর শাসক দলের স্থানীয় নেতারা দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন, কিন্তু পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। বিজেপি এই ঘটনার সিবিআই বা এনআইএ-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের দাবি তোলে। বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না, তাই আমরা সিবিআই তদন্ত চাই" (আনন্দবাজার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে বিজেপি সরব হয়। দলটি অভিযোগ করে যে, সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে নারী নির্যাতন, জমি দখল ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয়েছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "যারা এই নারকীয় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে" (এইসময়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। বিজেপি প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলে। দলটির মতে, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন তৃণমূলের প্রভাবাধীন, এবং তারা নির্যাতিতদের পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টো অভিযোগ দায়েরকারীদের হুমকি দিচ্ছে। বিজেপি প্রশাসনের ভূমিকা খতিয়ে দেখে দোষীদের শাস্তির দাবি জানায় (এইসময়, ১ মার্চ ২০২৪)। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিজেপি দাবি তোলে। দলটি অভিযোগ করে যে, নির্যাতিত পরিবারগুলো ভয় ও আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবি জানায় (এবিপি আনন্দ, ৩ মার্চ ২০২৪)। নারী সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও বিজেপির অন্যতম প্রধান দাবি ছিল। দলটির মতে, রাজ্য পুলিশ যেহেতু নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে, যাতে নারীরা নিজেদের সুরক্ষিত মনে করেন (দৈনিক স্টেটসম্যান, ৪ মার্চ ২০২৪)। বিজেপি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতির জন্য মমতা সরকারের জবাবদিহিতা

চায়। তারা তৃণমূল সরকারকে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী করে। বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, *"এই ঘটনা রাজ্যের লজ্জা, আর এর সম্পূর্ণ দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের"* (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৫ মার্চ ২০২৪)। সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি একাধিক দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা চালায়। যদিও বিজেপির দাবিগুলি প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা এবং নারী সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে নির্বাচনী কৌশলগত দিকও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপি দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনের গতিপথ এবং এর রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এই প্রভাবকে কয়েকটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। সন্দেশখালির ঘটনা মূলত স্থানীয় স্তরের একটি সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে শুরু হলেও, বিজেপির হস্তক্ষেপ একে রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে। বিজেপি নেতৃত্ব, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল, সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ নেতারা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হন এবং বারবার দাবি তোলেন যে এই ঘটনা "নারী নির্যাতনের চূড়ান্ত নিদর্শন" এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এর জন্য দায়ী। ফলে, এই আন্দোলন শুধুমাত্র স্থানীয় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি বিজেপির রাজ্য সরকারবিরোধী প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে (আনন্দবাজার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। বিজেপি এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বারবার কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা যেমন সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের দাবি তোলে। এর ফলে, রাজ্য প্রশাসনের ওপর কেন্দ্রীয় পর্যায়ের চাপ তৈরি হয়। বিজেপি নেতারা দাবি করেন যে রাজ্য পুলিশ নিরপেক্ষ নয় এবং তৃণমূলের প্রভাবাধীন, তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন (এই সময়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। এই দাবির ফলে শাসক দলের ওপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সরকারকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপির ভূমিকা তাদের দীর্ঘমেয়াদী রাজনীতি, বিশেষ করে বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রসার ঘটানোর চেষ্টার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সন্দেশখালির ঘটনা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ঘটেছিল এবং বিজেপি এটিকে "সংখ্যালঘু তোষণের" ফলাফল বলে প্রচার করতে শুরু করে। তারা দাবি করে যে তৃণমূল সরকার মুসলিম নেতাদের রক্ষা করছে এবং হিন্দু নারীরা ন্যায়বিচার পাচ্ছে না (এবিপি আনন্দ, ৩ মার্চ ২০২৪)। এই ধরনের প্রচারের মাধ্যমে বিজেপি বাংলার হিন্দু ভোট ব্যাংককে সংহত করার চেষ্টা করে। বিজেপির সরাসরি

সম্পৃক্ততা আন্দোলনের গতি বাড়িয়ে দেয় এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশেও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সন্দেশখালির মতো অঞ্চলে রাজনৈতিক সন্ত্রাস নতুন নয়, তবে বিজেপি এটিকে আরও বড় আকারে প্রচার করায় অন্যান্য রাজনৈতিক ও নাগরিক সংগঠনগুলিও এতে সংহতি প্রকাশ করে। ফলে, স্থানীয় পর্যায়ে আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলনকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে (প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০২৪)। সন্দেশখালি আন্দোলনের পর বিজেপি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্রকে প্রার্থী করে। এটি স্পষ্ট করে যে বিজেপি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনী ফায়দা তুলতে চেয়েছিল (ইটিভি ভারত, ২৪ মার্চ ২০২৪)। এই কৌশলের ফলে সন্দেশখালির রাজনৈতিক সমীকরণ পরিবর্তিত হতে পারে এবং বিজেপির সংগঠনের বিস্তার ঘটতে পারে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপির সক্রিয় ভূমিকা আন্দোলনটিকে শুধু সামাজিক প্রতিবাদ থেকে রাজনৈতিক প্রতিরোধে রূপান্তরিত করেছে। তাদের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি, শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান এবং হিন্দুত্ববাদী প্রচারের মাধ্যমে আন্দোলনটি বৃহত্তর রাজনৈতিক চেহারা নেয়।[66] তবে, এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আন্দোলনের মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা, যেমন জমি দখল বা স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা, কতটা সমাধান করতে পেরেছে তা নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়। সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির ভূমিকা যে রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও তীব্র করেছে, তা নিশ্চিত। সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপির সক্রিয় ভূমিকা ও তাদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকারপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস একাধিক প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা বিজেপির অবস্থানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করে এবং অভিযোগ তোলে যে বিজেপি এই ঘটনাকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি এবং রাজ্যে অস্থিরতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে যে সন্দেশখালির ঘটনাকে বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এই আন্দোলন আসলে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ নয়, বরং বিজেপির পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "বিজেপি এই ঘটনার রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চায়। ওরা সত্যিকারের সুবিচার চায় না, ওদের লক্ষ্য বাংলাকে অশান্ত করা" (আনন্দবাজার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। বিজেপির দাবি ছিল যে, রাজ্য পুলিশের ভূমিকা পক্ষপাতদুষ্ট, তাই সন্দেশখালির ঘটনার তদন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হোক। এর জবাবে তৃণমূল কংগ্রেস এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে

[66] হিন্দুত্ববাদী বলতে সেই ব্যক্তি, সংগঠন বা মতবাদকে বোঝানো হয়, যারা হিন্দুত্ব (Hindutva) ধারণাকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

এবং জানায় যে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন যথাযথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “এটি রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়, বিজেপি অযথা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোকে দুর্বল করতে চাইছে” (এইসময়, ১ মার্চ ২০২৪)। বিজেপির দাবির বিপরীতে তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, “কোনো অন্যায় হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু বিজেপি এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়িয়ে দেখাচ্ছে” (প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২৪)। তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে তারা সন্দেশখালির ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং হিন্দু-মুসলিম বিভাজন উসকে দিচ্ছে। পার্থ চ্যাটার্জি বলেন, “বিজেপি বাংলায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাধানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা তা সফল হতে দেব না” (এবিপি আনন্দ, ৫ মার্চ ২০২৪)। বিজেপির আন্দোলনের জবাবে তৃণমূলও পাল্টা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা একাধিক এলাকায় মিছিল ও জনসভা করে বিজেপির ‘মিথ্যা প্রচারের’ বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, *“বিজেপির কাজই হলো বিভ্রান্তি ছড়ানো, বাংলার মানুষ ওদের এই চক্রান্ত বুঝে গেছে”* (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৬ মার্চ ২০২৪)। সন্দেশখালি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিজেপির দাবিগুলোর জবাবে তৃণমূল কংগ্রেস একাধিক পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানায় এবং আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তারা বিজেপির অবস্থানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিকারী এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা অবনতি ঘটানোর প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। সরকারের অবস্থান ছিল, রাজ্য প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং বাইরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। ফলস্বরূপ, সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় এবং রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হয়।

সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের ভূমিকা

সন্দেশখালি আন্দোলনে সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্টের ভূমিকা অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর তুলনায় কিছুটা আলাদা ছিল। তারা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেও বিজেপির মতো চরম অবস্থান নেয়নি। বরং তারা

তৃণমূল ও বিজেপি—উভয় দলকেই আক্রমণ করেছে এবং এই ঘটনাকে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছে।

সিপিআই(এম) সন্দেশখালির ঘটনাকে তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুলে ধরে। তারা দাবি করে, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে রাজ্যে আইনের শাসন নেই এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক নেতা মহম্মদ সেলিম বলেন, "তৃণমূলের নেতারাই এখানে লুটপাট চালাচ্ছে, আর প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে" (গণশক্তি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। যদিও বামফ্রন্ট তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব ছিল, তারা বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। সিপিআই(এম) অভিযোগ করে যে বিজেপি এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জন্য ব্যবহার করছে এবং আদতে ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচারের চেয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই বেশি আগ্রহী। সিপিআই(এম) নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "বিজেপি-তৃণমূলের রাজনৈতিক লড়াই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলছে। আমরা চাই নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি" (এইসময়, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। সিপিআই(এম) সন্দেশখালির ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং তাদের বক্তব্য শোনে। তারা দাবি তোলে যে, এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং নির্যাতিতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাম মহিলা সংগঠনের জনৈক নেত্রী বলেন, "নারীদের নিরাপত্তা এখন তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক খেলায় উপেক্ষিত হচ্ছে, আমরা চাই প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি" (আনন্দবাজার, ১ মার্চ ২০২৪)। বিজেপি যেখানে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত দাবি করেছিল, সেখানে সিপিআই(এম) চেয়েছিল রাজ্যের বিচারব্যবস্থার অধীনে নিরপেক্ষ তদন্ত। তারা আদালতের তত্ত্বাবধানে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি তোলে, যাতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে সত্য উদঘাটিত হয়। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "আমরা চাই সত্য সামনে আসুক, কিন্তু বিজেপির মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে নই" (গণশক্তি, ৩ মার্চ ২০২৪)। সিপিআই(এম) দাবি করে যে তৃণমূল ও বিজেপি পরস্পর বিরোধী দেখালেও আসলে তাদের মধ্যে গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। তারা অভিযোগ তোলে যে, সন্দেশখালির মতো ঘটনা ব্যবহার করে বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে, অথচ মূল সমস্যাগুলো নিয়ে তাদের প্রকৃত আগ্রহ নেই। মহম্মদ সেলিম বলেন, "বিজেপি-তৃণমূল নাটক করছে, আর আসল সমস্যাগুলো আড়ালেই থেকে যাচ্ছে" (এবিপি আনন্দ, ৫ মার্চ ২০২৪)। সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্ট সন্দেশখালির ঘটনায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক

অবস্থান গ্রহণ করে। তারা তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা ও বিজেপির রাজনৈতিক সুবিধাভোগী কৌশল—উভয়কেই সমালোচনা করেছে। দলটি আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্যে নিজেদের হারানো রাজনৈতিক জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিরপেক্ষ তদন্ত ও শাস্তির দাবি তুলেছে। তবে, বিজেপি ও তৃণমূলের তুলনায় তাদের আন্দোলন তুলনামূলকভাবে কম প্রভাবশালী ছিল এবং মূলধারার রাজনীতিতে সেই অর্থে বড় প্রভাব ফেলতে পারেনি। সন্দেশখালি আন্দোলনে সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্টের অংশগ্রহণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। যদিও বিজেপি ও তৃণমূলের তুলনায় তাদের আন্দোলনে ভূমিকা তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল, তবুও এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম) রাজ্যের রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেদের অবস্থান পুনর্গঠনের চেষ্টা চালায়। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে দুর্বল হয়ে পরা বামফ্রন্ট এই আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা ফেরানোর চেষ্টা করে। তারা দাবি করে, বিজেপি ও তৃণমূল—উভয় দলই মানুষের প্রকৃত সমস্যা উপেক্ষা করছে এবং কেবল রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। বামফ্রন্টের এই অংশগ্রহণ তাদের পুরোনো সমর্থকদের কিছুটা উজ্জীবিত করলেও রাজ্যের সামগ্রিক রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি। তবে গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় তাদের উপস্থিতি কিছুটা দৃশ্যমান হয়েছে। বিজেপি যেখানে সন্দেশখালির ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের একটি ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, সেখানে সিপিআই(এম) এটিকে শাসক দলের দমননীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করে।[67] তারা মূলত তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও বিজেপির রাজনৈতিক কৌশলের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়। এই অবস্থানের ফলে বিজেপির প্রচারকে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পরতে হয়, কারণ বামফ্রন্ট এখানে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করে যা বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক রূপ পায়নি। তবে এই অবস্থান সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলেছে, তা সীমিত। রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপি এককভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সন্দেশখালির মতো ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম) বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি করতে চেয়েছে এবং বিজেপি-বিরোধী

[67]সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ (Communal Polarization) বলতে সমাজে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করা এবং এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়কে দাঁড় করানোর প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি সাধারণত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং সমাজে বিদ্বেষ, উত্তেজনা ও সংঘাত বাড়িয়ে তোলে।

রাজনীতিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। বামফ্রন্টের এই ভূমিকায় কিছু সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক স্বর রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যা শুধুমাত্র তৃণমূল-বিজেপি দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তবে এটি রাজ্যের বৃহত্তর ভোট ব্যাংকে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। সিপিআই(এম) সন্দেশখালির ঘটনায় তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালায় এবং রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। তারা দাবি করে যে, এই ধরনের ঘটনা আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি নির্দেশ করে এবং সরকারের রাজনৈতিক দুর্নীতির প্রমাণ বহন করে। বামফ্রন্টের লাগাতার প্রচারের ফলে কিছু নিরপেক্ষ ও বুদ্ধিজীবী মহলে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে প্রশাসনের ওপর সরাসরি চাপ সৃষ্টি করার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা বর্তমানে বামফ্রন্টের নেই, ফলে সরকারের নীতিতে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। সিপিআই(এম) এই আন্দোলনের মাধ্যমে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে গোপন রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অভিযোগ তোলে। তাদের মতে, দুই দলই নিজেদের সুবিধামতো বিভিন্ন ইস্যু ব্যবহার করে এবং প্রকৃত সমস্যাগুলো আড়াল করে। এই অভিযোগ কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচিত হলেও সাধারণ মানুষের মনে তেমন গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি, কারণ রাজ্যে বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক মেরুকরণ বিজেপি ও তৃণমূলকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে বামফ্রন্টের ভূমিকার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া বহুমুখী ছিল। একদিকে তারা বামেদের অতীত শাসনের প্রসঙ্গ টেনে এনে তাদের দাবিগুলিকে অবিশ্বাস্য প্রমাণের চেষ্টা করে, অন্যদিকে প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের দায় এড়ানোর কৌশল নেয়। তৃণমূল কংগ্রেস সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যারা একসময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দমন করেছিল, এখন তারাই গণতন্ত্রের কথা বলছে—এটা হাস্যকর!" (আনন্দবাজার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। তৃণমূল নেতারা বামফ্রন্টকে 'অপ্রাসঙ্গিক শক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তাদের আন্দোলনকে মিডিয়ার মনোযোগ পাওয়ার একটি প্রচেষ্টা বলে ব্যাখ্যা দেয়। তৃণমূল নেতা সুব্রত বক্সী বলেন, "বামফ্রন্টের এখন কোনো সংগঠন নেই, জনসমর্থন নেই। তাই তারা এসব নাটক করছে" (এইসময়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। এই প্রচার তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট একাধিকবার অভিযোগ তোলে যে তৃণমূল ও বিজেপি পরোক্ষভাবে একে অপরকে সুবিধা দিচ্ছে এবং নিজেদের স্বার্থমতো মেরুকরণ তৈরি করছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলে, "বামেরা এখন বিজেপির বি-টিম

হয়ে গেছে। তারা বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছে" (এইসময়, ১ মার্চ ২০২৪)। এই বক্তব্য বিজেপি-বিরোধী ভোট ব্যাংককে একত্রিত রাখতে সাহায্য করে, যদিও সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট যে রাজনৈতিক আলোচনায় ফিরে এসেছে, তা অস্বীকার করা কঠিন হয়ে ওঠে। বামফ্রন্ট প্রশাসনের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরলে তৃণমূল সরকার একাধিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে" (সংবাদ প্রতিদিন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি সরকারি অবস্থানকে কিছুটা রক্ষা করতে সাহায্য করলেও, সন্দেশখালির ঘটনায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বামফ্রন্টের প্রচার পুরোপুরি নস্যাৎ করা সম্ভব হয়নি। তৃণমূল সরকার আন্দোলন দমনের জন্য প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং রাজনৈতিক পাল্টা প্রচার চালায়। স্থানীয় পর্যায়ে বাম কর্মীদের প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রতিহত করা হয় এবং কিছু জায়গায় পুলিশের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। ফলে আন্দোলনের প্রচার আরও বৃদ্ধি পায় এবং বামফ্রন্ট এই ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পায়। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্টকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করেনি, তবে সন্দেশখালির আন্দোলনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট যে রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছে, সেটিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করাও সম্ভব হয়নি।

ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের ভূমিকা

সন্দেশখালির সাম্প্রতিক আন্দোলনে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট[68] (আইএসএফ/ISF) যে ভূমিকা পালন করেছে, তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই দলটি শুরু থেকেই সন্দেশখালির ঘটনার বিরুদ্ধে সরব ছিল এবং আক্রান্ত নারীদের ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার দাবিতে সরাসরি আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের মূলধারার বিরোধী দলগুলোর তুলনায় আইএসএফের প্রতিক্রিয়া ছিল অধিকতর সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ, যা এই আন্দোলনে তাদের ভূমিকাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। আইএসএফের দলের বিশেষত্বের প্রধান দিক হলো সংখ্যালঘু রাজনীতির প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানো। সন্দেশখালির ঘটনায়

[68]আইএসএফ (ISF) হলো "ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট" (Indian Secular Front) নামে একটি রাজনৈতিক দল, যা মূলত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সক্রিয়।

মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভুক্তভোগী নারীরা নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন, যা রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ হয়ে ওঠে। সাধারণত সংখ্যালঘু রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আওতায় থেকেছে, কিন্তু আইএসএফ এই প্রভাব বলয় ভেঙে নারীদের দাবিকে জোরালোভাবে তুলে ধরে। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সংখ্যালঘু রাজনীতি কেবল ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত নয়, বরং এটি নিপীড়িতদের অধিকার ও ন্যায়বিচারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

- দ্বিতীয়ত, আইএসএফের আন্দোলনমূলক রাজনৈতিক কৌশল সন্দেশখালির ঘটনায় তাদের ভূমিকাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। যখন অন্যান্য বিরোধী দল আন্দোলনের জন্য অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণ করছিল, তখন আইএসএফের নেতৃত্ব সরাসরি ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করে এবং আক্রান্ত নারীদের পাশে দাঁড়ায়। আব্বাস সিদ্দিকির নেতৃত্বে এই দলটি প্রকাশ্যে দাবি তোলে যে, সন্দেশখালির ঘটনা শুধুমাত্র নির্যাতন বা অপরাধের বিষয় নয়, এটি রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফলাফল। ফলে, আইএসএফের প্রতিক্রিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় আরও আক্রমণাত্মক ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- তৃতীয়ত, এই আন্দোলনে দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করা আইএসএফের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সন্দেশখালির ভুক্তভোগীদের মধ্যে সংখ্যালঘু ও দলিত নারীদের সংখ্যা বেশি, এবং আইএসএফ এই দুই শ্রেণির ঐক্য গড়ার প্রয়াস চালিয়েছে। তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যে স্পষ্টভাবেই উঠে এসেছে, কীভাবে প্রান্তিক নারীরা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের দ্বারা শোষিত হচ্ছেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাঁদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অবশেষে, আইএসএফের ভূমিকা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকের মধ্যে ভাঙন ধরানোর ইঙ্গিত দেয়। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল সংখ্যালঘু ভোটের একচেটিয়া দখল বজায় রেখেছে, কিন্তু সন্দেশখালির ঘটনায় সংখ্যালঘু নারীদের প্রতি দলটির অবহেলা স্পষ্ট হয়ে ওঠায় আইএসএফ এই শূন্যস্থানটি পূরণ করতে সক্রিয় হয়েছে। ফলে, এটি শুধু সন্দেশখালির নির্যাতিত নারীদের জন্য ন্যায়বিচারের দাবি নয়, বরং রাজ্যের বৃহত্তর সংখ্যালঘু রাজনীতির অভিমুখ পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত বহন করে। সন্দেশখালি আন্দোলনে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ক্ষেত্রে। দলটি এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটি

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশ হিসেবে দেখেনি; বরং তারা এটিকে সাধারণ মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুবিচারের লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আইএসএফ প্রথম থেকেই সন্দেশখালির নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানোর দাবি তোলে এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়। তারা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এবং অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। দলের প্রধান নেতা নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, "এই রাজ্যে আইনের শাসন নেই। সন্দেশখালির মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, আর প্রশাসন নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে" (এইসময়, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। তাদের এই বক্তব্য আন্দোলনের নৈতিক ও মানবিক দিকটিকে জোরালো করে তোলে। আইএসএফ-এর অন্যতম অবস্থান ছিল—এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র বিজেপি বা তৃণমূলের রাজনৈতিক লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে একে সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপন করা। বিজেপি যখন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মেরুকরণের রাজনীতি করছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস যখন বিরোধীদের চক্রান্তের তত্ত্ব তুলে ধরছে, তখন আইএসএফ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে দাঁড়িয়ে দাবি তোলে যে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করুক এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। এছাড়া, আইএসএফ-এর সমর্থকরা বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেশখালি নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে দলটি প্রতিনিয়ত জনসংযোগ চালায়। দলের অন্যতম নেতা বলেন, "আমরা চাই নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, যাতে প্রকৃত সত্য সামনে আসে এবং কারো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি না হয়" (আনন্দবাজার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। এই অবস্থানের ফলে দলটি নিজেকে এক পক্ষপাতহীন সামাজিক ন্যায়ের দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তবে, আইএসএফ-এর ভূমিকা শুধুমাত্র বিবৃতি দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা মিছিল, প্রতিবাদ সভা ও গণসমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছে এবং কিছু এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে। এর ফলে, সন্দেশখালির আন্দোলন শুধু বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যকার সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ না থেকে, একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন হিসেবে উঠে আসে। তৃণমূল কংগ্রেস আইএসএফ-এর এই ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে এবং তাদের 'ভণ্ড বিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করে। তৃণমূলের এক নেতা বলেন, "আইএসএফ-এর কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি নেই, তারা শুধু আলোচনায় আসার জন্য এই ইস্যুকে ব্যবহার করছে" (সংবাদ প্রতিদিন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তৃণমূল দলটি তাদের অবস্থান রক্ষা করতে চেয়েছে, যদিও আইএসএফ এই সমালোচনাকে গুরুত্ব দেয়নি। তাই সন্দেশখালি আন্দোলনে আইএসএফ-এর ভূমিকা কেবল রাজনৈতিক লড়াইয়ের অংশ ছিল

না, বরং এটি দলটির নীতিগত অবস্থানকে দৃঢ় করতে সহায়তা করেছে। দলটি মানুষের মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক জবাবদিহিতার প্রশ্নকে সামনে এনেছে, যা আন্দোলনের চরিত্রকে বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তোলে, যা মূলত প্রশাসনিক জবাবদিহিতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং নির্যাতিতদের ন্যায়বিচারের দাবির ওপর ভিত্তি করে গঠিত ছিল। দলটি এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখেনি, বরং এটিকে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসেবে তুলেছিল। সেই দাবীগুলি হল—আইএসএফ প্রথম থেকেই সন্দেশখালির ঘটনাকে দলীয় রাজনীতির বাইরে এনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তোলে। তাদের মতে, স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ শাসক দলের চাপে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না। তাই তারা এই ঘটনার রাজ্যের বাইরে থেকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অথবা কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা তদন্তের দাবি করে। দলের প্রধান নেতা নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, *"রাজ্যের পুলিশ নিরপেক্ষ নয়, তাই আমরা চাই নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক"* (আনন্দবাজার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। আইএসএফ-এর অন্যতম দাবি ছিল সন্দেশখালির নির্যাতিত মহিলাদের উপযুক্ত আইনি সহায়তা দেওয়া এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা। দলটি অভিযোগ করে যে, শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা অপরাধীদের রক্ষা করা হচ্ছে এবং পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দলের এক নেতা বলেন, *"যে নারীরা ভয় ও লজ্জার কারণে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারছেন না, তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্যকে"* (সংবাদ প্রতিদিন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। আইএসএফ দাবি তোলে যে সন্দেশখালির ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। দলটি জানায় যে অনেক পরিবার নিরাপত্তার অভাবে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং তারা চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, *"যারা ভয় পেয়ে ঘরছাড়া হয়েছেন, তাদের নিরাপদে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হোক এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক"* (এইসময়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। আইএসএফ অভিযোগ তোলে যে সন্দেশখালিতে শুধু নির্যাতনই নয়, বরং এটি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের একটি অংশ। তারা দাবি করে, তৃণমূল সরকার প্রতিপক্ষের কণ্ঠ রোধ করতে পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করছে এবং সাধারণ মানুষকেও ভয় দেখানো হচ্ছে। দলটি প্রশাসনের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

জানিয়ে বলে, *"রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে, এটি বন্ধ হওয়া উচিত"* (সংবাদ প্রতিদিন, ১ মার্চ ২০২৪)। আইএসএফ-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল সন্দেশখালির সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তারা দাবি তোলে যে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে এই সম্প্রদায়গুলোর উপর অতিরিক্ত নিপীড়ন হচ্ছে, যা প্রশাসনের ব্যর্থতার প্রতিফলন। দলের নেতারা বলেন, *"আমরা চাই, কোনো নিরপরাধ মানুষ রাজনৈতিক হিংসার শিকার না হন, এবং তাদের সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক"* (আনন্দবাজার, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।

সন্দেশখালি আন্দোলনে আইএসএফ-এর দাবিগুলি মূলত মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত ছিল। তারা এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করে বরং জনগণের স্বার্থকে সামনে রেখে তাদের অবস্থান গ্রহণ করে। নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক হিংসা বন্ধের দাবির মাধ্যমে আইএসএফ আন্দোলনটিকে এক নতুন মাত্রা দেয়, যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সন্দেশখালি আন্দোলনে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতিকে নতুন মাত্রা দেয়। অন্যান্য বিরোধী দলের মতো এই দলও শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়, তবে তাদের মূল বক্তব্য ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংখ্যালঘু সুরক্ষার বিষয়ে প্রশাসনের ব্যর্থতা। আইএসএফ অভিযোগ তোলে যে, সন্দেশখালির নির্যাতিতদের একাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হলেও প্রশাসন তাদের সুরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, "এই আন্দোলন কোনো দলের বিরুদ্ধে নয়, এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে" (আনন্দবাজার, ১ মার্চ ২০২৪)। আইএসএফ আন্দোলনকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিরিখে দেখেনি, বরং এটিকে একটি বৃহত্তর নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। দলটি দাবি করে, সন্দেশখালিতে নারীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা দরকার। তারা সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল তোলে। এই সময়ের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নওশাদ সিদ্দিকি প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, "সরকার যদি নির্যাতিতদের পাশে না দাঁড়ায়, তবে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো" (এইসময়, ২ মার্চ ২০২৪)। আইএসএফ-এর অংশগ্রহণ আন্দোলনের ওপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। প্রথমত, এটি আন্দোলনের

রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, দলটি সরাসরি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়িয়ে এক ভিন্ন মাত্রার প্রতিবাদের বার্তা দেয়। অন্যান্য বিরোধী দল যেখানে মূলত রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে সরকারকে চাপে ফেলতে চেয়েছিল, সেখানে আইএসএফ আন্দোলনকে জনসাধারণের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছে। তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্বেগকে সামনে এনে দলটি এই বার্তা দেয় যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সমগ্র জনগণের নিরাপত্তার জন্য জরুরি। আইএসএফ-এর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলন নিয়ে প্রশাসনের ওপর আরও চাপ তৈরি হয় এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলোকেও তাদের কৌশল নতুনভাবে সাজাতে হয়। এই দলটির ভূমিকা আন্দোলনকে শুধুমাত্র একদলীয় প্রতিরোধের জায়গা থেকে বের করে বৃহত্তর নাগরিক আন্দোলনের রূপ দিতে সাহায্য করে। এর ফলে সন্দেশখালির ঘটনা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই হিসেবে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উঠে আসে।

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সন্দেশখালি আন্দোলনে আইএসএফ এর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা মুখর ছিল এবং একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করে। তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করে যে, আইএসএফ এই আন্দোলনের নামে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে এবং এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রসারিত করতে চাইছে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "আইএসএফ-এর লক্ষ্য ন্যায়বিচার নয়, বরং বিজেপির হাত শক্ত করা। তারা বিভাজনের রাজনীতি করতে নেমেছে" (আনন্দবাজার, ৩ মার্চ ২০২৪)। শাসক দলের অন্যতম অভিযোগ ছিল, আইএসএফ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এক হয়ে রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং এটিকে একটি পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা তৈরির ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করে। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, *"আইএসএফ আদতে বিজেপির 'বি-টিম' হয়ে কাজ করছে।*[69] *ওদের উদ্দেশ্য আন্দোলন নয়, রাজ্যের শান্তি নষ্ট করা"* (এই সময়, ৪ মার্চ ২০২৪)। এছাড়া, তৃণমূল সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয় যে, আইএসএফ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জনসাধারণের আবেগকে কাজে লাগিয়ে সরকারকে অযথা চাপে ফেলতে চাইছে। তৃণমূলের মহিলা নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি সচেতন, কিন্তু বিরোধীরা একজোট হয়ে ইস্যুকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে"

[69]'বি-টিম' মূলত একটি রাজনৈতিক শব্দবন্ধ, যা ব্যবহার করা হয় তখন, যখন কোনো রাজনৈতিক দলকে অপর কোনো শক্তিশালী দলের গোপন সহযোগী বা ছদ্ম মিত্র বলে চিহ্নিত করা হয়। এটি সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(যুগশঙ্খ, ৫ মার্চ ২০২৪)। তৃণমূল এই আন্দোলনকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসেবেও তুলে ধরে এবং বলে যে, বিরোধীরা একত্র হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছে। দলটির মতে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত এবং বিরোধীরা কেবলমাত্র রাজনৈতিক মাইলেজের জন্য আন্দোলনকে উস্কে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই প্রসঙ্গে বলেন, "আইএসএফ-এর মতো দলগুলো আন্দোলনের নামে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে এবং এতে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে" (সংবাদ প্রতিদিন, ৬ মার্চ ২০২৪)। সর্বোপরি, শাসক দল আইএসএফ-এর ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে এবং তাদের অবস্থানকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলে অভিহিত করে। তবে এই সমালোচনা সত্ত্বেও, আইএসএফ তার দাবিগুলিকে সামনে রেখে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং জনমতের ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

রেডস্টার সংগঠনের ভূমিকা

সন্দেশখালি আন্দোলনে রেডস্টার সংগঠনের ভূমিকা ছিল প্রতিবাদী এবং বামপন্থী রাজনীতির ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[70] সংগঠনটি এই আন্দোলনকে একটি বৃহত্তর কৃষক-শ্রমিক-নারী আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখে এবং এটিকে শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিরিখে না দেখে সামগ্রিক শোষণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ হিসেবে তুলে ধরে। রেডস্টার সংগঠনের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, সন্দেশখালিতে জমি দখল, নারী নির্যাতন এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। সংগঠনটির বক্তব্য ছিল, শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ নয়, এই ঘটনার পেছনে দীর্ঘদিনের একটি শোষণের চিত্র রয়েছে, যেখানে গরিব কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ ভুক্তভোগী। সংগঠনের এক নেতার মতে, "এটি শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর লড়াই নয়, এটি গ্রামের প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই" (যুগশঙ্খ, ৭ মার্চ ২০২৪)। রেডস্টার সন্দেশখালির আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং সরাসরি গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য সংগ্রহ করে। তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের সমর্থনে একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করে এবং দাবি তোলে যে,

[70]রেডস্টার হলো ভারতের একটি কমিউনিস্ট রাজনৈতিক সংগঠন, যা সিপিআই (এমএল) রেডস্টার নামে পরিচিত। এই সংগঠনটি পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। তারা গ্রামীণ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং কৃষিজমি আন্দোলনের মতো বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।

শুধুমাত্র অপরাধীদের গ্রেপ্তার করাই যথেষ্ট নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংগঠনের ভূমিকা আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেয়, কারণ এটি ঘটনাটিকে শুধুমাত্র এককালীন নিপীড়নের ঘটনা হিসেবে না দেখে, এর গভীরে থাকা শ্রেণিগত ও লিঙ্গভিত্তিক শোষণের দিকগুলোকেও সামনে আনে। তারা আন্দোলনকে আরও ব্যাপক কৃষক-শ্রমিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে এবং এই প্রসঙ্গে বৃহত্তর বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। সরকার পক্ষ রেডস্টারের এই অবস্থানের সমালোচনা করে এবং অভিযোগ তোলে যে, সংগঠনটি আন্দোলনকে আরও উসকে দিচ্ছে এবং সাম্যবাদী বিপ্লবের নামে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়, "কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এবং মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে" (আনন্দবাজার, ৮ মার্চ ২০২৪)। সর্বোপরি, রেডস্টার সন্দেশখালি আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থী প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে ওঠে, যা আন্দোলনকে রাজনৈতিক পরিসর ছাড়িয়ে সামাজিক শোষণের প্রসঙ্গে নিয়ে যায়। তাদের ভূমিকা শুধুমাত্র সমালোচনা বা বিক্ষোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা বিকল্প সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়েও আলোচনা তোলে এবং প্রশাসনের উদাসীনতাকে আক্রমণ করে।

আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা

সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা বহুমাত্রিক ছিল এবং এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে। এই আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলির অংশগ্রহণ একদিকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, অন্যদিকে আন্দোলনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছে। তবে, এই আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল যে এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর সরাসরি পতাকা ব্যবহার হয়নি, বরং ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় হয়েছে। ফলে, ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং আন্দোলনকারীদের সমর্থন, সংগঠন এবং দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো যেমন- এসএফআই, এবিভিপি ও অন্যান্যরা আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা ও শাসক দলের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়। তারা দাবি তোলে যে, এই আন্দোলনের মূল প্রশ্ন—নারী সুরক্ষা, রাজনৈতিক দমনপীড়ন, এবং আইনের শাসন

সরকার এড়িয়ে যেতে চাইছে। অন্যদিকে, শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি আন্দোলনের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করে এবং পুলিশের ভূমিকার পক্ষে যুক্তি দেয়। ফলে, আন্দোলন কেন্দ্রিক ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা শুধু মিছিল ও প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা সামাজিক মাধ্যমে প্রচার, পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী আন্দোলনের বিশ্লেষণ দেয় এবং সরকার বা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হাজির করে। ফলে, সন্দেশখালি আন্দোলন শুধু একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে নয়, বরং ছাত্র সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক অবস্থান ও কৌশলেরও প্রকাশ ঘটায়। এই আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। একদিকে, বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয় ভূমিকা প্রশাসনের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে, শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিরোধ আন্দোলনের স্বরূপ নিয়ে বিতর্ক তৈরি করে। ফলে, এই আন্দোলন ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত, মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক অবস্থানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটায়।

স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া সংগঠনের (এসএফআই) ভূমিকা

সন্দেশখালি আন্দোলনে স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা তাদের দীর্ঘদিনের বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংগঠনটি এই ঘটনাকে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং একে নিপীড়িত মানুষের অধিকারের লড়াই হিসেবে তুলে ধরে। এসএফআই-এর নেতারা দাবি করেন যে, সন্দেশখালির ঘটনায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের ভূমিকা স্পষ্ট। সংগঠনের এক নেতার ভাষায়, *"আমরা দেখেছি, এখানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, সাধারণ মানুষের ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদী অত্যাচার চলেছে। প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকেছে, তাই ছাত্র সমাজের দায়িত্ব এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।"* সংগঠনটি ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার চালায় এবং ছাত্রদের একত্রিত করে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। কলকাতা, হাওড়া, এবং অন্যান্য জেলা শহরে এসএফআই সদস্যরা প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয়, যার মধ্যে

রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, এবং রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের এক কর্মী বলেছেন যে, *"শুধু কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, আমাদের রাস্তায় নামতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, এটাই আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা।"* এসএফআই-এর পক্ষ থেকে সন্দেশখালিতে সরেজমিন তদন্তের জন্য ছাত্র প্রতিনিধিদের একটি দল পাঠানো হয়, যারা ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে এবং আন্দোলনের পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করে। এই প্রতিনিধি দলের এক সদস্য বলেন, *"আমরা গ্রামে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি, শাসক দল এখানে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, আর পুলিশ দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।"* এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এসএফআই একটি স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, ছাত্র সংগঠনগুলিও সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠনটি নিজেদের আদর্শিক অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালায়। সন্দেশখালি আন্দোলন এসএফআই-এর জন্য শুধুমাত্র একটি প্রতিবাদ ছিল না; এটি তাদের সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক অবস্থানের একটি প্রকাশ হিসেবে কাজ করে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে এসএফআই একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ, নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো এবং ছাত্র-যুব সমাজকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা। সংগঠনটি আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক পরিসরে সক্রিয়ভাবে প্রচার চালায়। এই সংগঠনের কর্মসূচীগুলি হল—

- প্রথমত, এসএফআই কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, এবং অন্যান্য জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে সংগঠনের নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল বের করা হয় (গণশক্তি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। যেখানে সংগঠনের নেতারা বলেন, *"এই লড়াই শুধুমাত্র সন্দেশখালির নারীদের জন্য নয়, এটি গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বিষয়। পুলিশ যদি সঠিক ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে ছাত্র সমাজ আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।"*
- দ্বিতীয়ত, সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম সন্দেশখালি এলাকায় পাঠানো হয়, যারা ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে এবং বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে (এই

সময়, ১ মার্চ ২০২৪)।[71] এক এসএফআই কর্মী বলেন, *"আমরা সরেজমিনে গিয়ে দেখেছি, গ্রামবাসীরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা চাই নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।"*

- তৃতীয়ত, এসএফআই সদস্যরা রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়, যেখানে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় এবং ঘটনাটির সঠিক তদন্তের আহ্বান জানায়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, *"রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, আর ছাত্র সমাজ চুপ করে থাকতে পারে না। আমরা চাই, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক"* (আনন্দবাজার, ৩ মার্চ ২০২৪)।
- চতুর্থত, সংগঠনটি গণস্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করে, যেখানে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা হয় *(সংবাদ প্রতিদিন, ৫ মার্চ ২০২৪)*। এসএফআই নেতাদের মতে, *"শুধু বিক্ষোভ করলেই হবে না, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে এই আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝানো জরুরি। তাই আমরা ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে প্রচার চালিয়েছি।"*
- পঞ্চমত, সংগঠনটি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে এবং দাবি করে যে, রাজ্যের শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এই ঘটনার বিরুদ্ধে নিরব থেকেছে (গণশক্তি, ৭ মার্চ ২০২৪)। এক এসএফআই নেতা বলেন, *"টিএমসিপি যদি সত্যিই ছাত্রদের সংগঠন হতো, তাহলে তারা সন্দেশখালির নির্যাতিতদের পক্ষে দাঁড়াত। কিন্তু তারা শুধুমাত্র শাসক দলের স্বার্থ রক্ষা করছে।"*

এই কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে এসএফআই সন্দেশখালি আন্দোলনকে একটি রাজ্যব্যাপী ইস্যুতে পরিণত করতে সক্ষম হয় এবং ছাত্রসমাজের একাংশকে সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে এসএফআই-এর পোস্টার ও স্লোগান ছিল সরাসরি শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং নারী সুরক্ষার দাবিতে সোচ্চার। সংগঠনটি তাদের পোস্টারে সন্দেশখালির নির্যাতনের ঘটনাকে রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটের অংশ হিসেবে দেখিয়েছে এবং ছাত্রসমাজকে এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামার আহ্বান জানিয়েছে। এসএফআই-এর পোস্টারগুলোর মূল সুর ছিল 'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে

[71]ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম বলতে বোঝায় একটি নিরপেক্ষ তথ্য অনুসন্ধানী দল, যা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা, অভিযোগ বা সংকট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করে। সাধারণত এই ধরনের টিম মানবাধিকার সংগঠন, গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল বা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে গঠিত হয়।

ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ লড়াই'। বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও শহরের রাস্তায় লাগানো পোস্টারে লেখা ছিল "সন্দেশখালির নির্যাতিত নারীদের বিচার চাই", "শাসক দলের সন্ত্রাস বন্ধ করো", এবং "নারী নির্যাতনের রাজনীতি চলবে না" (গণশক্তি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। পোস্টারে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলা হয়েছিল যে, প্রশাসন নির্যাতিতদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এ কারণে রাজ্য জুড়ে ছাত্রদের প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। এসএফআই-এর বিভিন্ন বিক্ষোভে ব্যবহৃত স্লোগানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল— "পুলিশ কেন চুপ? মদত দিচ্ছে তৃণমূল!", "নারী সুরক্ষা চাই, মিথ্যা আশ্বাস নয়", "সন্দেশখালির লজ্জা—মমতা সরকারের বোঝা", এবং "লড়াই চলছে, চলবে—নারী নির্যাতন রুখবো" (সংবাদ প্রতিদিন, ১ মার্চ ২০২৪)। এই স্লোগানগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সংগঠনটি আন্দোলনকে শুধু নির্যাতিতদের ন্যায়ের দাবিতে সীমাবদ্ধ না রেখে, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবেও গড়ে তুলেছিল। বিশেষভাবে, সংগঠনের তৈরি পোস্টার ও ব্যানারগুলোর মধ্যে কিছুতে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও পুলিশি ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এক এসএফআই নেতা বলেন, "আমাদের পোস্টারে আমরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি স্পষ্ট করেছি। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছি যে, কেন নির্যাতিতরা সুবিচার পাচ্ছেন না" (এইসময়, ৪ মার্চ ২০২৪)। এসএফআই-এর পোস্টার প্রচার কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংগঠনটি বিভিন্ন এলাকায় দেয়াল লিখন ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমেও তাদের দাবিগুলি তুলে ধরে। বিভিন্ন এলাকায় লেখা হয়েছিল—"যদি রুখতে না পারো, তবে রাজ্য থাকবে না", যা এক অর্থে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি হুঁশিয়ারি হিসাবে কাজ করেছিল (আনন্দবাজার, ৬ মার্চ ২০২৪)। এসএফআই-এর এই ধরনের পোস্টার ও স্লোগানের মাধ্যমে আন্দোলনের বার্তাটি আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি, আন্দোলনকে কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে না দেখে তা রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করার একটি কৌশলগত প্রচেষ্টা হিসেবে কাজ করে।

সন্দেশখালি আন্দোলনে এসএফআই একাধিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিল, যা রাজনৈতিক বিরোধিতা, প্রশাসনিক বাধা এবং আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সংগঠনের বিরুদ্ধে সমালোচনা মূলত তিনটি দিক থেকে এসেছিল—শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস, বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন এবং আন্দোলনের মধ্যে থাকা কিছু সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে। সেগুলি হল—

- প্রথমত, শাসক দলের তরফ থেকে এসএফআই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে, তারা এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে এবং বামপন্থীদের হারানো রাজনৈতিক জমি ফিরে পাওয়ার একটি কৌশল হিসেবে কাজ করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির এক নেতা বলেন, "এসএফআই ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে রাজনৈতিক রঙ দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।" তৃণমূল নেতারা অভিযোগ করেন যে, এসএফআই নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে আন্দোলনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ন্যায়বিচারের থেকে বেশি সরকারবিরোধী প্রচার (আনন্দবাজার, ৭ মার্চ ২০২৪)।
- দ্বিতীয়ত, বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও এসএফআই-এর ভূমিকার সমালোচনা করে, বিশেষ করে সন্দেশখালির ঘটনার আগে বামফ্রন্টের নীরব ভূমিকার কথা তুলে ধরে (এই সময়, ৯ মার্চ ২০২৪)। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল, তখন তারাও প্রশাসনের এই ধরনের অপব্যবহার করেছিল। এখন এসএফআই বড় বড় কথা বলছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ আর ওদের বিশ্বাস করে না।" বিজেপির তরফ থেকে বলা হয় যে, এসএফআই এই আন্দোলনকে সত্যিকারের ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের বদলে রাজনৈতিক পুনরুত্থানের একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে।
- তৃতীয়ত, প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন হতে হয় এসএফআই-কে। সংগঠনের ছাত্রনেতারা যখন সন্দেশখালিতে গিয়ে আন্দোলনে অংশ নিতে চান, তখন পুলিশ তাদের আটকে দেয় এবং কিছু সদস্যকে আটক করা হয় (গণশক্তি, ১০ মার্চ ২০২৪)। এক ছাত্রনেতা বলেন, *"আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে। তৃণমূলের মদতে আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে।"*
- চতুর্থত, গোটা আন্দোলনের অভ্যন্তরেও কিছু সাধারণ অংশগ্রহণকারী ও নির্যাতিত পরিবার এসএফআই-এর ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। অনেকের মতে, বামফ্রন্ট অতীতে ক্ষমতায় থাকার সময় এ ধরনের সমস্যার সমাধান করেনি, ফলে এখন এসএফআই-এর দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়েছে। অনেক আন্দোলনকারী বলেন, "যাঁরা একসময় পুলিশের নির্যাতনকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁরা এখন কীভাবে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে কথা বলছেন?"

এসএফআই-এর এই সমালোচনাগুলোর ফলে আন্দোলনে তাদের অবস্থান কিছুটা চাপে পড়ে, তবে সংগঠনটি তাদের কর্মসূচি জারি রাখে এবং আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নিজেদের সক্রিয় রাখে। সংগঠনটি যুক্তি দেয় যে, তারা কেবলমাত্র ছাত্রদের অধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার জন্যই লড়াই করছে এবং এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার চেষ্টা আসলে শাসক দলের একটি কৌশল।

এবিভিপি সংগঠনের ভূমিকা

সন্দেশখালি আন্দোলনে এবিভিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠনটি মূলত নারী নির্যাতন, জমি দখল, এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হয় এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান গ্রহণ করে। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এবিভিপি সরাসরি মাঠে নেমে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকার দাবি তোলে। এবিভিপি-এর অন্যতম প্রধান কর্মসূচি ছিল ছাত্র-যুব আন্দোলনের মাধ্যমে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা। সংগঠনের এক নেতা বলেন, *"এই সরকার ছাত্রদের কণ্ঠরোধ করতে চায়, কিন্তু আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাস্তায় আন্দোলন ছড়িয়ে দেব।"* এবিভিপি কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা এবং অন্যান্য জেলায় বিক্ষোভ মিছিল করে এবং সন্দেশখালির ঘটনার তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির হস্তক্ষেপ দাবি করে (এই সময়, ৮ মার্চ ২০২৪)। এছাড়া, এবিভিপি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে প্রচার অভিযান চালিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করে। সংগঠনটি বিভিন্ন ক্যাম্পাসে সভা করে এবং ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে এই আন্দোলনে যুক্ত হতে। এক এবিভিপি নেতা বলেন, *"ছাত্রসমাজকে জাগ্রত করা এখন সময়ের দাবি, আমরা সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।"* এবিভিপি-এর অন্যতম দাবি ছিল সন্দেশখালির ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করা এবং নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার প্রদান। সংগঠনের পোস্টারে লেখা হয়েছিল, *"সন্দেশখালির মাটিতে রক্তের দাগ, দোষীদের ফাঁসি চাই!"* তারা আরও দাবি তোলে যে, রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং যারা এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক না কেন, কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে (সংবাদ প্রতিদিন, ১০ মার্চ ২০২৪)। তবে এবিভিপি নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। শাসক দল এবং প্রশাসনের তরফ থেকে সংগঠনটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তারা এই আন্দোলনকে

সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চাইছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, *"এবিভিপি আসলে বিজেপির ছাত্র সংগঠন, তারা আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে।"* পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয় যে, এবিভিপি কর্মীরা কিছু এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল, যদিও সংগঠনের তরফ থেকে এটি অস্বীকার করা হয় (প্রতিদিন, ১১ মার্চ ২০২৪)। এবিভিপি-এর আন্দোলনের ফলে সন্দেশখালি ইস্যু রাজ্যের বাইরে জাতীয় স্তরেও গুরুত্ব পায়। সংগঠনটি দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যে এই প্রসঙ্গে প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয়, যার ফলে বিজেপি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এই বিষয়টিকে সামনে আনতে শুরু করে। এক এবিভিপি নেতা বলেন, *"আমরা পশ্চিমবঙ্গে মা-বোনদের সম্মানের জন্য লড়ছি, এটি শুধু রাজ্যের বিষয় নয়, সারা দেশের ছাত্রসমাজ আমাদের পাশে আছে।"* এই আন্দোলনে এবিভিপি-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ সন্দেশখালি ইস্যুকে বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সংগঠনটি আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে এবং তার ফলে সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায় (দ্য টেলিগ্রাফ, ১২ মার্চ ২০২৪)।

এবিভিপি-র আন্দোলনে অংশগ্রহণ সন্দেশখালি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে নতুন মাত্রা দেয়। সাধারণত ছাত্র সংগঠনগুলি যখন কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে রাস্তায় নামে, তখন তাদের পতাকা, ব্যানার বা সংগঠনের রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্ট থাকে। তবে সন্দেশখালির আন্দোলন সেই দিক থেকে ব্যতিক্রম ছিল, কারণ এই আন্দোলনে কোনো দলীয় পতাকা বা রাজনৈতিক রঙ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এবিভিপি মাঠে নেমে সরাসরি আন্দোলনে যুক্ত হলেও সংগঠনের কর্মীরা দলীয় পতাকা বা প্রচলিত রাজনৈতিক স্লোগান ব্যবহার করতে পারেননি। এর মূল কারণ ছিল, আন্দোলনকারীরা চাইছিলেন এটিকে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি না বানিয়ে সাধারণ মানুষের আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে (এইসময়, ১৪ মার্চ ২০২৪)। এবিভিপি নেতা বলেন, *"এই আন্দোলন শুধুমাত্র আমাদের সংগঠনের নয়, এটি রাজ্যের মা-বোনেদের সম্মানের লড়াই। তাই আমরা দলীয় পতাকা সরিয়ে রেখে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি।"* এবিভিপি-র এই অবস্থানের ফলে আন্দোলন আরও বৃহৎ রূপ পায়, কারণ সাধারণ জনগণও এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের সদস্যরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে প্রচার চালায়, যা আন্দোলনের বিস্তার বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবিভিপি আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সফল হয় এবং ছাত্রদের একাংশ এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। এবিভিপি-এর সক্রিয় ভূমিকা আন্দোলনের কিছু বিশেষ

দিককে প্রভাবিত করে। প্রথমত, এই আন্দোলন শুধুমাত্র স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে আন্দোলনকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এবিভিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করে, যার ফলে কেন্দ্রীয় স্তরে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়। বিজেপি এই আন্দোলনকে সামনে এনে রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে, যা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। তবে, পতাকা ছাড়া আন্দোলন করলেও, এবিভিপি-র ভূমিকা নিয়ে সমালোচনাও ছিল। বিরোধী দল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয়, এবিভিপি আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে এবং এর মাধ্যমে তারা বিজেপির স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, *"ওরা পতাকা ছাড়লেও, ওদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। আসলে ওরা বিজেপির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে"* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মার্চ ২০২৪)।

শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপির ভূমিকা

টিএমসিপি সন্দেশখালি আন্দোলনের প্রসঙ্গে শাসক দলের অবস্থানকে সমর্থন করে এবং আন্দোলনকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করে। সংগঠনের নেতারা দাবি করেন যে, এই আন্দোলন আসলে বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধী শক্তির চক্রান্ত, যা রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। তারা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা করে ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে, এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য উন্নয়ন ব্যাহত করা এবং সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করা। টিএমসিপি পুলিশের ভূমিকাকেও সমর্থন জানায় এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ মার্চ ২০২৪)। সাক্ষাৎকারে সংগঠনের এক নেতা বলেন, *"পুলিশ নিরপেক্ষভাবেই কাজ করছে, কিন্তু বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে পুলিশের ওপর দোষ চাপাচ্ছে।"* আন্দোলন নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে টিএমসিপি পাল্টা প্রচারে নামে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার ও স্লোগান দেয়, যেখানে বলা হয়, "উন্নয়নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত রুখে দাও, বাংলার সম্মান বাঁচাও" (এই সময়, ১৯ মার্চ ২০২৪)। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও নারীদের সুরক্ষার জন্য নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরতে তারা প্রচার চালায় এবং দাবি করে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার মেয়েদের জন্য যা করেছে, তা অন্য কোনো সরকার করেনি। তারা এই আন্দোলনকে নারীদের সুরক্ষার বিষয় নয়, বরং

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে দেখে। সংগঠনের এক সদস্য বলেন, "এই আন্দোলন বিজেপির পরিকল্পিত, এর সঙ্গে নারীদের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই।" অন্যদিকে, বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি টিএমসিপির এই অবস্থানের সমালোচনা করে এবং অভিযোগ তোলে যে, তারা আসলে শাসক দলের ছাত্র শাখা হিসেবে কাজ করছে এবং প্রকৃত সমস্যাগুলো থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ মার্চ ২০২৪)। এক এসএফআই নেতা বলেন, *"টিএমসিপি নিজেদের শাসক দলের মুখপাত্র বানিয়েছে, তারা আসলে ছাত্রদের দাবির বিপক্ষে গিয়ে সরকারের পক্ষ নিচ্ছে।"* টিএমসিপির এই ভূমিকার ফলে ছাত্রদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। অনেক শিক্ষার্থী সরকারের প্রতি আস্থা রাখলেও, অনেকেই টিএমসিপির এই অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে সন্দেশখালি আন্দোলন নিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও চর্চা শুরু হয়, যা রাজ্যের ছাত্র রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।

টিএমসিপি সন্দেশখালি আন্দোলনের সময় বিভিন্ন বিরোধী ছাত্র সংগঠনের তীব্র সমালোচনার মুখে পরে এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষ না নেওয়ার কারণে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর মতে, টিএমসিপি বাস্তব সমস্যাগুলো থেকে নজর সরিয়ে আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে এবং সরকারের পক্ষ নিয়ে অবস্থান নিয়েছে। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো অভিযোগ তোলে যে, টিএমসিপি পরিকল্পিতভাবে আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা করেছে এবং সরকারি মদতে পাল্টা প্রচার চালিয়েছে। এসএফআই-এর এক নেতা বলেন, *"যেখানে ছাত্ররা নারীদের নিরাপত্তা ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, সেখানে টিএমসিপি আন্দোলনের বদনাম করতে ব্যস্ত।"* এবিভিপিও টিএমসিপির ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে এবং অভিযোগ তোলে যে, তারা শুধু শাসক দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলনকে ছোট করে দেখাচ্ছে। এক এবিভিপি নেতা বলেন, *"টিএমসিপির ভূমিকা ছাত্রদের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়, বরং সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য।"* বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর তরফ থেকে টিএমসিপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তারা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে পুলিশি ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে এবং আন্দোলনকারীদের দোষী প্রমাণ করতে চাইছে। এক ডিএসও নেতা বলেন, *"টিএমসিপি শাসক দলের মতোই পুলিশের অন্যায়কে সমর্থন করছে, তাই সাধারণ ছাত্রদের স্বার্থ এরা দেখছে না।"* অনেক জায়গায় টিএমসিপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সভা করার এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার চালানোর

অভিযোগ ওঠে। বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর মতে, টিএমসিপির প্রচার শুধুমাত্র সরকারি অবস্থানকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে এবং আন্দোলনের মূল ইস্যুগুলিকে ধামাচাপা দিয়েছে।

ফলে, সন্দেশখালি আন্দোলনে টিএমসিপির এই ভূমিকা নিয়ে রাজ্যের ছাত্র মহলে দ্বিধাবিভক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। একদিকে তারা নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরকারি প্রচারের মুখপত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়, অন্যদিকে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর চাপের মুখে পড়তে হয় এবং অনেক জায়গায় টিএমসিপির কর্মসূচির বিরোধিতাও হয়।

সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটায়। এই আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অভিব্যক্তির প্রতিফলন নয়, বরং এটি সামাজিক সংঘাত, শ্রেণিচেতনা, এবং নাগরিক অংশগ্রহণের একটি উদাহরণ। সেই প্রতিফলনগুলি হল—

- প্রথমত, সংঘর্ষ ও প্রতিরোধের সামাজিক চরিত্র—সমাজবিজ্ঞানী রালফ ডারেনডর্ফ (১৯৫৯) সংঘাত তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত কাঠামো বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের জন্ম দেয়। সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ একদিকে শাসক ও বিরোধী পক্ষের সংঘর্ষের ধারাকে স্পষ্ট করে তোলে, অন্যদিকে এটি ছাত্রসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রতিরোধ গঠনের চিহ্ন বহন করে।
- দ্বিতীয়ত, ছাত্র রাজনীতির সামাজিক দ্বৈততা—আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা দ্বিমুখী। একদিকে, এসএফআই, এবিভিপি এবং অন্যান্য বিরোধী সংগঠন সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েছে, অন্যদিকে শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি সরকারপক্ষের অবস্থানকে সমর্থন করেছে। এই পার্থক্য ছাত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক দ্বৈততাকে ফুটিয়ে তোলে এবং ছাত্র রাজনীতির মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে।
- তৃতীয়ত, রাজনৈতিক বৈধতা ও ছাত্র আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ—শিল্‌স (১৯৭১) উল্লেখ করেছেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলন তখনই কার্যকর হয় যখন তা সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে নৈতিক ও আদর্শগত বৈধতা পায়। সন্দেশখালি আন্দোলনে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা যেখানে

আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি তুলে ধরতে চেয়েছে, সেখানে টিএমসিপি প্রশাসনের দৃষ্টিকোণকে জোরদার করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা ও তার কার্যকারিতা নিয়ে সমাজে ভিন্নমত তৈরি হয়েছে।

- চতুর্থত, আন্দোলনের প্রতীকী রাজনীতি ও গণসচেতনতা—চার্লস টিলি (২০০৪) দেখিয়েছেন যে, সামাজিক আন্দোলন কেবল দাবি-দাওয়া তুলে ধরে না, এটি একটি প্রতীকী রাজনীতির ক্ষেত্রও তৈরি করে। সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর পোস্টার, স্লোগান এবং মিছিলের ধরন আন্দোলনের রাজনৈতিক রঙকে ছাপিয়ে সামাজিক ইস্যুগুলিকে সামনে নিয়ে আসে। তবে, পতাকা ব্যবহার না করার শর্ত আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করেছে, যা আন্দোলনের গতিশীলতায় প্রভাব ফেলেছে।

সুতরাং, সমাজতাত্ত্বিকভাবে বিচার করলে সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা একটি দ্বন্দ্বমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ, যেখানে একদিকে শাসক ও বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর ভিন্ন অবস্থান সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর প্রতিফলন ঘটায়, অন্যদিকে এটি ছাত্রদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশ করে। ছাত্র আন্দোলনগুলোর এই দ্বৈত ভূমিকা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তনশীলতাকে সংযুক্ত করে এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের একটি বিশেষ রূপ গঠনের দিকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে

সন্দেশখালি আন্দোলনের সামগ্রিক আলোচনা ও বর্ণনা থেকে বিশেষ কিছু দিকের ধারনা উঠে আসছে সেগুলি হল—সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কীভাবে ক্ষমতার কাঠামো, সামাজিক প্রতিরোধ, নাগরিক সক্রিয়তা, এবং শ্রেণিচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে তার একটি স্পষ্ট ধারণার বিষয় উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে রালফ ডারেনডর্ফের (সংঘাত তত্ত্ব, আন্তোনিও গ্রামশির) হেজেমনি তত্ত্ব এবং চার্লস টিলির সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ডারেনডর্ফের মতে, সমাজে সংঘাত অনিবার্য এবং এটি সামাজিক পরিবর্তনের চালিকা শক্তি। সন্দেশখালি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়, যেখানে স্থানীয় জনগণ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। আন্দোলনটি শুধুমাত্র নির্যাতিত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এটি ক্ষমতার

অসমতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলস্বরূপ। আন্দোলনকারীরা কেবল জমি দখল বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি, বরং তারা দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছেন, যা ডারেনডর্ফের সংঘাত তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্তোনিও গ্রামশির (১৯৭১) হেজেমনি তত্ত্ব অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কেবল রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্রের মাধ্যমে শাসন করে না, বরং তারা জনগণের মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক অনুমোদনও আদায় করে। সন্দেশখালি আন্দোলনে এই হেজেমনি ভাঙার একটি প্রয়াস দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে, কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে এই আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে নারী ও কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শগত নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং জনগণ সচেতনভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। চার্লস টিলির (২০০৪) মতে, সামাজিক আন্দোলন কেবল বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ নয়, বরং এটি সংগঠিত কাঠামোর মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনার একটি উপায়। সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা এই ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সরাসরি পতাকা ব্যবহার করতে পারেনি, যা প্রমাণ করে যে এটি শুধুমাত্র একটি দলীয় রাজনৈতিক লড়াই ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছিল। টিলির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আন্দোলনকারীদের সংগঠিত প্রচেষ্টা, বিক্ষোভ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, এবং মিডিয়ার ভূমিকা এই আন্দোলনকে একটি কার্যকর সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীদের সক্রিয় ভূমিকা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রতিরোধকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু সন্দেশখালি আন্দোলনে তারা সম্মিলিতভাবে রাস্তায় নেমেছেন। এটি পিয়ের বুর্দিয়ু-র প্রতীকী সহিংসতা (সিম্বলিক ভায়োলেন্স) ধারণার বিপরীতে নারীদের এজেন্সি প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত। নারীদের সংগঠিত হওয়া এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ উত্থাপন করা তাদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিরোধ বা প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে দেখা হলে এর গভীর সামাজিক তাৎপর্য উপেক্ষিত হবে। কয়েকটি নতুন দিক উঠে এসেছে, যা এখনও পর্যন্ত আন্দোলন বিশ্লেষণে কম গুরুত্ব পেয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ—

আন্দোলনের স্থানিকতা ও গ্রামীণ প্রতিরোধ: সন্দেশখালি আন্দোলন একটি নগর-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং এটি গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। গ্রামভিত্তিক সামাজিক

প্রতিরোধের চরিত্র বোঝার জন্য জেমস স্কট-এর ‘এভরিডে ফর্মস অব পিজেন্ট রেজিস্ট্যান্স’ তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক, যেখানে কৃষক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

সাংবাদিকতা ও মিডিয়ার ভূমিকা: এই আন্দোলন রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মিডিয়ার ভূমিকা শুধুমাত্র তথ্য প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও বিকল্প সাংবাদিকতার উত্থান সন্দেশখালির ঘটনাকে আরও বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে দিয়েছে।

আন্দোলনের প্রতীকী মাত্রা: সন্দেশখালি আন্দোলনে পতাকা ব্যবহার না করার শর্ত একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি করেছে। এটি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে মেরুকরণ রোধ করলেও আন্দোলনের সাংগঠনিক দিককে কিছুটা দুর্বল করেছে। জুডিথ বাটলারের ‘পারফরম্যাটিভিটি’ তত্ত্ব অনুসারে, প্রতীক ও চিহ্নহীন আন্দোলন কীভাবে রাজনৈতিক ভাষ্যকে পরিবর্তন করতে পারে, তা এই প্রসঙ্গে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর নতুন ভূমিকায় উত্তরণ: সাধারণত ছাত্র আন্দোলন কেবল শহরকেন্দ্রিক হয়, কিন্তু সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলো সরাসরি গ্রামীণ অঞ্চলে গিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে, যা ভারতের ছাত্র রাজনীতির জন্য একটি নতুন প্রবণতা নির্দেশ করে। এটি মার্ক গ্রানোভেটার-এর ‘স্ট্রেংথ অব উইক টাইস’ তত্ত্বের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, যেখানে দুর্বল সামাজিক সংযোগও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক যাত্রায় একটি বড় বৈপরীত্য দেখা যায় একসময় যে দল শোষণ, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসেছে, শাসনে আসার পর সেই দলই একই অভিযোগের মুখে পড়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনে তৃণমূল নিজেকে নিপীড়িত মানুষের রক্ষাকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছিল এবং বাম সরকারের প্রশাসনিক দমন-পীড়ন, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করেছিল। কিন্তু ২০১১ খ্রিঃ সরকার পরিবর্তনের পর, ক্ষমতায় এসে তৃণমূল নিজেই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, দুর্নীতি ও শোষণের অভিযোগে জড়িত হয়ে পড়েছে। এই পরিবর্তনকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার দ্বৈত চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। বিরোধী অবস্থায় থাকাকালীন তৃণমূল একদিকে ভূমি

অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সেই আন্দোলনকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু যখন দলটি ক্ষমতায় এলো, তখন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে স্থানীয় স্তরে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করল। সন্দেশখালির ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে অভিযোগ উঠেছে যে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে নারী নির্যাতন, জমি দখল ও দুর্নীতির মাধ্যমে শোষণের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এই দ্বৈত নীতি মূলত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার একটি রূপ। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তৃণমূল প্রথমে জনসমর্থন আদায় করেছিল, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে, যেই শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে দলটি উঠে এসেছিল, এক দশক পর সেই একই ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছে। এই বাস্তবতা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চক্রেরই পুনরাবৃত্তি, যেখানে বিরোধী দল শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্ষমতায় আসে এবং পরে নিজেরাই সেই শোষণের কাঠামোর অংশ হয়ে যায়।

এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক তিনটি বড় আন্দোলনের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ছাত্র আন্দোলন কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো বা অন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাথে সমান্তরালে চলেছে। এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ছাত্র আন্দোলন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের আন্দোলনকে প্রভাবিত করছে, আবার তারাও ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করছে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আন্দোলনগুলোর গতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র রাজনীতির একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যেখানে ছাত্ররা কেবল শিক্ষাঙ্গনের বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেনি, বরং সমাজ ও রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতেও নেতৃত্ব দিয়েছে। সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন, আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই, নব্বইয়ের দশকে মন্ডল কমিশন বিতর্ক এবং সাম্প্রতিক কালে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন—এই সব ক্ষেত্রেই ছাত্ররা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই ছাত্ররা শুধুমাত্র নিজেদের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সমাজের সমস্যা নিয়েও সরব হচ্ছে। ফলে, যখন দুর্নীতি, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা রাজনৈতিক নিপীড়ন নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। আরও যে বিষয় এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ে বেকারত্ব এবং চাকরির অনিশ্চয়তা ছাত্র ও যুবসমাজের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি, বেসরকারি খাতে সুযোগের অভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি করছে। ফলে,

যখন সরকারি চাকরির দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন হয়, ছাত্র সংগঠনগুলো সেটিকে নিজেদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখে। একইভাবে, যখন কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির বিরুদ্ধে নিপীড়ন বা শোষণ হয়, ছাত্রদের মধ্যেও এর প্রভাব পরে, কারণ তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও একই ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছে। এর সাথে আরও একটি বিষয় উঠে আসছে তা হল—বর্তমান সময়ে প্রথাগত বিরোধী দলগুলো তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে বা সীমিত রাজনৈতিক কৌশলে আটকে রয়েছে। তাই ছাত্র সংগঠন ও স্বাধীন প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলো অনেক সময় বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে। সন্দেশখালির ঘটনায় যেমন দেখা গেছে, ছাত্র সংগঠনগুলো একদিকে নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে তারা সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে। অর্থাৎ, ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক প্রতিরোধের শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করছে এবং সামাজিক আন্দোলনের নতুন ধারাগুলোকে শক্তিশালী করছে। এই বাস্তবতাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ছাত্র আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংযোগ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের একটি অনিবার্য ফলাফল। ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ঐতিহাসিক আন্দোলনধারার সংমিশ্রণে ছাত্ররা আজ বৃহত্তর আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে। অন্যদিকে, অন্য স্টেকহোল্ডারদের আন্দোলনও ছাত্র আন্দোলনের ধরণ ও পরিসরকে প্রভাবিত করছে, যার ফলে একটি পারস্পরিক শক্তিবৃদ্ধির সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটি ভবিষ্যতে আরও গভীর ও বিস্তৃত হতে পারে, বিশেষ করে যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংকট আরও বাড়ে।

সন্দেশখালি আন্দোলনের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং এটি সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠন এবং ক্ষমতার নতুন বন্টনের দাবি করে। ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, বিশেষ করে কীভাবে এটি অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে এটি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে এই আন্দোলনকে বৃহত্তর নাগরিক প্রতিরোধ ও সামাজিক ন্যায়ের দাবির অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় গণতন্ত্র ও সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ আমরা সন্দেশখালি আন্দোলনের আলোচনা শেষে পূর্ববর্তী সমস্ত অধ্যায়ের আলোচনা থেকে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন অধ্যায়টি আলোচনা করে এই গবেষণার একটি দিক নির্দেশ করছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক এই গবেষণাতে আমি ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রভাবের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছি। আমার এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল, ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি তা চিহ্নিত করা, ছাত্র আন্দোলনের ধরনের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলি কি তা ব্যাখ্যা করা, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং আন্দোলনের গতিপথ পর্যালোচনা করে গত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলনের ধারাকে বিশ্লেষণের মাধমে তুলে ধরা। এই অধ্যায়ে আমি আমার গবেষণা সন্দর্ভের পূর্বের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে উল্লিখিত প্রতিটি আনুসন্ধানের বিষয়গুলিকে আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার অর্জিত অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ

আমি আমার গবেষণাতে দেখতে চেয়েছিলাম রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন দ্বারা সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি কেমন? এবং সেগুলি কেমন ভাবে কাজ করছে সমাজ এবং রাজনীতিতে। এই গবেষণায় আমি দেখতে পেয়েছি যে, পশ্চিমবঙ্গের বিগত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্য মূলত তিন ধরনের— পৃষ্ঠপোষকতা, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রো-অ্যাকটিভ। অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকতার আন্দোলন কেন? তার কারণ—সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের বিশ্লেষণে আমি লক্ষ্য করেছি যে, এই আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলি দ্বিধাবিভক্ত ভূমিকা পালন করেছে। সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠন SFI মূলত পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের 'শিল্পায়ন নীতি'র পক্ষে ছিল এবং তারা জমি অধিগ্রহণ পক্ষে ছিল। অন্যদিকে, তখন TMCP এবং অন্যান্য বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি কৃষকদের জমি রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। আবার সন্দেশখালির জমিহারাদের আন্দোলন এবং চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত (শিক্ষাক্ষেত্রে) দুর্নীতির ইস্যুতে TMCP সংগঠন

নানাভাবে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিরোধিতা না করে সরকারের পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছে। অন্যদিকে SFI সংগঠন এই দুই ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ও TMCP-কে ব্যাপকভাবে কাঠগড়ায় তুলে আন্দোলন চালিয়ে গেছে। আবার TMCP সংগঠনও সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম ইস্যুতে যখন বিরোধী দলের ভূমিকাতে ছিল তখন তার বিরোধিতা করেছে তৎকালীন সরকারের, আবার নিয়োগ দুর্নীতি ও সন্দেশখালি ইস্যুতে চুপ থেকেছে। অর্থাৎ প্রধান শাসকদলের ছাত্র সংগঠনগুলি যখন ক্ষমতায় তখন সে শাসকের পক্ষে অন্যদিকে সেই সংগঠন যখন বিরোধী অবস্থানে তখন বিরোধিতা করছে। এখানে রাজনৈতিক-সামাজিক ইস্যুগুলির কোনও ভূমিকা নেই, পরিষ্কারভাবে নীতি ও মূল্যবোধের স্খলন হতে দেখা যাচ্ছে।

প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সংগঠিত হয়, যেমন- চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি, যেখানে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয় ঘটনার অবিলম্বে সমাধান বা প্রতিবাদ জানানো। অন্যদিকে, প্রো-অ্যাকটিভ আন্দোলনগুলি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যেখানে আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় আমি বিশ্লেষণ করতে পেরেছি যে, রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির কৌশলগত অবস্থান, আদর্শিক ভিত্তি এবং সরকার বা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এই আন্দোলনগুলির চরিত্র নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

গবেষণায় আমি দেখতে পেয়েছি যে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম এবং সন্দেশখালি আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় গড়ে উঠলেও, এগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রো-অ্যাকটিভ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। সিঙ্গুর আন্দোলন মূলত জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়ায় সংগঠিত হয়েছিল, যা একটি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে গবেষণায় আমি দেখতে পেয়েছি যে, এই আন্দোলন কেবল জমি ফেরতের দাবিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি বৃহত্তর শিল্পনীতি ও শাসন কাঠামোর পরিবর্তনের দাবিও উত্থাপন করেছিল। ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কৃষকদের প্রতি তাদের সংহতি আন্দোলনটিকে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ও নীতিগত প্রশ্নের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, যা প্রো-অ্যাকটিভ বৈশিষ্ট্যও বহন করে। ফলে, সিঙ্গুর আন্দোলন একদিকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে উঠলেও, এটি দীর্ঘমেয়াদে শিল্প ও কৃষি নীতির নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রবল উপস্থিতি রয়েছে। গবেষণায় আমি দেখতে পেয়েছি যে, জমি অধিগ্রহণের সরকারি ঘোষণার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিরোধের ফলে এই আন্দোলন শুরু হয়

এবং পুলিশের গুলি চালনার ঘটনাটি একে আরও তীব্র করে তোলে। নন্দীগ্রামের বিক্ষোভ শুধুমাত্র জমির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের বড় একটি উপাদানে পরিণত হয়। গবেষণার বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শাসনের ধারা বদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং পরবর্তীকালে সরকার পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। তাই একদিকে এটি একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের প্রকৃতি বহন করলেও, দীর্ঘমেয়াদে এটি কাঠামোগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করেছে, যা প্রো-অ্যাকটিভ বৈশিষ্ট্যের দিকেও ইঙ্গিত করে।

এদুয়ার্দ শিলস-এর (এডওয়ার্ড শিলস, ১৯৭১) 'একটিভ পাবলিক পার্টিসিপেশন' ধারণা অনুযায়ী, এই ধরনের আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজনৈতিক পরিবেশকে পুনর্গঠিত করতে সহায়তা করে, যা নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা গেছে। অমর্ত্য সেনের “Development as Freedom” তত্ত্ব অনুসারে প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তা মানুষের ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত হয়। কিন্তু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির চেয়ে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এর ফলে ছাত্র আন্দোলন একটি বিকল্প উন্নয়ন মডেলের প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলিকে আমি মূলত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছি, যেখানে এসএফআই (SFI), আইসা (AISA) এবং অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর এই আন্দোলন শুরু হয় এবং এটি ধীরে ধীরে এক বৃহৎ ছাত্র ও যুব আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মধ্যে আমি মার্ক গ্রানোভেটার-এর 'স্ট্রেংথ অব উইক টাইস' ধারনার প্রভাব লক্ষ্য করেছি, যেখানে দুর্বল সামাজিক বন্ধনগুলির মাধ্যমে আন্দোলনের সম্প্রসারণ ঘটেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, চাকরিপ্রার্থী এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে সংযোগ গড়ে ওঠায় আন্দোলনের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনমত প্রভাবিত হয়েছে। সরকার প্রথমদিকে আন্দোলন উপেক্ষা করলেও, আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে প্রশাসন কিছু নিয়োগ বাতিল করতে বাধ্য হয়। ফলে, এই আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রভাব সুস্পষ্ট। এছাড়া, নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমি লক্ষ্য করেছি যে, এটি কেবলমাত্র ছাত্র রাজনীতির পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তরুণ চাকরিপ্রার্থীদের ক্রোধ ও বঞ্চনার অনুভূতিকে কেন্দ্র

করে একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। গবেষণায় আমি বিশ্লেষণ করেছি যে ফ্রেম থিওরি অনুযায়ী, এই আন্দোলনটি একটি 'ইনজাস্টিস ফ্রেম' তৈরি করেছিল, যেখানে দুর্নীতির শিকার ব্যক্তিরা নিজেদের অবস্থানকে একটি যৌক্তিক প্রতিবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছিল। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ছাত্র আন্দোলনের কাঠামো থেকে সরে এসে এক নতুন সামাজিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। ঐতিহ্যগতভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলন রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রছায়ায় পরিচালিত হয়েছে। ১৯৬০-৭০-এর দশকের নকশাল আন্দোলন থেকে শুরু করে ২০০০-এর দশকের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা প্রধানত রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনে এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের শক্তিতেই আন্দোলন সংগঠিত করছে, যা একটি স্বতন্ত্র নাগরিক আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করে।

অটোনোমাস মুভমেন্ট থিওরি অনুসারে, যখন প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো জনগণের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে, তখন বিকল্প সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, এটি কেবল ক্ষমতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংঘটিত হয়নি, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার দাবি তুলছে। নিউ সোশ্যাল মুভমেন্ট তত্ত্ব অনুসারে, আধুনিক আন্দোলন শুধুমাত্র সরকার পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত হয় না, বরং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়। নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অতীতে ছাত্র আন্দোলন মূলত রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে সংগঠিত হতো, কিন্তু এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া নিজেই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হয়ে উঠেছে। ম্যানুয়েল কাস্টেলসের নেটওয়ার্কড মুভমেন্ট তত্ত্ব অনুসারে, আধুনিক সামাজিক আন্দোলন কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে না, বরং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারের ফলে আন্দোলনের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আন্দোলনকারীরা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে, জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে এবং আন্দোলনের বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে দিচ্ছে। কাস্টেলসের তত্ত্ব অনুযায়ী, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সামাজিক

প্রতিবাদের নতুন রূপ তৈরি করেছে, যেখানে আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব বিকেন্দ্রীভূত থাকে এবং আন্দোলনকারীরা সমানভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ পায়। এই আন্দোলনের নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই, বরং এটি একধরনের "ক্রাউডসোর্সড মুভমেন্ট", যেখানে আন্দোলনকারীরা সমানভাবে মতামত প্রকাশ করছে এবং নতুন কৌশল নির্ধারণ করছে। এর ফলে আন্দোলনকে দমন করা আরও কঠিন হয়ে উঠছে, কারণ এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে না, বরং একটি বিকেন্দ্রীভূত কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনগুলি সাধারণত ঘটনার পরেই সংঘটিত হয় এবং তাৎক্ষণিক দাবিগুলির উপর জোর দেয়, যেমন নিয়োগ দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন বা সন্দেশখালির ঘটনায় ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতিবাদ। অন্যদিকে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মতো কিছু আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে এগিয়েছে, যেখানে ছাত্র সংগঠনগুলি কৌশলগতভাবে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করেছে এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

সন্দেশখালি ঘটনার বিশ্লেষণে আমি দেখেছি যে, এই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়াশীল ও কৌশলগত আন্দোলনের মিশ্রণ ঘটেছে। সন্দেশখালিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠলে ছাত্র সংগঠনগুলি বিভিন্ন অবস্থান নেয়। বিজেপি-ঘনিষ্ঠ RSS-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি (ABVP) এই আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়, যেখানে এসএফআই ও অন্যান্য বাম সংগঠন মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকটি তুলে ধরে আন্দোলন চালায়। গবেষণায় আমি লক্ষ্য করেছি যে, এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'জুডিথ বাটলার'-এর 'পারফরম্যাটিভিটি' ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতিবাদী কার্যক্রম এবং জনসমক্ষে অবস্থান গ্রহণ তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে দৃঢ় করেছে। মিডিয়ার উপস্থিতি ও সামাজিক মাধ্যমে আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা প্রতীকী প্রতিবাদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, যা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। সন্দেশখালি আন্দোলনের ক্ষেত্রে, আমি "রিসোর্স মোবিলাইজেশন থিয়োরি"-এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছি যে ছাত্র সংগঠনগুলি কীভাবে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে আন্দোলনকে টিকিয়ে রেখেছে—এতে স্থানীয় জনগণ, মিডিয়া, রাজনৈতিক মদত এবং সামাজিক সংযোগ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণায় আমি পেয়েছি, জমি দখল, আর্থিক দুর্নীতি এবং নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততা এটিকে আরও বেগবান

করে। তবে এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ঘটনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে রয়ে যায়নি, বরং রাজনৈতিক মেরুকরণের একটি বৃহত্তর অংশ হয়ে উঠেছে। গবেষণার সূত্রে আমি দেখতে পেয়েছি যে, এই আন্দোলন বিশেষ কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষে-বিপক্ষে বিভাজন তৈরি করেছে এবং আন্দোলনটির প্রভাব স্থানীয় পর্যায়ের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সন্দেশখালির আন্দোলন মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হলেও, এটি দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক মেরুকরণকে আরও তীব্র করেছে এবং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে নকশাল আন্দোলন ও জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন এক অনস্বীকার্য শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনে নতুনত্ব ছিল শহরের ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রত্যক্ষ গ্রামীণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। এটি শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র কেন্দ্রীক আন্দোলনের চিত্র ভেঙে দিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের অবস্থান প্রকাশ করেছে। গ্রামশির "Counter-Hegemony" ধারণার আলোকে দেখা যায়, ক্ষমতাসীন শ্রেণির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ছাত্র আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই ক্ষেত্রে AISA, DSF, FAS, IC-এর মতো সংগঠন সরাসরি সরকারের শিল্প নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। SFI-এর মতো বাম সংগঠনও দ্বিধার মধ্যে পরে যায়, যা ছাত্র রাজনীতিতে আদর্শিক সংকট তৈরি করে। এটি বোঝায় যে, ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র প্রতিবাদের ভাষা নয়, বরং রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

অর্থাৎ গবেষণার প্রথম উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমি দেখতে পেয়েছি যে, পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে পৃষ্ঠপোষকতার ছাপ, প্রতিক্রিয়াশীল ও দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত পরিবর্তনকামী আন্দোলনগুলির একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রয়েছে। গবেষণার আলোকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আন্দোলনগুলোর প্রাথমিক পর্যায় প্রতিক্রিয়াশীল হলেও, দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নীতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের গত দুই দশকের ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, পৃষ্ঠপোষকতা, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রো-অ্যাকটিভ বৈশিষ্ট্য একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, যা আন্দোলনের গতিশীলতা ও প্রভাব বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে এবং একটি বিকেন্দ্রীভূত কাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এই পয়েন্টে আমি উপলব্ধি করেছি যে, ছাত্র সংগঠনগুলির আদর্শিক

অবস্থান, কৌশলগত পদ্ধতি এবং আন্দোলনের প্রসার নির্ধারণে রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যতে, এই বৈশিষ্ট্যগুলির আরও গভীর বিশ্লেষণ ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমি গবেষণায় দেখতে পেয়েছি যে, ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য একমুখী নয়, বরং তা আন্দোলনের ধরন, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ব্যক্তিগত প্রেরণার ওপর নির্ভর করে বহুমাত্রিক রূপ ধারণ করেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, নিয়োগ দুর্নীতি এবং সন্দেশখালির মতো আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য এবং তাদের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে, যা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্লেষণে আমি পিয়ের বুর্দিয়ু-এর প্রতীকী সহিংসতা ('সিম্বোলিক ভায়োলেন্স'), আন্তোনিও গ্রামশির বৌদ্ধিক নেতৃত্বের ('অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালস') ধারণা এবং মার্ক গ্রানোভেটারের দুর্বল সম্পর্কের শক্তি ('স্ট্রেংথ অব উইক টাইস') তত্ত্বের মাধ্যমে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছি।

সিঙ্গুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি যে, ছাত্রদের ভূমিকা দ্বিমুখী একদিকে শাসক দলের রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় সদস্যরা দলীয় অবস্থানের সাথে তাল মিলিয়ে আন্দোলনে যুক্ত হয়, অন্যদিকে সমাজকর্মী, বামপন্থী ও মধ্যপন্থী স্বতন্ত্র ছাত্র সংগঠনগুলোর অনেক সদস্য কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর ভূমি অধিকারের পক্ষে ও উন্নয়ন মডেল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এখানে গ্রামশির বৌদ্ধিক নেতৃত্বের ধারণার ('অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালস') বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। ছাত্ররা কেবলমাত্র আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিল না, বরং কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার কাজও করেছিল। গবেষণার সূত্রে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্ররা মূলত প্রচার, সংগঠিত প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভূমিকা রেখেছিল। তবে দীর্ঘমেয়াদে এই আন্দোলন শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ, শিল্পায়ন এবং কৃষকদের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে, যা ভবিষ্যতের আন্দোলনগুলোর পথ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পেয়েছি যে, ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা আরও সংঘাতপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে ওঠে।

বিশেষ করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলির সদস্যরা সরাসরি প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয়, যা আন্দোলনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তোলে। গবেষণায় পাওয়া সাক্ষাৎকার ও তথ্য-উপাত্ত থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ছাত্রদের একটি অংশ নিছক দলীয় আনুগত্য থেকে আন্দোলনে যুক্ত হলেও, অন্য একটি অংশ আন্দোলনের সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছিল। বুর্দিয়ুর প্রতীকী সহিংসতার ধারণা অনুসারে, এই আন্দোলনে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল এবং ছাত্রদের সক্রিয় প্রতিরোধ এই প্রতীকী সহিংসতার বিরুদ্ধেই গড়ে উঠেছিল। গবেষণায় আমি পেয়েছি যে, ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, পুলিশের দমননীতি এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিডনি টারোর "Power in Movement" ধারণা অনুসারে ছাত্র আন্দোলন নতুন নতুন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে মিছিল, পথনাটক, পোস্টার ক্যাম্পেইন, অনশন এবং ডিজিটাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি দেখিয়েছে যে, ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও ডিজিটাল মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বড় পরিবর্তন এনেছিল, যেখানে ছাত্র রাজনীতি ভূমিকা রেখেছিল সরকার পরিবর্তনের বৃহত্তর প্রক্রিয়ায়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও বাস্তব বিশ্লেষণের মাধ্যমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। প্রথমত, ফিলিপ অল্টব্যাকের "Student Politics in Comparative Perspective" অনুসারে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, যেখানে ছাত্র সংগঠনগুলো শুধু সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেনি, বরং রাজনৈতিক চেতনার বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অবশেষে, গ্রামশির "Hegemony and Passive Revolution" ধারণা অনুযায়ী, রাজনৈতিক শক্তি পরিবর্তন শুধুমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটে না, বরং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধও এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ফলে বামফ্রন্ট সরকার তাদের ঐতিহ্যগত কৃষক-শ্রমিক ভিত্তি হারায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই শূন্যস্থান পূরণ করে। এটি দেখায় যে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র আন্দোলন নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক পরিবর্তনের অনুঘটকও হতে পারে। এই মূল্যায়নে স্পষ্ট যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম

আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা একাধিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি কেবলমাত্র আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পেয়েছি যে, অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত ও সমষ্টি উভয় স্বার্থের মিশ্রণ। এই আন্দোলনে যুক্ত ছাত্রদের বড় একটি অংশ সরাসরি চাকরিপ্রার্থী, যাদের উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ন্যায়সঙ্গত চাকরির দাবি আদায় করা। তবে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততার ফলে আন্দোলনটির গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং তা ক্রমে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপ নেয়। সন্দেশখালির আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পেয়েছি যে, ছাত্রদের ভূমিকা এখানে মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ছাত্র সংগঠনগুলোর সংহতি এবং রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়ার কারণে আন্দোলনটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। গবেষণায় আমি পেয়েছি যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রদের মধ্যে একদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিল, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার কৌশলগত উদ্দেশ্যও বিদ্যমান ছিল। এখানে বুর্দিয়ুর প্রতীকী সহিংসতা ধারণা পুনরায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিরোধ স্পষ্টতই এই কাঠামোগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল। সন্দেশখালির আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে রাজনৈতিক মেরুকরণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া বেশ তীব্র হয়েছিল। তবে দীর্ঘমেয়াদে আন্দোলনটি স্থানীয় রাজনীতিতে কতটা পরিবর্তন আনতে পেরেছে, তা বিশ্লেষণের বিষয়।

সন্দেশখালির আন্দোলনে নতুন সামাজিক আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার অংশ ছিল না, বরং সমাজের লিঙ্গ, নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ইস্যুকে সামনে এনেছিল। মেলুচ্চির মতে, নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো মূলত সাংস্কৃতিক ও পরিচয়গত রাজনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সন্দেশখালির আন্দোলনে স্থানীয় মহিলাদের ভূমিকা, ছাত্রদের সংহতি এবং সামগ্রিকভাবে একটি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির প্রচেষ্টা NSM-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। তবে এটি এককভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছিল না, বরং রাজনৈতিক মেরুকরণের মধ্যে দিয়েও পরিচালিত হয়েছিল। সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা এই ধারণাকে সমর্থন করে।

আন্দোলনে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সরাসরি দলীয় পতাকা ব্যবহার করতে পারেনি, যা প্রমাণ করে যে এটি কেবল দলীয় রাজনীতির লড়াই ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের সংগঠিত প্রচেষ্টা, বিক্ষোভ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং মিডিয়ার সক্রিয় ভূমিকা এটিকে কার্যকর সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলেছে। সাংবাদিকতা এবং মিডিয়ার ভূমিকা এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেছে। মিডিয়ার ভূমিকা শুধুমাত্র তথ্য প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণেও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। বিকল্প সাংবাদিকতা ও সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থান সন্দেশখালির ঘটনাকে আরও বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে দিয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। এছাড়া, আন্দোলনের প্রতীকী মাত্রা নিয়েও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা প্রয়োজন। আন্দোলনে পতাকা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত একদিকে দলীয় বিভাজনকে প্রতিহত করেছে, কিন্তু অন্যদিকে আন্দোলনের সাংগঠনিক শক্তিকে কিছুটা দুর্বল করেছে। জুডিথ বাটলারের 'পারফরম্যাটিভিটি তত্ত্ব' অনুসারে, প্রতীক ও চিহ্নহীন আন্দোলন কীভাবে রাজনৈতিক ভাষ্যকে পরিবর্তন করতে পারে, তা এই প্রসঙ্গে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ছাত্র সংগঠনগুলোর নতুন ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাধারণত ছাত্র আন্দোলন শহরকেন্দ্রিক হয়, কিন্তু সন্দেশখালি আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনগুলো সরাসরি গ্রামীণ অঞ্চলে গিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে। এটি ভারতের ছাত্র রাজনীতির জন্য একটি নতুন প্রবণতা নির্দেশ করে এবং মার্ক গ্রানোভেটারের 'স্ট্রেংথ অব উইক টাইস' তত্ত্বের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রানোভেটার দেখিয়েছেন যে, দুর্বল সামাজিক সংযোগও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে, যা এখানে প্রযোজ্য। সন্দেশখালি আন্দোলনের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং এটি সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠন এবং ক্ষমতার নতুন বণ্টনের দাবি করছে। ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, বিশেষ করে কীভাবে এটি অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে এটি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পথে এগিয়ে যেতে পারে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে এই আন্দোলনকে বৃহত্তর নাগরিক প্রতিরোধ ও সামাজিক ন্যায়ের দাবির অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে ভারতীয় গণতন্ত্র ও সামাজিক কাঠামোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

গবেষণার ভিত্তিতে আমি দেখতে পেয়েছি যে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়নি, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, ব্যক্তিগত স্বার্থ,

এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত ছিল। কিছু আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, আবার কিছু আন্দোলন শুধুমাত্র সাময়িক প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে ছাত্র রাজনীতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দলীয় আনুগত্য ও স্বতন্ত্র সামাজিক দাবির সমন্বয় আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ

গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল বহুমুখী এবং আন্দোলনের প্রকৃতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। কিছু ক্ষেত্রে সরকার সরাসরি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের আশ্বাস দিয়ে আন্দোলনের তীব্রতা প্রশমনের চেষ্টা করেছে। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, সরকার আন্দোলনের প্রতি প্রাথমিকভাবে উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করলেও, আন্দোলন জনসমর্থন অর্জন করলে বা বৃহত্তর রাজনৈতিক চাপে পড়লে প্রতিক্রিয়ার ধরন পরিবর্তন করেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনে সরকারের প্রতিক্রিয়া মূলত প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমদিকে সরকার শিল্পনীতির প্রয়োজনীয়তার যুক্তি দেখিয়ে আন্দোলনকে উপেক্ষা করে এবং প্রশাসনিক দমন-পীড়ন চালায়। নন্দীগ্রামের ঘটনায় পুলিশের গুলি চালনার মতো চরম পদক্ষেপ সরকারের দমনমূলক অবস্থানকে স্পষ্ট করে। এখানে মিশেল ফুকোর জৈব-ক্ষমতা ধারণা গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে রাষ্ট্র তার শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তবে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায়, যা সরকারের প্রতিক্রিয়ার রূপান্তরের দিকে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপে পড়ে সরকার তার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সরকার ও প্রশাসন একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে, ফলে ছাত্রদের রাজপথে নেমে আসতে হয়েছে। এটি দেখিয়েছে যে গণতন্ত্র ব্যর্থ হলে ছাত্র আন্দোলন একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ছিল সীমিত এবং আন্দোলনের চাপ থাকাকালীনই কেবল এসব প্রতিশ্রুতি কার্যকর রাখা হয়।

নিয়োগ দুর্নীতি আন্দোলনে সরকারের প্রতিক্রিয়া দ্বৈত প্রকৃতির ছিল। প্রথমদিকে সরকার এই আন্দোলনকে গুরুত্ব দেয়নি এবং ছাত্রদের দাবিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। এখানে আন্তোনিও গ্রামশির হেজিমনি তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক, যেখানে দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দল তার আধিপত্য বজায় রাখতে আন্দোলনকারীদের দাবিকে অবৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তবে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করলে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সমর্থন পেলে সরকার কৌশল পরিবর্তন করে। তদন্ত কমিটি গঠন, কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির গ্রেফতার এবং নিয়োগ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মিশেল ফুকোর "Discipline and Punish" তত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, রাষ্ট্র কেবল বাহ্যিক দমন-পীড়ন চালায় না, বরং জনগণের আচরণও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ঘটনায় পুলিশের দমননীতি, ছাত্রদের গ্রেপ্তার ও নজরদারি রাষ্ট্রশক্তির এই দিকটিকেই তুলে ধরে। এর ফলে ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র প্রতিবাদের মাধ্যম নয়, বরং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। হেবরমাসের "Deliberative Democracy" তত্ত্ব অনুসারে গণতন্ত্র তখনই কার্যকর হয়, যখন জনগণের মতামত নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত হয়। এই আন্দোলনের প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়া দ্বিমুখী। একদিকে সরকার চাকরি দুর্নীতির বিষয়ে কিছু তদন্ত পরিচালনা করছে, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের দমন করতে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিচ্ছে। লুই আলথুসারের "আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারাটাস" তত্ত্ব অনুসারে, রাষ্ট্র কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না, বরং শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে জনগণের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখাচ্ছে যে, প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো ব্যর্থ হচ্ছে, কারণ এই আন্দোলন প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে সংগঠিত হচ্ছে। আন্তোনিও গ্রামসির হেজিমনি তত্ত্ব অনুসারে, ক্ষমতাসীন দল বা রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত আধিপত্য বজায় রাখার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে। কিন্তু এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জনগণের আস্থা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নষ্ট হচ্ছে, যা রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে। এই আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত নয়, বরং ছাত্র এবং চাকরি প্রার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে। প্রথমদিকে প্রশাসন এই আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আন্দোলন তীব্রতর হলে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করা হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপ, আন্দোলনকারীদের ওপর বলপ্রয়োগ, গ্রেপ্তার—এসবের মাধ্যমে সরকার আন্দোলন দমন করতে চেয়েছে। তবে

আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে আদালতের মাধ্যমে কিছু আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হলেও রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্র দ্বিচারিতা দেখিয়েছে—একদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের দমনের চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এডওয়ার্ড শিলসের সিভিক এনগেজমেন্ট তত্ত্ব অনুসারে, গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে। এই আন্দোলন সেই ধারনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যেখানে নাগরিকরা তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছে এবং প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে গিয়েও নিজেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।

সন্দেশখালির আন্দোলনে সরকারের প্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে আলাদা ছিল। এখানে সরকার প্রাথমিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে এবং অভিযোগগুলিকে অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দেয়। পরে জনমতের চাপ বাড়লে এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠলে সরকার কিছু প্রতীকী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন- অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং তদন্ত কমিটি গঠন। এখানে নতুন সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, সন্দেশখালির আন্দোলন স্থানীয় বাসিন্দা ও ছাত্র সংগঠনগুলোর সম্মিলিত প্রতিরোধ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। সরকার প্রথমে এটিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করলেও, জনসমর্থন ও আন্দোলনের দৃঢ়তায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারের প্রতিক্রিয়া সাধারণত তিনটি ধাপে পরিচালিত হয়েছে—প্রথমে আন্দোলনকে উপেক্ষা করা, পরে দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা বা আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলে চিহ্নিত করা এবং শেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের মুখে কিছু দাবি আংশিকভাবে মেনে নেওয়া বা প্রতীকী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সরকারের এই প্রতিক্রিয়াগুলি আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিছু আন্দোলনের ক্ষেত্রে দমনমূলক নীতি আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে, আবার কিছু আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস করেছে। তবে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য

গবেষণার ভিত্তিতে আমি দেখেছি যে ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে জটিলভাবে সংযুক্ত। মেলুচির নতুন সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব (আলবার্তো মেলুচি, ১৯৮৯) অনুসারে, আধুনিক আন্দোলন শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক দাবি আদায়ের জন্য সংগঠিত হয় না বরং এটি দীর্ঘমেয়াদে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এগুলো শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক চাপ তৈরি করার জন্য সংগঠিত হয়নি, বরং দীর্ঘমেয়াদে ছাত্রসমাজ ও বৃহত্তর রাজনৈতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা করেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি যে, এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল জমি রক্ষা করা এবং কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ক্লস অফের রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামো তত্ত্ব (সিডনি ট্যারো, ১৯৯৮) অনুসারে, আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করার দক্ষতার উপর। এই আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শাসক দলের নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে ছাত্রসমাজ এক বৃহত্তর আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিল। তবে দীর্ঘমেয়াদী বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এটি শুধুমাত্র কৃষকদের স্বার্থের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বদলাতে এটি বড় ভূমিকা রেখেছে। ছাত্র সংগঠনগুলো এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও ভবিষ্যৎ সংগঠনের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে, যা পরবর্তী আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে।

নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে, এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অবসান। তবে পিয়েরে বুর্দিয়ুর সাংস্কৃতিক মূলধন তত্ত্ব (পিয়ের বুর্দিয়ু, ১৯৮৬) অনুসারে, শিক্ষার মধ্যে সামাজিক শ্রেণি ও ক্ষমতার সম্পর্ক নিহিত থাকে এবং ছাত্রদের সংগ্রাম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি সাংস্কৃতিক মূলধনের প্রশ্নের সঙ্গেও জড়িত। এই আন্দোলনটি শুধুমাত্র চাকরির দাবির জন্য সংগঠিত হয়নি, বরং শিক্ষার প্রকৃতি ও তার প্রাপ্যতা নিয়ে এক বৃহত্তর প্রশ্ন তুলেছে। ফলে এটি প্রশাসনকে স্বল্পমেয়াদে কিছু সংস্কার করতে বাধ্য করলেও, শিক্ষাক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন কতটা সম্ভব হবে, তা এখনো প্রশ্নসাপেক্ষ। গবেষণায় আমি পেয়েছি যে, আন্দোলনের তাৎক্ষণিক প্রভাব ছিল ব্যাপক ছাত্র অসন্তোষ, রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি, এবং প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার রূপে

প্রতিফলিত হওয়া। গ্রানোভেটারের দুর্বল সম্পর্কের শক্তি ‘স্ট্রেংথ অব উইক টাইস’ তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এই আন্দোলনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, চাকরিপ্রার্থী ও নাগরিক সমাজের মধ্যে দুর্বল কিন্তু কার্যকর সংযোগ তৈরি হয়েছিল, যা আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। তবে দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ে এটি শিক্ষা ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন আনতে কতটা সক্ষম হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

সন্দেশখালির আন্দোলন পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি যে, এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল অপরাধ ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ নিশ্চিত করা। কিন্তু মিশেল ফুকোর শক্তি ও প্রতিরোধ তত্ত্ব (ফুকো, ১৯৮০) অনুসারে, রাষ্ট্রশক্তি সবসময় আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে এবং ছাত্র আন্দোলন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি রূপ। সন্দেশখালির আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া এবং ন্যায়বিচারের দাবি তোলা। তবে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এটি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না; বরং এটি বৃহত্তর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং শাসনব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। সন্দেশখালি আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, এটি কেবল রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং একটি গভীর সামাজিক প্রতিরোধ, যেখানে ক্ষমতার কাঠামো, নাগরিক সক্রিয়তা এবং শ্রেণি চেতনার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রালফ ডারেনডর্ফের সংঘাত তত্ত্ব, আন্তোনিও গ্রামশির হেজেমনি তত্ত্ব এবং চার্লস টিলির সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। রালফ ডারেনডর্ফের (১৯৫৯) মতে, সমাজে সংঘাত অনিবার্য এবং এটি সামাজিক পরিবর্তনের চালিকা শক্তি। সন্দেশখালি আন্দোলনও একই বাস্তবতাকে তুলে ধরে, যেখানে শাসকগোষ্ঠীর দমনমূলক শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এটি কেবল নির্যাতিত জনগণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এটি ক্ষমতার অসমতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলস্বরূপ সংগঠিত একটি আন্দোলন। জনগণ এখানে কেবল নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতিবাদ করেননি, বরং দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, যা সংঘাত তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই গবেষণার মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ছাত্র আন্দোলনের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য প্রায়শই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকেও অগ্রসর হয়। তবে রাজনৈতিক

প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ছাত্র আন্দোলনের এই দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব অনেক সময়ই ব্যাহত হয় এবং কিছু আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থের অংশ হয়ে ওঠে। ফলে, নতুন সামাজিক আন্দোলন তত্ত্বের আলোকে বলা যায় যে, এই আন্দোলনগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত হয়নি, বরং ছাত্র সমাজের সচেতনতা, সংগঠনের দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য ভিত্তি গঠনের দিকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, আন্দোলনের স্থানিকতা এবং গ্রামীণ প্রতিরোধের চরিত্র বোঝার জন্য জেমস স্কটের 'এভরিডে ফর্মস অব পিজেন্ট রেজিস্ট্যান্স' তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। সন্দেশখালি আন্দোলন নগর-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বরং এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। স্কট দেখিয়েছেন যে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কেবলমাত্র সরাসরি বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলে না, বরং প্রতিদিনের ক্ষুদ্র প্রতিরোধের মাধ্যমেও শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে। সন্দেশখালি আন্দোলন এ ধরনের প্রতিরোধেরই একটি বৃহৎ রূপ, যেখানে স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছেন।

আন্তোনিও গ্রামশির (১৯৭১) হেজেমনি তত্ত্ব অনুসারে, শাসকগোষ্ঠী শুধু রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিঁকে থাকে না, বরং জনগণের মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক অনুমোদনও আদায় করে। সন্দেশখালি আন্দোলন এই হেজেমনি ভাঙার এক সুস্পষ্ট প্রয়াস। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তিগুলো তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল, কিন্তু এই আন্দোলন সেই আধিপত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিশেষতঃ, নারী ও কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং জনগণ সচেতনভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। চার্লস টিলির (২০০৪) সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব অনুসারে, আন্দোলন শুধু বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ নয়, বরং এটি সংগঠিত কাঠামোর মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনার একটি উপায়।

ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা

গবেষণার ভিত্তিতে আমি দেখেছি যে, পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের গতিপথ একরৈখিক নয়; বরং এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। আলবার্তো মেলুচির "নতুন সামাজিক আন্দোলন" তত্ত্ব অনুসারে, আধুনিক সমাজে আন্দোলন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সংগঠিত হয় না, বরং এটি পরিচিতি, সংস্কৃতি ও প্রতীকী প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমার

গবেষণায়ও এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, বিশেষতঃ যখন দেখি যে, কিছু আন্দোলন শুধুমাত্র নীতিগত দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতির অংশ হয়ে উঠেছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলন বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে, এগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা ক্লস অফ-এর "রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামো" ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, সামাজিক আন্দোলন তখনই সফল হয়, যখন রাজনৈতিক পরিসর বা সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন ঘটে। আমার গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই দুই আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ তৈরি করেছে। তবে পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক শক্তি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা একই রকম থাকেনি, বরং এটি অনেক ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়মের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও আমি মেলুচির ধারণাকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখেছি। মেলুচি সামাজিক আন্দোলনকে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং পরিচিতির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেন। নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন সরাসরি ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম না করলেও, এটি শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবিকে সামনে এনেছে। তবে গবেষণার মাধ্যমে আমি লক্ষ্য করেছি যে, এই আন্দোলন কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পারলেও, রাজনৈতিক দলগুলোর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে এর ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সন্দেশখালির আন্দোলন বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে, এখানে আন্দোলন শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ছিল না, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন তুলেছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা ছিল সমাজের প্রান্তিক অংশের স্বর তুলে ধরা, যা ক্লস অফ-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, আন্দোলনের প্রভাবকে বিস্তৃত করতে পারে যদি তা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সংহত হয়। তবে আমার গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, সন্দেশখালির আন্দোলন শুরুতে শক্তিশালী গণসমর্থন পেলেও, পরবর্তী সময়ে দলীয় রাজনীতির কৌশলগত ব্যবহারের কারণে এর গতিপথ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। ভবিষ্যতে ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করবে তার সাংগঠনিক কাঠামো, জনসমর্থনের স্থায়িত্ব এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রতি তাদের অবস্থানের ওপর। ক্লস অফ-এর মতে, রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামোর পরিবর্তন আন্দোলনের সাফল্য নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। আমার গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়

যে, যদি ছাত্র আন্দোলন সাংগঠনিকভাবে দৃঢ় হয় এবং শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতির অংশ না হয়ে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। অন্যথায়, ছাত্র আন্দোলন শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে থেকে যাবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম হয়ে উঠবে। গবেষণার ভিত্তিতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ছাত্র আন্দোলনের শক্তি ও প্রভাব নির্ভর করবে তার লক্ষ্য ও কৌশলের উপর, যা ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাম্প্রতিকতম ইতিহাস ও পরবর্তীকালীন গতিপথ

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ভোট পরবর্তী হিংসা এক ধরণের রাজনীতিকরণের হিংসাত্মক দিক তুলে ধরছে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষ, দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক হিংসার ঘটনা ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর হামলা, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া এবং বহু মানুষকে বাস্তুচ্যুত করার ঘটনাগুলি রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে নতুন করে স্পষ্ট করে তোলে। এই হিংসার অভিঘাত কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; শিক্ষাঙ্গন, ছাত্রসমাজ এবং একাডেমিক পরিবেশও এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের বাইরে থাকেনি। ভোট পরবর্তী হিংসার ফলে রাজ্যের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নির্বাচনের পর কিছু এলাকায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে স্কুল ও কলেজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক শিক্ষার্থী স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে যায়। বিশেষতঃ গ্রামীণ ও শহরতলির অঞ্চলে, যেখানে রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেখানকার শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন শিক্ষালাভ বাধাগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যেও বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোট-পরবর্তী সময়কালে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষ এবং একে অপরকে দমন করার প্রবণতা ক্যাম্পাসের পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। একদিকে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংগঠনগুলির প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা, অন্যদিকে বিরোধী

ছাত্র সংগঠনগুলির ওপর আক্রমণ, এই পরিস্থিতি শিক্ষাঙ্গণের গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত করে ফেলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও পক্ষপাতমূলক আচরণও এই সময়ে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ভোট পরবর্তী হিংসার সময় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলির সরাসরি হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে, আবার কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হন। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষতা ও একাডেমিক স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়।

এবং এর ফলশ্রুতিতে হিংসাত্বক পরিস্থিতির এক অত্যন্ত খারাপ দিক ফুঁটে উঠলো সম্প্রতি সাম্প্রতিককালে ২০২৪ সালে ‘আরজিকর কাণ্ডে’। অর্থাৎ উক্ত হাসপাতালের একজন ডাক্তারি ছাত্রীর ওপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসলো হাসপাতালে। যা সমস্ত সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে এবং যেখানে ছাত্ররা আন্দোলন করেছে, আন্দোলন করেছে ডাক্তারি ছাত্ররাই যারা একদিকে ডাক্তার এবং অন্যদিকে ছাত্র। এই আন্দোলনের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কলেজের হোস্টেল এবং হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা। ছাত্ররা অভিযোগ করেছিলেন যে, হোস্টেলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, খাবারের গুণগত মান খারাপ এবং নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। প্রাথমিকভাবে কলেজ প্রশাসন এসব অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়নি, বরং আন্দোলনকারীদের প্রতি কঠোর মনোভাব দেখায়। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন ছাত্রদের একাংশ দাবি করে যে, কলেজ পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ছে এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এই অভিযোগের সঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসার প্রেক্ষাপটও জড়িয়ে যায়, কারণ কিছু ছাত্র মনে করেছিলেন যে, বিরোধী মতাদর্শের শিক্ষার্থীদের দমন করা হচ্ছে এবং কলেজ কতৃপক্ষ রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বে কাজ করছে।

এই আন্দোলন প্রথমদিকে কলেজ চত্বরে ধর্না ও প্রতিবাদের মাধ্যমে শুরু হলেও, ধীরে ধীরে এটি বৃহত্তর রূপ নেয়। কলেজের জুনিয়র ডাক্তার এবং ইন্টার্নরাও আন্দোলনে যোগ দেন, যা চিকিৎসা পরিষেবাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আন্দোলনকারীরা দীর্ঘসময় কলেজ চত্বরে অবস্থান করেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানান। প্রশাসন প্রথমদিকে এই দাবিগুলি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আলবার্তো মেলুচি, ক্লাউস অফ, স্মেলসার ইনাদের আন্দোলনের তত্ত্ব পড়লে দেখি যে, তাঁরা একপ্রকার নতুন আন্দোলনের দিক দেখাচ্ছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরজিকরের মত আন্দোলনে নির্দিষ্ট একপ্রকার ভূমিকা নিচ্ছে,

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায়। এই আন্দোলনে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, এই আন্দোলনে ছাত্ররাই যুক্ত কিন্তু সেটা রাজনৈতিক দলাদলির বাইরে গিয়ে। অর্থাৎ আন্দোলন তীব্র গতিতে চললেও ব্যানারটা খুব পরিষ্কার নয় এটা বলার চেষ্টা করছে সরকার পক্ষ এবং এর প্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীরা বলার চেষ্টা করছে যে, আমাদের আন্দোলন শুধুমাত্র পার্টিগত আন্দোলন নয়। কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের দাবী ও আন্দোলন সরকারের কিছু ত্রুটি, বিপজ্জনক জায়গাগুলি নিয়ে কথা বলা। এবং এগুলি নিয়ে পুরো সমাজকে সতর্ক বার্তা দেওয়া, পুরো সমাজকে যুক্ত করে 'রাত দখলের ডাক দেওয়া'। এক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে আন্দোলনকে বিশালভাবে জনসমাজে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এক বিশাল রেসপন্স পাওয়া এক ধরনের নতুন পন্থা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এই রাত দখলের কাণ্ডারি মহিলা নেত্রীকে এবিপি আনন্দ সেরা বাঙালি হিসেবে পুরস্কৃত করে ২০২৫-এ, যা এক গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত করে।

আন্দোলনের তত্ত্বে এক ধরণের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন সাধারণ নাগরিকরা রাজনৈতিক আন্দোলন করছেন কিন্তু তারা রাজনৈতিক আন্দোলনটাকে রাজনৈতিক দলাদলির বাইরে রাখার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন এদের মধ্যে পার্টির যে ছায়া থেকে থাকে তা থেকে তারা দূরে সরে আছে। শাখা রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ও রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলনে একটা ভিন্ন চেহারা তৈরি করে, এই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি আগের চ্যাপ্টারগুলিতে। এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এরকমও আন্দোলন তৈরি হচ্ছে যেখানে রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াই রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলন। এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে–

- প্রথমত, এক মহিলা চিকিৎসকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরপরই হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা ক্ষোভে ফেটে পরেন। ঘটনাটা প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে দাবি করা হলেও, ময়নাতদন্তে ধর্ষণ ও হত্যার প্রমাণ মেলায় বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়। এই পর্যায়ে আন্দোলন মূলত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ও হোস্টেলের ডাক্তাররা একত্রিত হয়ে আলোচনায় বসেন।

- দ্বিতীয়ত, হাসপাতালের প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে জুনিয়র ডাক্তাররা দ্রুত সংগঠিত হতে থাকেন। প্রথমে তাঁরা হাসপাতালের প্রবেশ পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ কোনো দৃঢ় প্রতিক্রিয়া না আসায়, তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন।
- তৃতীয়ত, আন্দোলনকে সংগঠিত ও দৃঢ় করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনকারীরা দ্রুত WhatsApp ও Facebook-এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করেন। তাঁরা একত্রিত হয়ে হাসপাতাল চত্বরে অবস্থান করে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করেন এবং সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।
- চতুর্থত, আন্দোলনকারীরা ধাপে ধাপে সংগঠিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁরা রুগীদের জরুরি পরিষেবা চালু রেখে হাসপাতালের প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত করেন। এরপর তাঁরা হাসপাতালে কর্মরত নার্স, সিনিয়র ডাক্তার এবং অন্যান্য মেডিকেল কর্মীদের সঙ্গে সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। রাজ্যের অন্যান্য মেডিকেল কলেজের ছাত্রদেরও এই আন্দোলনে সমর্থন জানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- পঞ্চমত, আন্দোলনের চাপ বাড়াতে তাঁরা হাসপাতালের প্রবেশপথ অবরোধ করেন এবং ধর্না কর্মসূচি চালান। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁরা নিজেদের দাবি উত্থাপন করেন এবং সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। এর পাশাপাশি, তাঁরা মশাল মিছিল ও মৌন প্রতিবাদের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যা রাজ্য জুড়ে সাড়া ফেলে।

শেষপর্যায়ে, আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে প্রশাসন আলোচনায় বসতে বাধ্য হয় এবং তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও আন্দোলনকারীরা দাবি করেন যে প্রশাসন শুরুতে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আন্দোলনের শক্তিশালী সংগঠন ও লাগাতার সামাজিক চাপের কারণে সরকারকে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে হয়। এই আন্দোলন দেখিয়ে দেয় যে, শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ নয়, বরং সংগঠিত পরিকল্পনা, যোগাযোগ ও কৌশলগত আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করলে প্রশাসনকে ন্যায়বিচারের পথে আসতে বাধ্য করা সম্ভব।

বৃহত্তর সাধারণ সমাজ ও পুরো সমাজকে এই আন্দোলন নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ্ধতিতে যুক্ত করেছে–

- প্রথমত, আন্দোলনকারীরা সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের দাবি তুলে ধরেন। হাসপাতালের ভিতরে বিক্ষোভের পাশাপাশি তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন, যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হন এবং সংহতি প্রকাশ করেন।
- দ্বিতীয়ত, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে সাধারণ নাগরিকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। Twitter, Facebook, WhatsApp এবং Instagram-এর মাধ্যমে আন্দোলনের বিষয়ে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়। #JusticeForRGKarDoctor হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে তাঁরা বিভিন্ন পোস্ট, ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- তৃতীয়ত, আন্দোলনকারীরা জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জনের জন্য রাজ্যের অন্যান্য মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি তৈরি করেন। তাঁরা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের আন্দোলনে শামিল হতে আহ্বান জানান। এতে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংহতি মিছিল আয়োজিত হয়।
- চতুর্থত, তাঁরা চিকিৎসা পরিষেবার বাইরে সাধারণ নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল ও মশাল মিছিলের আয়োজন করেন। শুধু মেডিকেল কলেজের ভেতরে নয়, বরং শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ ও পথসভার আয়োজন করেন। এর ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকেই এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে শুরু করেন।
- পঞ্চমত, আন্দোলনকারীরা পুরসভা বা স্থানীয় প্রশাসনকে এই ঘটনায় সক্রিয় করতে চাইছিলেন। তাঁরা কলকাতা পুরসভা এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন, যাতে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। তাঁরা দাবি করেন যে হাসপাতালের কর্মরত নার্স, চিকিৎসক ও কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব।
- ষষ্ঠত, আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল পেশাদার চিকিৎসক সমাজকে এর মধ্যে যুক্ত করা। পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল, চিকিৎসক সংগঠন এবং সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে

তাঁরা এই আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় সমর্থন নিশ্চিত করেন। ফলে আন্দোলন কেবলমাত্র জুনিয়র ডাক্তারদের সীমাবদ্ধ আন্দোলন হিসেবে থেকে যায়নি, বরং পুরো চিকিৎসক সমাজের সন্মিলিত আন্দোলনে পরিণত হয়।

- সপ্তমত, সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে তাঁরা আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ও কারণকে স্পষ্ট করে উপস্থাপন করেন। তাঁরা দেখাতে সক্ষম হন যে, এটি শুধুমাত্র একটি হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য আন্দোলন নয়, বরং হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নারীদের প্রতি সহিংসতা ও প্রশাসনিক অবহেলার বিরুদ্ধে বৃহত্তর সামাজিক প্রতিবাদ।

ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ে এবং অনেকে তাঁদের পাশে দাঁড়ান। আবার এই আন্দোলনে যখন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আসার চেষ্টা করেছে তাদেরকে একরকমভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ওপর এক প্রকার সন্দেহ রয়েছে যাতে তাদের দ্বারা আন্দোলন হাইজ্যাক হয়ে না যায় বা এক্ষেত্রে কোনও বিশেষ ছাত্র সংগঠনের দ্বারা। আবার আমরা একই সময়ে যখন শাসক দলের বয়ান দেখছি তখন তারা বলার চেষ্টা করছে এই আন্দোলন এক ধরণের বামপন্হী আন্দোলনেরই অঙ্গ, কিন্তু তারা বামপন্হী সংগঠনের সাথে যুক্ত হচ্ছে না তার কারণ তারা সরকারকে ফেলার চেষ্টা করছে যাতে এবং যাতে তারা জনগণের সমর্থন পায়। ফলে সাম্প্রতিক রাজনীতির ইতিহাসের দিক থেকে এক ধরনের ধারা আসছে, যেখানে শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে না থেকে আন্দোলনটি সম্পন্ন করছে। কিন্তু শাসক দল মনে করছে, এই আন্দোলনের সাথে বামপন্থীদের যোগাযোগ আছে যা তারা সামনে আনছে না।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক সময়ের সমাজ সচেতনতা, বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সমাজকে আমূল বদলে ফেলার প্রচেষ্টায় নকশাল আন্দোলনের পরবর্তীকালে ছাত্র আন্দোলন রাজনীতির দলাদলির মধ্যে পরে ইস্যু ভিত্তিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধাঁচে জনগণের ইস্যুকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল। এবং দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের শাসনকালে ছাত্র আন্দোলন হয়ে পরেছিল ক্যাম্পাস ভিত্তিক এবং দলীয় ছত্রছায়ার অধীন। তার পরবর্তীতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন যা কৃষক শ্রেণির অধিকার ও সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করে, এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি বিরোধী

আন্দোলনগুলি সরাসরি সরকারের দুর্নীতির বিষয়ে আওয়াজ তোলে। এবং সন্দেশখালির আন্দোলন একটি অঞ্চলের নারীদের অধিকার-স্বাধীনতা-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন। এবং আজকে ২০২৫ খ্রিঃ এসে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা এক নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে, সেটা আমরা আরজিকর আন্দোলনের মাধ্যমে লক্ষ্য করলাম। অর্থাৎ এক নতুন ধারার আন্দোলন যেখানে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে রাজনৈতিক দলাদলির বৃত্তের বাইরে থেকে, যা রাজনৈতিক রঙ ও ব্যানার মুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থ

অ্যাডামস, জে., খান, এইচ. টি. এ., & রেসাইড, আর., ২০১৪, রিসার্চ মেথডস ফর বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স স্টুডেন্টস, নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস।

ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন, ২০০৪ খ্রিঃ, *বিশ্ব-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: একটি ভূমিকা,* ডারহাম: ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস।

এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ, ১৮৪৮ খ্রিঃ, *ম্যানিফেস্টো অফ দ্যা কমিউনিস্ট পার্টি,* শিকাগো: চার্লস এইচ. কির অ্যান্ড কোম্পানি।

ওলসন, ম্যানকার, ১৯৬৫ খ্রিঃ, *দ্য লজিক অব কালেক্টিভ অ্যাকশন: পাবলিক গুডস অ্যান্ড দ্য থিওরি অব গ্রুপস,* লন্ডন: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ওলসন, টমাস, ১৯৭১ খ্রিঃ, *স্টুডেন্ট পলিটিক্স অ্যান্ড প্রটেস্ট,* লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ওয়েবার, ম্যাক্স, ১৯৭৮ খ্রিঃ, *ইকনমি অ্যান্ড সোসাইটি: অ্যান আউটলাইন অফ ইন্টারপ্রেটিভ সোসিওলজি,* বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস।

ওয়েল্চ, ডোয়াইন ডি., ১৯৮১ খ্রিঃ, *সামাজিক আন্দোলনের রাজনীতি,* নিউ ইয়র্ক: লংম্যান।

ক্যাস্টেলস, ম্যানুয়েল, ২০১০ খ্রিঃ, *দ্য রাইজ অব দ্য নেটওয়ার্ক সোসাইটি,* ওয়েস্ট সাসেক্স: ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং লিমিটেড।

কোহেন, এল., ম্যানিয়ন, এল., & মরিসন, কে., ২০০৭, *রিসার্চ মেথডস ইন এডুকেশন,* লন্ডন: রাউটলেজ।

কার, ই. এইচ., ১৯৬১, *হোয়াট ইজ হিস্ট্রি?,* লন্ডন: ম্যাকমিলান।

কোসেলেক, আর., ২০০২, *দ্য প্র্যাকটিস অব কনসেপ্টুয়াল হিস্ট্রি: টাইমিং হিস্ট্রি, স্পেসিং কনসেপ্টস,* স্ট্যানফোর্ড: স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

গডার্ড, ডব্লিউ., & মেলভিল, এস., ২০০৪, *রিসার্চ মেথডোলজি: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন,* কেপ টাউন: জুটা অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড।

গাঙ্গুলি, অয়ন, ২০২৩ খ্রিঃ, *ভারতে শিক্ষানীতির পরিবর্তন ও ছাত্র সমাজের প্রতিক্রিয়া,* মুম্বাই: জ্ঞান প্রকাশন।

গুড, সি. ভি., & হ্যাট, পি. কে., ১৯৫২, *মেথডস ইন সোশ্যাল রিসার্চ,* শিকাগো: ম্যাকগ্রো-হিল।

গফম্যান, এরভিং, ১৯৭৪ খ্রিঃ, *ফ্রেম অ্যানালিসিস: অ্যান এসে অন দ্য অর্গানাইজেশন অব এক্সপিরিয়েন্স,* লন্ডন: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

গ্রামশি, এন্তেনিও, ১৯৭১ খ্রিঃ, *সিলেকশনস ফ্রম দ্য প্রিজন নোটবুকস,* কিউ. হোয়ার এবং জি. নওয়েল-স্মিথ (সম্পা. ও অনুবাদ), লন্ডন: লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট।

গিডেনস, এন্টনি, ১৯৯৫ খ্রিঃ, *পলিটিক্স, সোশিয়লজি অ্যান্ড সোস্যাল থিওরি,* কেমব্রিজ: পলিটি প্রেস।

গুহ, রণজিৎ, ১৯৮২ খ্রিঃ, *পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ছাত্র সমাজ,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

গেলনার, আর্নেস্ট, ২০০৮ খ্রিঃ, *নেশনস অ্যান্ড ন্যাশনালিজম,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩ খ্রিঃ।

গোহাই, হীরেন, ২০০৩ খ্রিঃ, *এথেনিক মুভমেন্ট ইন আসাম,* দিল্লি: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।

গ্লোভার, মারভিন, ২০২১ খ্রিঃ, *পলিটিক্স অ্যান্ড প্রটেস্ট: দ্যা চেঞ্জিং নেচার অফ স্টুডেন্ট মুভমেন্ট,* দিল্লি: রাটলেজ।

ঘোষ, জীবন, ১৯৯২ খ্রিঃ, *ভারতে শিক্ষা ও দুর্নীতি,* কলকাতা: সেজ পাবলিকেশনস।

ঘোষ, বিনয়, ২০২৩ খ্রিঃ, *শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলন: কারণ ও প্রভাব,* ঢাকা: একাডেমিক প্রেস।

চন্দ্র, বিপান, ১৯৮৮ খ্রিঃ, *ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম,* দিল্লি: পেঙ্গুইন।

চট্টোপাধ্যায়, শংকর সুহৃদ, ২০১৫ খ্রিঃ, *এডুকেশন অ্যান্ড দ্য মার্কেট: দ্য পলিটিক্স অব প্রাইভেটাইজেশন ইন ইন্ডিয়া,* নয়াদিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস।

চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রতিম, ২০০২ খ্রিঃ, *ঔপনিবেশিক ভারতে ছাত্র সমাজ ও রাজনীতি,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

চক্রবর্তী, কৌশিক, ২০২৩ খ্রিঃ, *রাজনৈতিক আন্দোলন ও সামাজিক পরিবর্তন: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ,* কলকাতা: বইমেলা প্রকাশনী।

চৌধুরী, সমীরণ, ২০২৩ খ্রিঃ, *পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের পরিবর্তন: এক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিকেশন।

চ্যাটার্জী, পার্থ, ২০০৪ খ্রিঃ, *শাসিতদের রাজনীতি: বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনীতির প্রতিফলন,* দিল্লি: পারমানেন্ট ব্ল্যাক।

চ্যাটার্জি, সোমনাথ, ২০২৪ খ্রিঃ, *পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন: সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

টারো, সিডনি, ২০০১ খ্রিঃ, *ডায়নামিকস অব কনটেনশন,* লন্ডন: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

টিলি, চার্লস, ১৯৭৮ খ্রিঃ, *ফ্রম মোবিলাইজেশন টু রেভলিউশন,* নিউ ইর্য়ক: র‍্যান্ডম হাউস।

টোশ, জে., ২০১৫, *দ্য পারসুইট অব হিস্ট্রি: এমস, মেথডস অ্যান্ড নিউ ডিরেকশন্স ইন দ্য স্টাডি অব হিস্ট্রি,* নিউ দিল্লি: রাউটলেজ।

ট্রেন্ট, জে. ই., ১৯৯৮, *কম্পারেটিভ পলিটিক্স: অ্যাপ্রোচেস অ্যান্ড ইশ্যুস,* লন্ডন: হার্পার কলিন্স।

ডেনজিন, নরম্যান. কে., & লিংকন, ইভোনা. এস., ২০১১, *দ্য সেজ হ্যান্ডবুক অব কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ,* নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস।

ডেভিস, জি মারভিন জি, ১৯৮৩ খ্রিঃ, *র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড রাইভালরি: দ্য পলিটিক্স অব ইনইকুয়ালিটি ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল,* লন্ডন: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ড্যারেনডর্ফ, রাফ, ১৯৫৯ খ্রিঃ, *ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটিতে শ্রেণি ও শ্রেণি সংঘাত*, ক্যালিফোর্নিয়া: স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

তুরাইন, আলাঁ, ১৯৮৫ খ্রিঃ, *অভিনেতার প্রত্যাবর্তন: পোস্টইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজে সামাজিক তত্ত্ব*, মিনেসোটা: ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা প্রেস।

দাশগুপ্ত, অভীক, ২০২২ খ্রিঃ, *রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রশাসনিক দুর্নীতি: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।

দাশগুপ্ত, রঞ্জন, ২০২০ খ্রিঃ, *করাপশান এন্ড এমপ্লয়েমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: আ স্ট্রাকচারাল এনালাইসিস*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

দাশগুপ্ত, রঞ্জন, ২০২৩ খ্রিঃ, *বাংলার ছাত্র রাজনীতি: অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

দাসগুপ্ত, সমীরণ, ২০২০ খ্রিঃ, *পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রশাসন ও রাজনৈতিক প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ*, কলকাতা: প্রকাশনী সংস্থা।

দুর্খেইম, ইমিলি, ১৮৯৩ খ্রিঃ, *দ্য ডিভিশন অব লেবার ইন সোসাইটি*, ডব্লিউ. ডি. হলস (অনুবাদ), নিউ ইয়র্ক: ফ্রি প্রেস।

পার্কিন, ফ্রাঙ্ক, ১৯৭১ খ্রিঃ, *শ্রেণিগত অসমতা ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা: পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস*, দিল্লি: রাউটলেজ।

পিনক, স্টিভেন, ১৯৮০ খ্রিঃ, *রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিক আন্দোলন*, শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস।

পুটনাম, ডি রবার্ট, ১৯৯৩ খ্রিঃ, *মেকিং ডেমোক্রাসি ওয়ার্ক*, নিউ জার্সি: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ফোয়ারকার, জেমস, ১৯৯৫ খ্রিঃ, *সামাজিক আন্দোলন তত্ত্ব: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, শিকাগো: প্লুটো প্রেস।

বিকম্যান, এল., & রগ, ডি. জে., ১৯৯৮, *হ্যান্ডবুক অব অ্যাপ্লাইড সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস*, নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস।

বুর্দিয়ে, পি., ১৯৯৩, *দ্য ফিল্ড অব কালচারাল প্রোডাকশন: এসেজ অন আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার*, কলম্বিয়া: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ব্রাইমান, এ., ২০১২, *সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস*, লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বেস্ট, জে. ডব্লিউ., & কান, জে. ভি., ২০০৬, *রিসার্চ ইন এডুকেশন*, ইউকে: পিয়ারসন, (১০ম সংস্করণ)।

বেস্ট, জে. ডব্লিউ., ১৯৮১, *রিসার্চ ইন এডুকেশন*, নিউ জার্সি: প্রেন্টিস হল।

ব্লালক, এইচ. এম., ১৯৬৪, *কজাল ইনফারেন্সেস ইন ননএক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ*, নর্থ ক্যারোলাইনা: ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা প্রেস।

ব্লুমার, এইচ., ১৯৬৯, *সিম্বলিক ইন্টারঅ্যাকশনিজম: পার্সপেকটিভ অ্যান্ড মেথড*, নিউ জার্সি: প্রেন্টিস-হল।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর, ২০২১ খ্রিঃ, *শিক্ষা ও রাজনীতি: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট*, কলকাতা: অধ্যয়ন প্রকাশন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, ১৯৮০ খ্রিঃ, *ইন দ্য ওয়েক অব নকশালবাড়ি: এ হিস্ট্রি অব দ্য নকশালাইট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া*, কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

বসু, তপন, ২০১০ খ্রিঃ, *দ্য রোল অব স্টুডেন্টস ইন পলিটিক্যাল মুভমেন্টস: এ কেস স্টাডি অব নন্দীগ্রাম*, কলকাতা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বসু, প্রদীপ, ১৯৯৫ খ্রিঃ, *স্টুডেন্ট মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: হিস্টোরিকাল পারস্পেকটিভ*, কলকাতা: কলকাতা বুক হাউস।

বসু, সঞ্জয়, ১৯৯০ খ্রিঃ, *স্ট্রাগল ফর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রিফর্মস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল*, কলকাতা: কলকাতা বুক হাউস।

বর্মন, অনুপম, ২০১০ খ্রিঃ, *বোডোল্যান্ড স্ট্রাগল অ্যান্ড অটোনমি মুভমেন্টস্,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস।

বাগচী, তপন, ১৯৮৩ খ্রিঃ, *ভারতে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস।

বুর্দিয়ু, পিয়ারে, ১৯৮৬ খ্রিঃ, *দ্য ফর্মস অব ক্যাপিটাল,* জে. রিচার্ডসন (সম্পা.), *হ্যান্ডবুক অব থিওরি অ্যান্ড রিসার্চ ফর দ্য সোশিওলজি অব এডুকেশন,* নিউ ইয়র্ক: গ্রিনউড প্রেস।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, ১৯৮০ খ্রিঃ, *ইন দ্য ওয়েক অব নকশালবাড়ি: এ হিস্ট্রি অব দ্য নকশালাইট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া,* কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

বানার্জি, সুমন্ত, ১৯৮০, *ইন দ্য ওয়েক অব নকশালবাড়ি: আ হিস্ট্রি অব দ্য নকশালাইট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া,* কলকাতা: সুবর্ণরেখা।

ভট্টাচার্য, সুপ্রতীম, ২০২৩ খ্রিঃ, *আধুনিক ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র ও প্রভাব,* কলকাতা: অ্যানামিকা পাবলিকেশন।

মরগেনথাউ, হ্যান্স জে., ১৯৪৮ খ্রিঃ, *পলিটিক্স অ্যামাং নেশনস: দ্যা স্ট্রাগাল ফর পাওয়ার অ্যান্ড পিস,* নিউ ইয়র্ক: আলফ্রেড আ. নফ্।

মার্ক্স, কার্ল, ১৯৭৮ খ্রিঃ, *দ্য মার্কস-এঙ্গেলস রিডার,* রবার্ট সি. টাকার (সম্পা.), নিউ ইয়র্ক: ডব্লিউ. ডব্লিউ. নর্টন এন্ড কোম্পানি।

মার্কস, কার্ল, ১৮৪৪, *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক ম্যানুসক্রিপ্টস অব ১৮৪৪,* মস্কো: প্রগ্রেস পাবলিশার্স।

মানহাইম, কার্ল, ১৯৩৬ খ্রিঃ, *বিধি ও কল্পনা: জ্ঞান সমাজতত্ত্বের ভূমিকা,* দিল্লি: রাউটলেজ।

মিগডাল, এস জোয়েল, ১৯৮৮ খ্রিঃ, *স্ট্রং সোসাইটি অ্যান্ড উইক স্টেটস,* নিউ জার্সি: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মিত্র, অশোক, ১৯৮১ খ্রিঃ, *অন্য ভারতের খোঁজে,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

মিরডাল, গুনার, ১৯৬৮ খ্রিঃ, *এশিয়ান ড্রামা: অ্যান ইনকোয়ারি ইন্টু দ্য পোভার্টি অব নেশনস*, নিউ ইর্য়ক: প্যানথিয়ন।

মুখার্জি, অমল, ২০০১ খ্রিঃ, *বেঙ্গল পলিটিক্স: স্টুডেন্ট মুভমেন্টস অ্যান্ড পাওয়ার স্ট্রাগল*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।

মুখার্জি, অরুণ, ২০২০ খ্রিঃ, *ভারতীয় ছাত্র আন্দোলনের বর্তমান প্রবণতা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

মুখার্জি, অশোক, ১৯৮১ খ্রিঃ, *ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্স অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান।

মুখার্জি, আদিত্য, ২০০৮ খ্রিঃ, *ইন্ডিয়া আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স: ১৯৪৭-২০০০*, কলকাতা: পেঙ্গুইন বুকস।

মুখার্জি, দীপক, ২০২৩ খ্রিঃ, *নয়া সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ*, দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মুখার্জি, সুব্রত, ২০২৩ খ্রিঃ, *এডুকেশন, পলিটিক্স এন্ড করাপশান ইন বেঙ্গল*, দিল্লি: রাটলেজ।

মুখার্জি, সৌম, ২০২৩ খ্রিঃ, *ভারতের ছাত্র আন্দোলন ও সামাজিক পরিবর্তন*, কলকাতা: বিশ্বভারতী পাবলিকেশন।

মুখোপাধ্যায়, অমিতেশ, ২০১২, *সোশ্যাল মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া*, দিল্লি: পিয়ারসন।

ম্যাকঅ্যাডাম, ডি., ম্যাককার্থি, জে. ডি., & জাল্ড, এম. এন., ১৯৮৮, *সোশ্যাল মুভমেন্টস: আইডিয়োলজিস, ইন্টারেস্টস, অ্যান্ড আইডেন্টিটিস*, কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মেলুচি, আলবের্তো, ১৯৮৯ খ্রিঃ, *নোমাডস অব দ্য প্রেজেন্ট: সোশ্যাল মুভমেন্টস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল নিডস ইন কন্টেম্পোরারি সোসাইটি*, জন কিয়ান এবং পল মিয়ার (সম্পা.), ফিলাডেলফিয়া: টেম্পল ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ম্যাকঅ্যাডাম, ডেভিড; ম্যাককার্থি, জন ডি., এবং জাল্ড, মায়ার এন, ১৯৮৮ খ্রিঃ, *হ্যান্ডবুক অব সোসিওলজি*, দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস।

রায়, রজত, ২০১৯ খ্রিঃ, *স্টুডেন্ট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া: আ হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড সোসিওলজিক্যাল অ্যানালাইসিস,* লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

রায়, সত্যব্রত, ১৯৯৫ খ্রিঃ, *স্টুডেন্ট মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া: দ্য নকশালাইট ফেজ,* নয়া দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

রায়, সঞ্জয়, ২০২৩ খ্রিঃ, *বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসন: ভারতীয় বাস্তবতা,* দিল্লি: সেজ পাবলিকেশন।

রায়, সৌমিত্র, ২০১৯ খ্রিঃ, *রাজনীতি ও প্রশাসনের দ্বন্দ্ব: শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভাব,* কলকাতা: বিশ্বজিৎ পাবলিকেশন।

রাও, এম.এস., ২০১২ খ্রিঃ, *ভারতের সামাজিক আন্দোলন: একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি,* নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস।

র‍্যাকার, পল, ১৯৯২ খ্রিঃ, *ওয়ানসেল্ফ অ্যাজ অ্যানাদার,* শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো।

রেসনিক, ডি. বি., ১৯৯৮, *দ্য এথিক্স অব সায়েন্স: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন,* লন্ডন: রাউটলেজ।

লাসওয়েল, এইচ. ডি, ১৯৫০ খ্রিঃ, *শক্তি ও সমাজ: রাজনৈতিক অনুসন্ধানের একটি কাঠামো,* নিউ হেভেন: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস।

লাক্লাউ, আর্নেস্টো, ২০০৫ খ্রিঃ, *জনসাধারণের যুক্তি,* ভার্সো।

লিন্ড, রবার্ট, ১৯৩৯ খ্রিঃ, *জ্ঞান কী জন্য? আমেরিকান সংস্কৃতিতে সমাজবিজ্ঞানের স্থান,* প্রিন্সটন: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস।

শাহ, ঘনশ্যাম, ২০২১ খ্রিঃ, ভারতে সামাজিক আন্দোলন: সাহিত্য পর্যালোচনা, দিল্লি: সেজ পাবলিকেশন্স।

সরকার, সুমিত, ২০১৪ খ্রিঃ, *বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮),* দিল্লি: পিপলস পাবলিশিং হাউস।

সিনহা, সৌমদীপ, ২০২২ খ্রিঃ, *পোস্টকলোনিয়াল প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিকরণ: ভারতের ছাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*, ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড পলিটিকস: অ্যাক্টরস, কনফ্লিক্টস, অ্যান্ড গ্লোবাল ভিশনস।

সেন, অর্পণ, ২০২২ খ্রিঃ, *শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ছাত্র আন্দোলন: সমসাময়িক বিশ্লেষণ*, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।

সেন, অমর্ত্য, ২০০৯ খ্রিঃ, *ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম*, নয়াদিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

সেনগুপ্ত, অনিরুদ্ধ, ২০২১ খ্রিঃ, *সিটিজেনশিপ ডিবেটস্ অ্যান্ড স্টুডেন্ট প্রোটেস্ট ইন আসাম*, দিল্লি: পেঙ্গুইন।

সেনগুপ্ত, অভিজিৎ, ২০১৮ খ্রিঃ, *পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স ইন রিক্রুমেন্ট: দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপিরিয়েন্স*, দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত, ২০১২ খ্রিঃ, *পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলন: জনগণের অসন্তোষ ও দাবি*, কলকাতা: বাংলা প্রকাশন।

স্কট, জে. সি., ১৯৯৯, *সোশ্যাল মুভমেন্টস অ্যান্ড দেয়ার হিস্টোরিজ: অ কম্পারেটিভ পার্সপেকটিভ*, কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

স্ককপল, টি., ১৯৭৯, *স্টেটস অ্যান্ড সোশ্যাল রেভলিউশন্স: অ কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস অব ফ্রান্স, রাশিয়া অ্যান্ড চায়না*, কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

স্পিভাক, গায়েত্রি চক্রবর্তী, ১৯৮৮ খ্রিঃ, *ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?*, নেলসন এবং এল. গ্রোসবার্গ (সম্পা.) মার্কসিজম অ্যান্ড দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব কালচার, উরবানা: ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় প্রেস।

স্মেলসার, নীল জে., ১৯৬৫ খ্রিঃ, *সমষ্টিগত আচরণের তত্ত্ব*, ফ্রি প্রেস।

হেবরমাস, জুর্গেন, ১৯৮৯ খ্রিঃ, *দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন অব দ্য পাবলিক স্পিয়ার: অ্যান ইনকোয়ারি ইন্টু এ ক্যাটাগরি অব বুর্জোয়া সোসাইটি*, ক্যামব্রিজ: এমআইটি প্রেস।

হান্টিংটন, পি. স্যামুয়েল, ১৯৬৮ খ্রিঃ, *পলিটিক্যাল অর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটিস,* নিউ হেভেন অ্যান্ড লন্ডন: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস।

কোঠারি, সি. আর., ২০০৪, *রিসার্চ মেথডোলজি: মেথডস অ্যান্ড টেকনিকস,* কলকাতা: নিউ এজ ইন্টারন্যাশনাল, (২য় সংস্করণ)।

ক্রেসওয়েল, জে. ডব্লিউ., ২০১৪, *রিসার্চ ডিজাইন: কোয়ালিটেটিভ, কোয়ান্টিটেটিভ, অ্যান্ড মিক্সড মেথডস অ্যাপ্রোচেস,* নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস, (৪র্থ সংস্করণ)।

পাঞ্চ, কে. এফ., ২০১৬, *ডেভেলপিং ইফেকটিভ রিসার্চ প্রোপোজালস,* নিউ দিল্লি: সেজ পাবলিকেশনস, (৩য় সংস্করণ)।

প্যাটন, এম. কিউ., ২০০২, *কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড ইভালুয়েশন মেথডস,* থাউজ্যান্ড ওকস, (৩য় সংস্করণ), সিএ: সেজ।

জার্নাল

ইমানুয়েল, ইজেকিয়েল. জে., ওয়েন্ডলার, ডেভিড, & গ্র্যাডি, ক্রিস্টিন, ২০০০, "হোয়াট মেকস ক্লিনিকাল রিসার্চ এথিক্যাল?" *জামা,* ২৮৩(২০), ২৭০১-২৭১১।

পরিমল ভট্টাচার্য, ২০১১ খ্রিঃ, *পলিটিক্যাল ইকোনমি অব ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন ইন সিঙ্গুর,* ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি।

ফ্রাঙ্ক, আন্দ্রে গুন্ডার, ১৯৬৯ খ্রিঃ, *ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড আন্ডারডেভেলপমেন্ট ইন লাটিন আমেরিকা,* মান্থলি রিভিউ প্রেস।

ব্যারান, পল, ১৯৫৭ খ্রিঃ, *দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব গ্রোথ,* মান্থলি রিভিউ প্রেস।

সেইমুর মার্টিন লিপসেট, ১৯৫৯ খ্রিঃ, *সাম সোশ্যাল রিকুইজিটস অব ডেমোক্রেসি: ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল লেজিটিমেসি*, আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ, ৫৩(১), পৃ. ৬৯-৭৫.

স্নো, ডেভিড. এ., ও বেনফোর্ড, রবার্ট ডি., ১৯৮৮ খ্রিঃ, "আইডিওলজি, ফ্রেম রেজোন্যান্স, এবং পার্টিসিপেন্ট মোবিলাইজেশন", *ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল মুভমেন্ট রিসার্চ*, সংখ্যা-১, পৃ. ১৯৭-২১৭.

হেইনেম্যান, স্টিফেন, ১৯৯৮ খ্রিঃ, *দ্য ইমপ্যাক্ট অব করাপশন অন এডুকেশন কোয়ালিটি জার্নাল অব এডুকেশন পলিসি*।

পত্রিকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ মে ২০০৬ খ্রিঃ। (সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সমাবেশ এবং বিক্ষোভের প্রতিবেদন এবং প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবাদীদের প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করেছিল।)

নিজস্ব প্রতিবেদক, *দ্য টেলিগ্রাফ*, ২৮ জুন ২০০৬ খ্রিঃ। (ভূমি অধিগ্রহণ নীতির আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং ভূমি সংস্কার প্রচেষ্টায় সরকারী দ্বন্দ্ব সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে।)

নিজস্ব প্রতিবেদক, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* (কলকাতা সংস্করণ)।, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রিঃ। (সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ প্রতিরোধের প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলি কভার করে।)

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সরকারের শিল্পায়ন পরিকল্পনায় গোপনীয়তা অনুসন্ধান করে', *দ্য টেলিগ্রাফ*।, ১৩ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, স্টেটসম্যান, ১৫ মার্চ ২০০৭ খ্রিঃ। (নন্দীগ্রাম পুলিশের অভিযান ও তার পরবর্তী পরিণতির বিবরণ।)

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগের মাধ্যমে অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ', *দ্য টেলিগ্রাফ*।১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা ও ইতিহাস', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মে ২০১৯ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ', দৈনিক টেলিগ্রাফ, ২০ জুন ২০২০ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'আবেদন না করেই মোটা ঘুষ দিয়ে স্কুলে চাকরি, সিবিআইকে তথ্য দিলেন মামলাকারীরা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ মে ২০২২ খ্রিঃ, পৃ. ৪।

সম্পাদকীয় কলম, 'গুছিয়ে নেওয়ার পূর্ণগ্রাস', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ, পৃ. ৩।

সম্পাদকীয় কলম, 'দুর্নীতি যে ভাবে ভাঙ্গন ধরায়', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ, পৃ. ৩।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'দুর্নীতি শুরু হয় ২০১২র টেটে, দাবি ইডি সূত্রের', আনন্দবাজার পত্রিকা, ০২ আগস্ট ২০২২ খ্রিঃ, পৃ. ২।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'নবান্ন অভিযানে বিজেপির বিক্ষোভ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'বাম আমলের নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে সরকারের অবস্থান', সংবাদ প্রতিদিন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'ধর্মতলায় চাকরি প্রার্থীদের ধর্ণা', এইসময়, ১২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ।

Staff reporter, 'বিজেপি নেতাদের বক্তব্য', *দ্য টেলিগ্রাফ,* ২০ অক্টোবর ২০২২।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি', সংবাদ প্রতিদিন, ২২ নভেম্বর ২০২২ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'দিলীপ ঘোষের বক্তব্য', এইসময়, ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'শিক্ষামন্ত্রীর পাল্টা অভিযোগ', এইসময়, ১৮ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'WBSSC নিয়োগ বাতিলের রায়', বর্তমান, ২৯ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ।

Staff reporter, 'SSC নিয়োগ বাতিলের রায়', *দ্য টেলিগ্রাফ,* ৫ মে ২০২৩।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'উদয়ন গুহর বক্তব্য', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ মে ২০২৩ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'আদালতে চাকরি প্রার্থীদের মামলা', বর্তমান, ১০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'নিয়োগ দুর্নীতি: অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের প্রশ্ন', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সরকারি রেশন দুর্নীতিতে শেখ শাহজাহানের ভূমিকা: ইডির তদন্তে নতুন তথ্য', দ্যা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজে বাধা, স্থানীয়দের ক্ষোভ।' দ্যা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২২ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা, তদন্ত ঘিরে উত্তেজনা', দ্যা *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালির আন্দোলনে জমি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ: প্রতিবাদে সামিল সন্দেশখালির নারীরা', দ্যা টেলিগ্রাফ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালিতে জমি দখল নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নীরব ভূমিকা।' দ্যা টেলিগ্রাফ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ, নারী নির্যাতন ও জমি দখলের প্রসঙ্গ উঠে এলো', দ্যা টেলিগ্রাফ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, "নারীদের প্রতিরোধ: 'আর নয়, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব", দ্যা *টেলিগ্রাফ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপির বিক্ষোভ', The Times of India, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, "নারীদের প্রতিবাদ: 'আমরা থামব না, লড়াই চালিয়ে যাব", দ্যা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, "জমি রক্ষার লড়াইয়ে মহিলারা: 'আমাদের কথা কেউ শুনছিল না, তাই রাস্তায় নামলাম', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'প্রতিবাদে নারীদের সংগঠিত প্রচেষ্টা', দ্যা টেলিগ্রাফ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, "জমিহারা কৃষকদের ক্ষোভ: 'আমাদের মেয়েরাই আমাদের সাহস জুগিয়েছে", আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ।

স্টাফ রিপোর্টার, 'উইমেন অ্যাকিউজ ফিউজিটিভ টিএমসি লিডার অব ল্যান্ড গ্র্যাবিং অ্যান্ড সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট', *দ্য টেলিগ্রাফ*, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।নিজস্ব প্রতিবেদক, 'আমরাও পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালিতে জমি হারানো কৃষকদের প্রতিরোধ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'নারী নির্যাতনের অভিযোগে ক্ষোভ, বিচারের দাবিতে পথে সাধারণ মানুষ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'নারী অধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিক্রিয়া', দ্যা টেলিগ্রাফ, ৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালি: সাধারণ মানুষের লড়াই না কি প্রশাসনিক ব্যর্থতা?' আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেশখালি কাণ্ডে পুলিশের অভিযানে শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তার', দ্যা টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২০ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'সন্দেহজনক লেনদেনের তদন্তে সিবিআই, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ', দ্যা হিন্দু, ১৫ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, 'দখল হওয়া জমি ফেরতের উদ্যোগ প্রশাসনের, ক্ষতিগ্রস্তদের স্বস্তি', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১০ মে ২০২৪ খ্রিঃ।

Web link(s):

https://www.buruniv.ac.in/Downloads/Projects/PR_Emp_1735_AnirbanBanerjee_1.pdf

https://www.researchgate.net/publication/322209305_STUDENTS_RADICAL_SOCIAL_CHANGE

সাক্ষাৎকারদের প্রশ্নমালা

ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা ও আন্দোলনের বিশ্লেষণের জন্য সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র

১. আপনার নাম (প্রয়োজনে গোপন রাখা হবে):

২. আপনি কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত?

৩. কত বছর ধরে আপনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত?

৪. আপনার সংগঠনের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য কী?

৫. আপনার মতে, গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?

৬. বিগত দুই দশকে কোন আন্দোলন বা ঘটনা আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে? কেন?

৭. ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন কি মূলত রাজনৈতিক দলের সম্প্রসারিত রূপ, নাকি ছাত্রদের স্বতন্ত্র স্বার্থরক্ষার একটি উপায়?

৮. আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রদের সাড়া পাওয়া কতটা সম্ভবপর হয়?

৯. সাধারণত আপনার সংগঠন যখন কোনো আন্দোলন শুরু করে, তখন তার প্রধান উদ্দেশ্য কী থাকে—তাৎক্ষণিক দাবি আদায়, নাকি দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন?

১০. রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি ও ফলাফলে প্রভাব ফেলে? যদি ফেলে, তাহলে কীভাবে?

১১. ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনগুলোর ফলে প্রশাসন বা সরকার কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়?

১২. গত দুই দশকের আন্দোলনগুলোর মধ্যে কোন আন্দোলন আপনাদের সংগঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

১৩. আন্দোলনের ফলে শিক্ষাঙ্গনে ও বৃহত্তর সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে আপনি মনে করেন?

১৪. ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের কী ধরণের পরিবর্তন আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১৫. বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের প্রধান চ্যালেঞ্জ কী? এবং সংগঠন কীভাবে তা মোকাবিলা করতে পারে?

আন্দোলনকারীদের সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা

১. আপনার নাম (প্রয়োজনে গোপন রাখা হবে):

২. আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম:

৩. আপনি কত বছর ধরে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত?

৪. কোন আন্দোলন বা ঘটনার সময় আপনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন?

৫. কোন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন কি? থাকলে তার নাম উল্লেখ করুন।

৬. প্রথমবার কবে এবং কী কারণে আপনি কোনো আন্দোলনে অংশ নেন?

৭. আপনার মতে, বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কারণ ও বিষয়বস্তু কী?

৮. আন্দোলন সংগঠিত করার প্রক্রিয়াটি কেমন? কোন কোন কৌশল অবলম্বন করা হয়?

৯. আন্দোলনের সময় প্রশাসনের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া বা বাধা আসে?

১০. আন্দোলনের সময় আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? কখনো কি পুলিশি হেনস্তা, গ্রেপ্তার বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন?

১১. আপনার মতে, ছাত্র আন্দোলনগুলি আদৌ কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছে কি? যদি হ্যাঁ, তাহলে কীভাবে?

১২. আন্দোলন কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম নাকি এটি প্রকৃত অর্থে ছাত্রস্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে?

১৩. আন্দোলনের ফলে আপনার ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত জীবনে কী প্রভাব পড়েছে?

১৪. বিগত দুই দশকের মধ্যে আপনার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল ছাত্র আন্দোলন কোনটি? কেন?

১৫. আপনার দৃষ্টিতে বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের প্রধান চ্যালেঞ্জ কী?

১৬. ভবিষ্যতে ছাত্র আন্দোলনের ধরন কীভাবে বদলাতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১৭. রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাত্র আন্দোলনের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে?

১৮. বর্তমান সময়ের ছাত্র আন্দোলনের সাথে আগের সময়ের আন্দোলনের তুলনা করলে কী পার্থক্য দেখতে পান?

১৯. আপনি কি মনে করেন যে ভবিষ্যতে ছাত্র আন্দোলন আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত হতে পারবে? যদি না হয়, তাহলে তার প্রধান বাধাগুলি কী?

২০. বর্তমান ছাত্র সমাজের মধ্যে আন্দোলনের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?